পাঠ সংকলন

পশ্চিম বঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ

9689

পাঠ সংকলন

পশ্চিম বঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক প্রকাশিত

সূচীপত্র

পদ্যাংশ

STATE INSTITUTE OF EDUCATION
Govt. of West Bengal

গদ্যাংশ

পদ্যাংশ

শ্রীরামের অত্রিমুনির আশ্রম গমন

কৃত্তিবাস

আমা নিতে ভরত আইলে পুনর্বার।
কেমনে অন্যথা করি বচন তাহার॥
চিত্রকূট অযোধ্যা নহে ত বহু দূর।
ভরত ভ্রাতার ভক্তি আমাতে প্রচুর॥
রঘুনাথ এমত চিন্তিয়া মনে মনে।
চিত্রকূট ছাড়িয়া চলিলেন দক্ষিণে॥
কতদূর যান তাঁরা করি পরিশ্রম।
সম্মুখে দেখেন অত্রিমুনির আশ্রম॥
প্রবেশিয়া তিন জন পুণ্য তপোবন।
বন্দনা করেন অত্রিমুনির চরণ॥
রামে দেখি মুনিবর উঠিয়া যতনে।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া বসাইলেন আসনে॥
আপনার পত্নী-ঠাঁই সমর্পিলা সীতা।
পালন করহ যেন আপন দুহিতা॥
দেখি মুনিপত্নীকে ভাবেন মনে সীতা।
মূর্তিমতী করুণা কি শ্রদ্ধা উপস্থিতা॥
শুক্ল বস্ত্র পরিধান, শুক্ল সর্ব বেশ।
করিতে করিতে তপ পাকিয়াছে কেশ॥
তপস্যা করিয়া মূর্তি ধরেন তপস্যা।
জ্ঞান হয় গায়ত্রী কি সবার নমস্যা॥
কৃতাঞ্জলি নমস্কার করিলেন সীতা।
আশীর্বাদ করিলেন অত্রির বনিতা॥
মুনিপত্নী বসাইয়া সম্মুখে সীতারে।
কহেন মধুর বাক্য প্রফুল্ল অন্তরে॥
রাজকুলে জন্মিয়া পড়িলে রাজকুলে।
দুই কুল উজ্জ্বল করিলে গুণে শীলে॥

STATE INSTITUTE OF EDUC... Govt. of West Ben...

এ-সব সম্পদ ছাড়ি পতি-সঙ্গে যায়।
হেন স্ত্রী পাইলা রাম বহু তপস্যায়॥
সীতা কহিলেন, মা, সম্পদে কিবা কাম।
সকল সম্পদ মম দূর্বাদলশ্যাম॥

আত্মপরিচয়

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

শুন ভাই সভাজন কবিত্বের বিবরণ
এই গীত হৈল যেমতে।
উরিয়া মায়ের বেশে কবির শিয়র-দেশে
চণ্ডিকা বসিলা আচম্বিতে॥
সহর সেলেমাবাজ তাহাতে সজ্জন-রাজ
নিবসে নেউগী গোপীনাথ।
তাঁহার তালুকে বসি দামিন্যায় চাষ চষি
মিরাস পুরুষ হৈল সাত॥
ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদে নব ভৃঙ্গ
গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-মহীপ।
মানসিংহের কালে প্রজার পাপের ফলে
ডিহিদার মামুদ সরিপ॥
উজির হৈল রায়জাদা বেপারি-বৈশ্যের খেদা
ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের হৈল অরি।
মাপে কোণে দিয়া দড়া পনের কাঠায় কুড়া
নাহি শুনে প্রজার গোহারি॥
সরকার হৈল কাল খিল ভূমি লিখে লাল
বিনা উপকারে খায় ধুতি।
পোতদার হৈল যম টাকা আড়াই আনা কম
পাই লভ্য খায় দিন প্রতি॥

ডিহিদার অবোধ খোজ　　কড়ি দিলে নহে রোজ
ধান্য গরু কেহ নাহি কিনে।
প্রভু গোপীনাথ নন্দী　　বিপাকে হইলা বন্দী
কোন হেতু নহে পরিত্রাণে॥
জানদার সভার কাছে　　প্রজারা পালায় পাছে
দুয়ার চাপিয়া দেয় থানা।
প্রজা হইয়া ব্যাকুলি　　বেচে ঘর-কুটিয়ালি
টাকাকের দ্রব্য দশ আনা॥
সহায় শ্রীমন্ত খাঁ　　চণ্ডীবাটী যার গাঁ
যুক্তি কৈল গম্ভীর খাঁ সনে।
দামিন্যা ছাড়িয়া যাই　　সঙ্গে রমানাথ ভাই
চণ্ডী পথে দিলা দরশনে॥
ভেলিয়ায় উপনীত　　রূপ রায় নৈল বিত্ত
যদু কুণ্ডু তেলী কৈল রক্ষা।
দিয়া আপনার ঘর　　নিবারণ কৈল ডর
তিন দিবসের দিল ভিক্ষা॥
বাহিয়া মুড়াই নদী　　সদাই স্মরিয়ে বিধি
তেউট্যায় হৈল উপনীত।
দারুকেশ্বর তরি　　পাইল পাতলি-পুরী
গঙ্গাদাস বড় কৈল হিত॥
নারায়ণ পরাশর　　এড়াইল দামোদর
উপনীত কুচট্যা নগরে।
তৈল বিনা কৈল স্নান　　করিলুঁ উদক পান
শিশু কান্দে ওদনের তরে॥
আশ্রম পুখরি-আড়া　　নৈবেদ্য শালুক-নাড়া
পূজা কৈল কুমুদ-প্রসূনে।
ক্ষুধা পথ-পরিশ্রমে　　নিদ্রা যাই সেই ধামে
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে॥
করিয়া পরম দয়া　　দিলা চরণের-ছায়া
আজ্ঞা দিলা রচিতে সংগীত।
চণ্ডীর আদেশ পাই　　শিলাই তরিয়া যাই
আরড়ায় হৈল উপনীত॥

আরড়া ব্রাহ্মণ-ভূমি ব্রাহ্মণ যাহার গ্রামী
নরপতি ব্যাসের সমান।
পড়িয়া কবিত্ব-বাণী সম্ভাষিল নৃপমণি
রাজা দিলা পাঁচ আড়া ধান॥
ধন্য বাঁকুড়া-রায় ভাঙ্গিল সকল দায়
শিশুপাঠে কৈল নিয়োজিত।
ধন্য রায় রঘুনাথ রাজগুণে অবদাত
গুরু বলি করিল পূজিত॥
সঙ্গে ডামাল নন্দী যে জানে স্বপন-সন্ধি
অনুদিন করিত যতন।
নিত্য দেন অনুমতি রঘুনাথ নরপতি
গায়নেরে দিলেন ভূষণ॥
বীর মাধবের সুত রূপে গুণে অদ্ভূত
বীর বাঁকুড়া ভাগ্যবান্।
তার সুত রঘুনাথ রাজগুণে অবদাত
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

শব্দটীকা:— উরিয়া—অবতীর্ণ হইয়া। সেলেমাবাজ = সুলেমবাদ = সুলেমানাবাদ। মিরাস—বংশানুক্রমিক অধিকার। সরিপ—শরীফ (পদবী, অর্থ সম্ভ্রান্ত)। উজির—দেওয়ান। রায়জাদা—রায়ের পুত্র। গোহারি—কাতরোক্তি। সরকার—জমিজমার বিবরণ অধিকারক। খিল—অনাবাদী। লাল—আবাদী। ধুতি—ঘুষ। পোতদার—মুদ্রার ধাতুমান পরীক্ষক। ডিহিদার—অঞ্চল-প্রধান। খোজ—গোঁয়ার। নহে রোজ—সুখী হয় না। জান্দার—ব্যক্তিগত মানুষের জন্য দায়ী কর্মচারী, পেয়াদা-সদৃশ। কুটিয়ালি—কাঠকুটোশুদ্ধ। শালুক-নাড়া—শালুকের নাল, দন্ড। আরড়া—এই গ্রামেরই তৎকালীন নূতন নাম ব্রাহ্মণ-ভূম।

দুর্যোধনের প্রতি ধৃতরাষ্ট্র

কাশীরাম দাস

ধৃতরাষ্ট্র বলে, পুত্র, হিংসা বড় পাপ।
হিংসক জনের, পুত্র, জন্মে বড় তাপ॥
অহিংসক পাণ্ডবের না করিবে হিংসা।
শান্ত হৈয়া থাক পুত্র, পাইবে প্রশংসা॥
সেইমত যজ্ঞ করিবারে যদি মন।
কহ পুত্র নিমন্ত্রণ করি রাজগণ॥
আমারে গৌরব করে সব নৃপবর।
ততোধিক রত্ন দিবে আমারে বিস্তর॥
ইহা না করিয়া যাহা করহ বিচার।
অসৎ মার্গেতে গেলে দূষিবে সংসার॥
পরদ্রব্য দেখি হিংসা না করে যে জন।
স্বধর্মেতে সদা বঞ্চে সন্তোষিত মন॥
স্বকর্মে উদ্‌যোগ করে পর-উপকারী।
সদাকাল সুখে বঞ্চে কি দুঃখ তাহারি॥
পর নহে নিজ ভাই পাণ্ডুর নন্দন।
দ্বেষভাব তারে না করিহ কদাচন॥
দুর্যোধন বলে, পিতা, প্রজ্ঞাবান্ নই।
বহু শুনিয়াছি বলি শাস্ত্র কথা কই॥
সে জন কি জানে পিতা শাস্ত্রের বিবাদ।
চাটু যেন নাহি জানে পিষ্টকের স্বাদ॥
রাজা হৈয়া এক আজ্ঞা নহিল যাহার।
তারে রাজা নাহি বলি শাস্ত্র-অনুসার॥
রাজা হৈয়া সন্তোষ না রাখিবে কখন।
ধনে জনে শান্তি না রাখিবে কদাচন॥
শত্রুকে বিশ্বাস আর নাহি কদাচন।
নমুচি দানবে যথা, সহস্রলোচন॥
এক পিতা হইতে সবার উৎপত্তি।
বহুকাল প্রীতি ছিল নমুচি-সংহতি॥

সমরে তাহারে ইন্দ্র করিল সংহার।
নিষ্কণ্টকে ভোগ করে অদিতিকুমার॥
শত্রু অল্প যদি তবু নাশের কারণ।
মূলস্থ বল্মীক যেন গ্রাসে তরুগণ॥
আপনি জানিয়া কেন করহ বঞ্চন।
নিশ্চয় জানিনু চাহ আমার নিধন॥
পুনঃ ধৃতরাষ্ট্র বলে, মধুর বচনে।
নিবারিতে না পারিল পুত্র দুর্যোধনে॥
দৈবগতি জানিয়া বিদুরে ডাকাইল।
যুধিষ্ঠিরে আন গিয়া বলি আজ্ঞা দিল॥
বিদুর বলিল, রাজা, শ্রেয় নহে কথা।
কুলনাশ হইবে জানিয়া পাই ব্যথা॥
অন্ধ বলে, আমারে সে না বলিহ আর।
দৈববশ দেখি এই সকল সংসার॥
নারিল বিদুর আজ্ঞা করিতে হেলন।
রথে চড়ি ইন্দ্রপ্রস্থে করিল গমন॥

ইন্দ্রজিতের যজ্ঞগৃহে লক্ষ্মণ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

কুশাসনে ইন্দ্রজিৎ পূজে ইষ্টদেবে
নিভৃতে; কৌষিক বস্ত্র, কৌষিক উত্তরী,
চন্দনের ফোঁটা ভালে, ফুলমালা গলে।
পুড়ে ধূপদানে ধূপ; জ্বলিছে চৌদিকে
পূত ঘৃতরসে দীপ; পুষ্প রাশি রাশি,
গণ্ডারের শৃঙ্গে গড়া কোষা কোষী ভরা,
হে জাহ্নবি, তব জলে, কলুষনাশিনী
তুমি! পাশে হেম-ঘণ্টা, উপহার নানা,

হেম-পাত্রে; রুদ্ধ দ্বার;—বসেছে একাকী
রথীন্দ্র, নিমগ্ন তপে চন্দ্রচূড় যেন
যোগীন্দ্র,—কৈলাস গিরি, তব উচ্চ চূড়ে!
যথা ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্র পশে গোষ্ঠগৃহে
যমদূত, ভীমবাহু লক্ষ্মণ পশিলা
মায়াবলে দেবালয়ে। ঝন্‌ঝনিল অসি
পিধানে, ধ্বনিল বাজি তূণীর ফলকে,
কাঁপিল মন্দির ঘন বীরপদভরে।
চমকি মুদিত আঁখি মিলিলা রাবণি।
দেখিলা সম্মুখে বলী দেবাকৃতি রথী—
তেজস্বী মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশুমালী!
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি শূর, কৃতাঞ্জলিপুটে,
কহিলা, "হে বিভাবসু, শুভক্ষণে আজি
পূজিল তোমারে দাস, তেঁই, প্রভু, তুমি
পবিত্রিলা লঙ্কাপুরী ও-পদ অর্পণে!
কিন্তু কি কারণে, কহ, তেজস্বি, আইলা
রক্ষঃকুলরিপু নর লক্ষ্মণের রূপে
প্রসাদিতে এ অধীনে! এ কি লীলা তব,
প্রভাময়?" পুনঃ বলী নমিলা ভূতলে।
উত্তরিলা বীরদর্পে রৌদ্র দাশরথি,
"নহি বিভাবসু আমি, দেখ নিরখিয়া,
রাবণি! লক্ষ্মণ নাম, জন্ম রঘুকুলে!
সংহারিতে, বীরসিংহ, তোমায় সংগ্রামে
আগমন হেথা মম; দেহ রণ মোরে
অবিলম্বে।" যথা পথে সহসা হেরিলে
ঊর্ধ্বফণা ফণীশ্বরে, ত্রাসে হীনগতি
পথিক, চাহিলা বলী লক্ষ্মণের পানে।
সভয় হইল আজি ভয়শূন্য হিয়া!
প্রচণ্ড উত্তাপে পিণ্ড, হায় রে, গলিল!
গ্রাসিল মিহিরে রাহু, সহসা আঁধারি
তেজঃপুঞ্জ! অম্বুনাথে নিদাঘ শুষিল!
পশিল কৌশলে কলি নলের শরীরে!

বিস্ময়ে কহিলা শূর, "সত্য যদি তুমি
রামানুজ, কহ, রথি, কি ছলে পশিলা
রক্ষোরাজপুরে আজি? রক্ষঃ শত শত,
যক্ষপতিত্রাস বলে, ভীম-অস্ত্র-পাণি,
রক্ষিছে নগর-দ্বার; শৃঙ্গধরসম
এ পুর-প্রাচীর উচ্চ; প্রাচীর উপরে
ভ্রমিছে অযুত যোধ চক্রাবলীরূপে;—
কোন্ মায়াবলে, বলি, ভুলালে এ সবে?
মানবকুলসম্ভব, দেবকুলোদ্ভব
কে আছে রথী এ বিশ্বে, বিমুখয়ে রণে
একাকী এ রক্ষোবৃন্দে? এ প্রপঞ্চে তবে
কেন বঞ্চাইছ দাসে, কহ তা দাসেরে,
সর্বভুক্? কি কৌতুক এ তব, কৌতুকি?
নহে নিরাকার দেব, সৌমিত্রি; কেমনে
এ মন্দিরে পশিবে সে? এখনও দেখ
রুদ্ধ দ্বার! বর, প্রভু, দেহ এ কিঙ্করে
নিঃশঙ্ক করিব লঙ্কা বধিয়া রাঘবে
আজি, খেদাইব দূরে কিষ্কিন্ধ্যা-অধিপে,
বাঁধি আনি রাজপদে দিব বিভীষণে
রাজদ্রোহী। ওই শুন, নাদিছে চৌদিকে
শৃঙ্গ শৃঙ্গনাদিগ্রাম! বিলম্বিলে আমি,
ভগ্নোদ্যম রক্ষঃ-চমূ, বিদাও আমারে!"

উত্তরিলা দেবাকৃতি সৌমিত্রি কেশরী,—
"কৃতান্ত আমি রে তোর, দুরন্ত রাবণি!
মাটি কাটি দংশে সর্প আয়ুহীন জনে!
মদে মত্ত সদা তুই; দেব-বলে বলী,
তবু অবহেলা, মূঢ়, করিস সতত
দেবকুলে! এত দিনে মজিলি দুর্মতি;
দেবাদেশে রণে আমি আহ্বানি রে তোরে!"

এতেক কহিয়া বলী উলঙ্গিলা অসি
ভৈরবে! ঝলসি আঁখি কালানল-তেজে,
ভাতিল কৃপাণবর, শত্রুকরে যথা

ইরম্মদময় বজ্র! কহিলা রাবণি,—
"সত্য যদি রামানুজ তুমি, ভীমবাহু
লক্ষ্মণ; সংগ্রাম-সাধ অবশ্য মিটাব
মহাহবে আমি তব, বিরত কি কভু
রণরঙ্গে ইন্দ্রজিৎ? আতিথেয় সেবা,
তিষ্ঠি, লহ, শূরশ্রেষ্ঠ, প্রথমে এ ধামে—
রক্ষোরিপু তুমি, তবু অতিথি হে এবে।
সাজি বীরসাজে আমি। নিরস্ত্র যে অরি,
নহে রথিকুলপ্রথা আঘাতিতে তারে।
এ বিধি, হে বীরবর, অবিদিত নহে,
ক্ষত্র তুমি, তব কাছে;—কি আর কহিব?"
জলদ-প্রতিম স্বনে কহিলা সৌমিত্রি,—
"আনায়-মাঝারে বাঘে পাইলে কি কভু
ছাড়ে রে কিরাত তারে? বধিব এখনি,
অবোধ, তেমতি তোরে! জন্ম রক্ষঃকুলে
তোর, ক্ষত্রধর্ম, পাপি, কি হেতু পালিব
তোর সঙ্গে? মারি অরি, পারি যে কৌশলে!"
কহিলা বাসবজেতা, (অভিমন্যু যথা
হেরি সপ্ত শূরে শূর তপ্তলৌহাকৃতি
রোষে!) "ক্ষত্রকুলগ্লানি, শত ধিক্ তোরে,
লক্ষ্মণ! নির্লজ্জ তুই। ক্ষত্রিয় সমাজে
রোধিবে শ্রবণপথ ঘৃণায়, শুনিলে
নাম তোর রথিবৃন্দ! তস্কর যেমতি,
পশিলি এ গৃহে তুই; তস্কর-সদৃশ
শাস্তিয়া নিরস্ত তোরে করিব এখনি!
পশে যদি কাকোদর গরুড়ের নীড়ে,
ফিরি কি সে যায় কভু আপন বিবরে,
পামর! কে তোরে হেথা আনিল দুর্মতি?"
চক্ষের নিমিষে কোষা তুলি ভীমবাহু
নিক্ষেপিলা ঘোর নাদে লক্ষ্মণের শিরে।
পড়িলা ভূতলে বলী ভীম প্রহরণে,
পড়ে তরুরাজ যথা প্রভঞ্জনবলে

মড়মড়ে! দেব-অস্ত্র বাজিল ঝন্‌ঝনি,
কাঁপিল দেউল যেন ঘোর ভূকম্পনে!
বহিল রুধির-ধারা! ধরিলা সত্বরে
দেব-অসি ইন্দ্রজিৎ;—নারিলা তুলিতে
তাহায়! কার্ম্মুক ধরি কর্ষিলা; রহিল
সৌমিত্রির হাতে ধনুঃ! সাপটিলা কোপে
ফলক; বিফল বল সে কাজ সাধনে!
যথা শুণ্ডধর টানে শুণ্ডে জড়াইয়া
শৃঙ্গধরশৃঙ্গে বৃথা, টানিলা তূণীরে
শূরেন্দ্র! মায়ার মায়া কে বুঝে জগতে?
চাহিলা দুয়ার পানে অভিমানে মানী।
সচকিতে বীরবর দেখিলা সম্মুখে
ভীমতম শূল হস্তে, ধূমকেতুসম
খুল্লতাত বিভীষণে—বিভীষণ রণে!

বিজয়া-দশমী

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

"যেয়ো না, রজনী, আজি লয়ে তারাদলে!
গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরান যাবে!—
উদিলে নির্দয় রবি উদয়-অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে!
বার মাস তিতি, সতি, নিত্য অশ্রুজলে,
পেয়েছি উমায় আমি! কি সান্ত্বনা-ভাবে—
তিনটি দিনেতে, কহ, লো তারা-কুন্তলে,
এ দীর্ঘ বিরহ-জ্বালা এ মনঃ জুড়াবে?
তিন দিন স্বর্ণদীপ জ্বলিতেছে ঘরে
দূর করি অন্ধকার; শুনিতেছি বাণী—

মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে, এ কর্ণ-কুহরে!
দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে, আমি জানি,
নিবাও এ দীপ যদি!"—কহিলা কাতরে
নবমীর নিশা-শেষে গিরীশের রানী।

দধীচির তনুত্যাগ

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অগ্রসরি শচীপতি সহস্রলোচন
তপোধনশিরঃ স্পর্শি সুকরকমলে,
কহিলা আকুল স্বরে (শুনি ঋষিকুল
হরষবিষাদে মুগ্ধ), কহিলা বাসব,
"সাধুশিরোরত্ন ঋষি, তুমিই সাত্ত্বিক!
তুমিই বুঝিলা সার জীবের সাধন!
তুমিই সাধিলা ব্রত এ জগতী-তলে
চিরমোক্ষফলপ্রদ—নিত্যহিতকর!...
কর্তব্য নরের নিত্য স্বার্থপরিহার,
জীবকুলকল্যাণসাধন অনুদিন!
পরহিতব্রত, ঋষি, ধর্ম যে পরম
তুমিই বুঝিয়াছিলে—উদ্‌যাপিলে আজ!...
কী বর অর্পিব আর, নিষ্কাম তাপস,
না চাহিলা কোনো বর; এ সুকীর্তি তব
প্রাতঃস্মরণীয় নিত্য হবে নরকুলে!
তব বংশে জনমি মহর্ষি দ্বৈপায়ন
করিবে জগতখ্যাত এ আশ্রম তব—
পুণ্য বদরিকাশ্রম পুণ্যভূমি-মাঝে।"
বলিয়া রোমাঞ্চতনু হইলা বাসব
নিরখি মুনীন্দ্রমুখে শোভা নিরমল।

আরম্ভিলা তারস্বরে চতুর্বেদগান,
উচ্চে হরিসংকীর্তন মধুর গম্ভীর।
বাষ্পাকুল শিষ্যবৃন্দ; ধ্যানমগ্ন ঋষি
মুদিলা নয়নদ্বয় বিপুল উল্লাসে!...
দেখিতে দেখিতে নেত্র হইল নিশ্চল,
নাসিকা নিশ্বাসশূন্য, নিস্পন্দ ধমনী,
বাহিরিল ব্রহ্মতেজ ব্রহ্মরন্ধ্র ফুটি
নিরুপম জ্যোতিঃপূর্ণ—ক্ষণে শূন্যে উঠি
মিশাইল শূন্যদেহে। বাজিল গম্ভীর
পাঞ্চজন্য হরিশঙ্খ; শূন্যদেশ যুড়ি
পুষ্পাসার বরষিল মুনীন্দ্রে আচ্ছাদি।
দধীচি ত্যজিলা তনু দেবের মঙ্গলে।

বন্দে মাতরম্

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।
সপ্তকোটিকণ্ঠকলকলনিনাদকরালে,
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃতখর-করবালে,
অবলা কেন মা এত বলে।
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং রিপুদলবারিণীং মাতরম্।
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।

বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমল-দলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাম্
নমামি কমলাম্ অমলাম্ অতুলাং সুজলাং সুফলাং মাতরম্।
বন্দে মাতরম্
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং ধরণীং ভরণীং মাতরম্॥

আশা

নবীনচন্দ্র সেন

ধন্য, আশা কুহকিনি! তোমার মায়ায়
মুগ্ধ মানবের মন, মুগ্ধ ত্রিভুবন।
দুর্বল মানবমনোমন্দিরে তোমায়
যদি না সৃজিত বিধি, হায় অনুক্ষণ
নাহি বিরাজিতে তুমি যদি সে মন্দিরে—
শোক, দুঃখ, ভয়, ত্রাস, নিরাশপ্রণয়,
চিন্তার অচিন্ত্য অস্ত্র নাশিত অচিরে
সে মনোমন্দিরশোভা! পলাত নিশ্চয়
অধিষ্ঠাত্রী জ্ঞানদেবী ছাড়িয়া আবাস;
উন্মত্ততা ব্যাঘ্ররূপে করিত নিবাস।

ধন্য, আশা কুহকিনি! তোমার মায়ায়
অসার সংসারচক্র ঘোরে নিরবধি!
দাঁড়াইত স্থিরভাবে, চলিত না হায়,
মন্ত্রবলে তুমি চক্র না ঘুরাতে যদি!

ভবিষ্যৎ-অন্ধ মূঢ় মানবসকল
ঘুরিতেছে কর্মক্ষেত্রে বর্তুল-আকার
তব ইন্দ্রজালে মুগ্ধ; পেয়ে তব বল
যুঝিছে জীবনযুদ্ধ, হায়, অনিবার।
নাচায় পুতুল যথা দক্ষ বাজিকরে,
নাচাও তেমতি তুমি অর্বাচীন নরে।

ওই যে কাঙাল বসি রাজপথধারে
দীনতার প্রতিমূর্তি—কঙ্কালশরীর,
জীর্ণ পরিধেয় বস্ত্র দুর্গন্ধ-আধার,
দু নয়নে অভাগার বহিতেছে নীর।
ভিক্ষা করি দ্বারে দ্বারে এ তিন প্রহর
পাইয়াছে যাহা তাহে জঠর-অনল
নাহি হবে নির্বাপিত; রুগ্ণ কলেবর;
চলে না চরণ, চক্ষে ঘোরে ধরাতল।
কী মন্ত্র কহিলে তুমি অভাগার কানে,
চলিল অভাগা পুনঃ ভিক্ষার সন্ধানে।

অথবা সুদূরে কেন করি অন্বেষণ?
দুরাশার মন্ত্রে মুগ্ধ আমি মূঢ়মতি!
নতুবা যে পথে কোনো কবি বিচরণ
করে নি, সে পথে কেন হবে মম গতি?
বঙ্গ-ইতিহাস, হায়, মণিপূর্ণ খনি!
কবির কল্পনালোকে কিন্তু আলোকিত
নহে যা, কেমনে আমি, বলো কুহকিনি,
মম ক্ষুদ্র কল্পনায় করি প্রকাশিত?
না আলোকে যদি শশী তিমিরা রজনী,
নক্ষত্রের নহে সাধ্য উজলে ধরণী।

কোন্ পুণ্যবলে সেই খনির ভিতরে
প্রবেশি গাঁথিয়া মালা অবিদ্ধ রতনে
দোলাইব মাতৃভাষা-কম-কলেবরে—

সুকবি-সুকরে গাঁথা মহাকাব্যধনে
সজ্জিত যে বরবপুঃ? কিম্বা অসম্ভব
নহে কিছু, হে দুরাশে, তোমার মায়ায়;
কত ক্ষুদ্র নর, ধরি পদছায়া তব
লভিয়াছে অমরতা, এ মর ধরায়;
অতএব দয়া করি কহো, দয়াবতি,
কী চিত্রে রঞ্জিছ আজি শ্বেতসেনাপতি?

মা

দেবেন্দ্রনাথ সেন

তবু ভরিল না চিত্ত! ঘুরিয়া ঘুরিয়া
কত তীর্থ হেরিলাম! বন্দিনু পুলকে
বৈদ্যনাথে; মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডে গিয়া
কাঁদিলাম চিরদুঃখী জানকীর দুঃখে;
হেরিনু বিন্ধ্যবাসিনী বিন্ধ্যে আরোহিয়া:
করিলাম পুণ্য-স্নান ত্রিবেণী-সঙ্গমে;
"জয় বিশ্বেশ্বর" বলি ভৈরবে বেড়িয়া,
করিলাম কত নৃত্য; প্রফুল্ল আশ্রমে
রাধা-শ্যামে নিরখিয়া হইয়া উতলা,
গীত-গোবিন্দের শ্লোক গাহিয়া গাহিয়া
ভ্রমিলাম কুঞ্জে কুঞ্জে; পান্ডারা আসিয়া
গলে পরাইয়া দিল বর-গুঞ্জামালা।

তবু ভরিল না চিত্ত! সর্বতীর্থ-সার,
তাই, মা, তোমার পাশে, এসেছি আবার!

S.C.E.R.T. W.B. LIBRA
Date
Accn. No. 9356

মধ্যাহ্নে

অক্ষয়কুমার বড়াল

একেলা জগৎ ভুলে পড়ে আছি নদীকূলে
পড়েছে নধর বট হেলে ভাঙা তীরে;
ঝুরু ঝুরু পাতাগুলি কাঁপিছে সমীরে।
চাতক কাতরে ডাকে, চরে বক নদী-বাঁকে
ডাকে কুবো কুব্ কুব্ লুকায়ে কোথায়!
গাভী শুয়ে তরুতলে, হংসী ডুবে উঠে জলে,
ডিঙাখানি বেঁধে কূলে জেলে ঘরে যায়।

দূরেতে পথিক দুটি চ'লে যায় গুটি গুটি
মেঠো পথ দিয়া।
পাশ দিয়ে নিয়ে জল আঁখি দুটি ঢল ঢল
কুলবধূ দ্রুত গেল লাজে চমকিয়া।
নিঝুম মধ্যাহ্নকাল অলস-স্বপন-জাল
রচিতেছে অন্যমনে হৃদয় ভরিয়া।
দূর-মাঠ-পানে চেয়ে চেয়ে চেয়ে শুধু চেয়ে
রয়েছি পড়িয়া।

হৃদয় এলায়ে পড়ে যেন কী স্বপন-ভরে
মুদে আসে আঁখিপাতা যেন কী আরামে!
অন্যমনে চাহি চাহি কত ভাবি, কত গাহি,
পড়িছে গভীর শ্বাস গানের বিরামে।
খ'সে খ'সে পড়ে পাতা মনে পড়ে কত গাথা—
ছায়া-ছায়া কত ব্যথা ঘুরে ধরাধামে।

পুরাতন ভৃত্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভূতের মতন চেহারা যেমন, নির্বোধ অতি ঘোর।
যা-কিছু হারায় গিন্নি বলেন, কেষ্টা বেটাই চোর।
উঠিতে বসিতে করি বাপান্ত, শুনেও শোনে না কানে।
যত পায় বেত না পায় বেতন, তবু না চেতন মানে।
বড়ো প্রয়োজন, ডাকি প্রাণপণ চীৎকার করি 'কেষ্টা'—
যত করি তাড়া নাহি পাই সাড়া, খুঁজে ফিরি সারা দেশটা।
তিনখানা দিলে একখানা রাখে, বাকি কোথা নাহি জানে—
একখানা দিলে নিমেষ ফেলিতে তিনখানা ক'রে আনে।
যেখানে সেখানে দিবসে দুপুরে নিদ্রাটি আছে সাধা—
মহাকলরবে গালি দেই যবে 'পাজি হতভাগা গাধা'
দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সে হাসে, দেখে জ্বলে যায় পিত্ত।
তবু মায়া তার ত্যাগ করা ভার—বড়ো পুরাতন ভৃত্য॥

ঘরের কর্ত্রী রুক্ষমূর্তি বলে, 'আর পারি নাকো।
রহিল তোমার এ ঘরদুয়ার, কেষ্টারে লয়ে থাকো।
না মানে শাসন, বসন বাসন অশন আসন যত
কোথায় কী গেল, শুধু টাকাগুলো যেতেছে জলের মতো।
গেলে সে বাজার সারা দিনে আর দেখা পাওয়া তার ভার।
করিলে চেষ্টা কেষ্টা ছাড়া কি ভৃত্য মেলে না আর!'
শুনে মহা রেগে ছুটে যাই বেগে, আনি তার টিকি ধরে;
বলি তারে, 'পাজি, বেরো তুই আজই, দূর করে দিনু তোরে।'
ধীরে চলে যায়, ভাবি গেল দায়; পরদিনে উঠে দেখি
হুঁকাটি বাড়ায়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে বেটা বুদ্ধির ঢেঁকি।
প্রসন্ন মুখ, নাহি কোনো দুখ, অতি অকাতর চিত্ত।
ছাড়ালে না ছাড়ে, কী করিব তারে—মোর পুরাতন ভৃত্য॥

সে বছরে ফাঁকা পেনু কিছু টাকা করিয়া দালালিগিরি।
করিলাম মন শ্রীবৃন্দাবন বারেক আসিব ফিরি।

পরিবার তায় সাথে যেতে চায়; বুঝায়ে বলিনু তারে—
পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য, নহিলে খরচ বাড়ে।
লয়ে রশারশি করি কষাকষি পোঁটলাপুঁটলি বাঁধি
বলয় বাজায়ে বাক্স সাজায়ে গৃহিণী কহিল কাঁদি,
'পরদেশে গিয়ে কেষ্টারে নিয়ে কষ্ট অনেক পাবে।'
আমি কহিলাম, 'আরে রাম রাম, নিবারণ সাথে যাবে।'
রেলগাড়ি ধায়; হেরিলাম হায় নামিয়া বর্ধমানে
কৃষ্ণকান্ত অতি প্রশান্ত তামাক সাজিয়া আনে।
স্পর্ধা তাহার হেনমতে আর কত বা সহিব নিত্য!
যত তারে দুষি তবু হনু খুশি হেরি পুরাতন ভৃত্য॥

নামিনু শ্রীধামে; দক্ষিণে বামে পিছনে সমুখে যত
লাগিল পাণ্ডা, নিমেষে প্রাণটা করিল কণ্ঠাগত।
জন ছয়-সাতে মিলি একসাথে পরম বন্ধুভাবে
করিলাম বাসা; মনে হল আশা আরামে দিবস যাবে।
কোথা ব্রজবালা! কোথা বনমালা! কোথা বনমালী হরি!
কোথা হা হন্ত, চিরবসন্ত! আমি বসন্তে মরি।
বন্ধু যে যত স্বপ্নের মতো বাসা ছেড়ে দিল ভঙ্গ;
আমি একা ঘরে, ব্যাধিখরশরে ভরিল সকল অঙ্গ।
ডাকি নিশিদিন সকরুণ ক্ষীণ, 'কেষ্ট, আয় রে কাছে।
এতদিনে শেষে আসিয়া বিদেশে প্রাণ বুঝি নাহি বাঁচে।'
হেরি তার মুখ ভরে ওঠে বুক, সে যেন পরম বিত্ত।
নিশিদিন ধরে দাঁড়ায়ে শিয়রে মোর পুরাতন ভৃত্য॥

মুখে দেয় জল, শুধায় কুশল, শিরে দেয় মোর হাত,
দাঁড়ায়ে নিঝুম, চোখে নাই ঘুম, মুখে নাই তার ভাত।
বলে বার বার, 'কর্তা, তোমার কোনো ভয় নাই, শুন।
যাবে দেশে ফিরে, মাঠাকুরানীরে দেখিতে পাইবে পুন।'
লভিয়া আরাম আমি উঠিলাম, তাহারে ধরিল জ্বরে;
নিল সে আমার কালব্যাধিভার আপনার দেহ-'পরে।
হয়ে জ্ঞানহীন কাটিল দু দিন, বন্ধ হইল নাড়ী—
এতবার তারে গেনু ছাড়াবারে, এতদিনে গেল ছাড়ি।

বহুদিন পরে আপনার ঘরে ফিরিনু সারিয়া তীর্থ—
আজ সাথে নেই চিরসাথি সেই মোর পুরাতন ভৃত্য॥

দুই বিঘা জমি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই, আর সবই গেছে ঋণে।
বাবু বলিলেন, "বুঝেছ উপেন? এ জমি লইব কিনে।"
কহিলাম আমি, "তুমি ভূস্বামী, ভূমির অন্ত নাই।
চেয়ে দেখো মোর আছে বড়ো-জোর মরিবার মতো ঠাঁই।"
শুনি রাজা কহে, "বাপু, জান তো হে, করেছি বাগানখানা,
পেলে দুই বিঘে প্রস্থে ও দীঘে সমান হইবে টানা—
ওটা দিতে হবে।" কহিলাম তবে বক্ষে জুড়িয়া পাণি
সজলচক্ষে, "করুন রক্ষে গরিবের ভিটেখানি।
সপ্ত পুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোনার বাড়া!
দৈন্যের দায়ে বেচিব সে মায়ে এমনি লক্ষ্মীছাড়া!"
আঁখি করি লাল রাজা ক্ষণকাল রহিল মৌনভাবে;
কহিলেন শেষে ক্রূর হাসি হেসে, "আচ্ছা, সে দেখা যাবে।"

পরে মাস-দেড়ে ভিটেমাটি ছেড়ে বাহির হইনু পথে—
করিল ডিক্রি, সকলি বিক্রি মিথ্যা দেনার খতে।
এ জগতে হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি!
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি!
মনে ভাবিলাম, মোরে ভগবান রাখিবে না মোহগর্তে,
তাই লিখি দিল বিশ্বনিখিল দু বিঘার পরিবর্তে।
সন্ন্যাসীবেশে ফিরি দেশে দেশে হইয়া সাধুর শিষ্য—
কত হেরিলাম মনোহর ধাম, কত মনোরম দৃশ্য।
ভূধরে সাগরে বিজনে নগরে যখন যেখানে ভ্রমি,
তবু নিশিদিনে ভুলিতে পারি নে সেই দুই বিঘা জমি।

Institute of Education ... Govt. of West Bengal

হাটে মাঠে বাটে এইমত কাটে বছর পনেরো-ষোলো,
এক দিন শেষে ফিরিবারে দেশে বড়োই বাসনা হল।

নমোনমো নমঃ সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি—
গঙ্গার তীর, স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।
অবারিত মাঠ, গগনললাট চুমে তব পদধূলি—
ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলি।
পল্লবঘন আম্রকানন রাখালের খেলাগেহ—
স্তব্ধ অতল দিঘি কালোজল, নিশীথশীতল স্নেহ।
বুক-ভরা মধু, বঙ্গের বধূ জল লয়ে যায় ঘরে—
"মা" বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভরে।
দুই দিন পরে দ্বিতীয় প্রহরে প্রবেশিনু নিজগ্রামে,
কুমোরের বাড়ি দক্ষিণে ছাড়ি, রথতলা করি বামে—
রাখি হাটখোলা, নন্দীর গোলা, মন্দির করি পাছে
তৃষাতুর শেষে পঁহুছিনু এসে আমার বাড়ির কাছে।

বিদীর্ণ-হিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া চারি দিকে চেয়ে দেখি—
প্রাচীরের কাছে এখনো যে আছে সেই আমগাছ, একি!
বসি তার তলে নয়নের জলে শান্ত হইল ব্যথা,
একে একে মনে উদিল স্মরণে বালক-কালের কথা।
সেই মনে পড়ে, জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে রাত্রে নাহিক ঘুম—
অতি ভোরে উঠি তাড়াতাড়ি ছুটি আম কুড়াবার ধুম;
সেই সুমধুর স্তব্ধ দুপুর, পাঠশালা-পলায়ন—
ভাবিলাম, হায়, আর কি কোথায় ফিরে পাব সে জীবন!
সহসা বাতাস ফেলি গেল শ্বাস শাখা দুলাইয়া গাছে;
দুটি পাকা ফল লভিল ভূতল আমার কোলের কাছে।
ভাবিলাম মনে, বুঝি এতখনে আমারে চিনিল মাতা—
স্নেহের সে দানে বহু সম্মানে বারেক ঠেকানু মাথা!

হেনকালে হায়, যমদূতপ্রায় কোথা হতে এল মালী,
ঝুঁটি-বাঁধা উড়ে সপ্তম সুরে পাড়িতে লাগিল গালি!

কহিলাম তবে, "আমি তো নীরবে দিয়েছি আমার সব—
দুটি ফল তার করি অধিকার, এত তারি কলরব!"
চিনিল না মোরে, নিয়ে গেল ধরে কাঁধে তুলি লাঠিগাছ;
বাবু ছিপ হাতে পারিষদ-সাথে ধরিতেছিলেন মাছ।
শুনি বিবরণ ক্রোধে তিনি কন, "মারিয়া করিব খুন।"
বাবু যত বলে পারিষদ-দলে বলে তার শতগুণ।
আমি কহিলাম, "শুধু দুটি আম ভিখ মাগি মহাশয়!"
বাবু কহে হেসে, "বেটা সাধুবেশে পাকা চোর অতিশয়।"
আমি শুনে হাসি, আঁখিজলে ভাসি, এই ছিল মোর ঘটে—
তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে।

দিদি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নদীতীরে মাটি কাটে সাজাইতে পাঁজা
পশ্চিমি মজুর। তাহাদেরই ছোটো মেয়ে
ঘাটে করে আনাগোনা, কত ঘষা মাজা
ঘটি বাটি থালা লয়ে। আসে ধেয়ে ধেয়ে
দিবসে শতেকবার, পিত্তলকঙ্কণ
পিতলের থালি-'পরে বাজে ঠন্ ঠন্।
বড়ো ব্যস্ত সারাদিন। তারি ছোটো ভাই,
নেড়ামাথা, কাদামাখা, গায়ে বস্ত্র নাই,
পোষা পাখিটির মতো পিছে পিছে এসে
বসি থাকে উচ্চ পাড়ে দিদির আদেশে
স্থির ধৈর্যভরে। ভরা ঘট লয়ে মাথে,
বামকক্ষে থালি, যায় বালা ডান হাতে
ধরি শিশুকর। জননীর প্রতিনিধি,
কর্মভারে অবনত অতি-ছোটো দিদি॥

বঙ্গমাতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে
হে স্নেহার্ত বঙ্গভূমি—তব গৃহক্রোড়ে
চিরশিশু ক'রে আর রাখিয়ো না ধরে।
দেশদেশান্তর-মাঝে যার যেথা স্থান
খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান।
পদে পদে ছোটো ছোটো নিষেধের ডোরে
বেঁধে বেঁধে রাখিয়ো না ভালো-ছেলে ক'রে।
প্রাণ দিয়ে, দুঃখ সয়ে, আপনার হাতে
সংগ্রাম করিতে দাও ভালো-মন্দ-সাথে।
শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধ'রে
দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া ক'রে।
সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালি ক'রে মানুষ কর নি।

ধূলামন্দির

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক্ পড়ে।
রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে কেন আছিস ওরে?
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন-মনে
কাহারে তুই পূজিস সংগোপনে?
নয়ন মেলে দেখ্ দেখি তুই চেয়ে, দেবতা নাই ঘরে।

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষা চাষ—
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ, খাটছে বারো মাস।
রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে,
ধুলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে;
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি আয় রে ধুলার 'পরে।

মুক্তি? ওরে, মুক্তি কোথায় পাবি! মুক্তি কোথায় আছে!
আপনি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন প'রে বাঁধা সবার কাছে।
রাখো রে ধ্যান, থাক্ রে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধুলাবালি।
কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে ঘর্ম পড়ুক ঝরে।

ভারতবিধাতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জনগণ-মন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছলজলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে॥

অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি' তব উদার বাণী
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খৃষ্টানী
পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন-পাশে
প্রেমহার হয় গাঁথা।
জনগণ-ঐক্য-বিধায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে॥

পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা, যুগযুগধাবিত যাত্রী—
হে চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।
দারুণ বিপ্লবমাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে
সংকটদুঃখত্রাতা।
জনগণপথপরিচায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে॥

ঘোরতিমিরঘন নিবিড় নিশীথে পীড়িত মূর্ছিত দেশে
জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নতনয়নে অনিমেষে।
দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে রক্ষা করিলে অঙ্কে
স্নেহময়ী তুমি মাতা।
জনগণদুঃখত্রায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে॥

রাত্রি প্রভাতিল, উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব-উদয়গিরি-ভালে—
গাহে বিহঙ্গম, পুণ্য সমীরণ নবজীবনরস ঢালে।
তব করুণারুণরাগে নিদ্রিত ভারত জাগে
তব চরণে নত মাথা।
জয় জয় জয় হে, জয় রাজেশ্বর ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে॥

ভারতবর্ষ

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননি! ভারতবর্ষ!
উঠিল বিশ্বে সে কী কলরব, সে কী মা ভক্তি; সে কী মা হর্ষ!
সেদিন তোমার প্রভায় ধরার প্রভাত হইল গভীর রাত্রি;
বন্দিল সবে, "জয় মা জননি! জগত্তারিণি! জগদ্ধাত্রি!"

ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!"

সদ্যঃস্নান-সিক্তবসনা চিকুর সিন্ধুশীকরলিপ্ত।
ললাটে গরিমা, বিমল হাস্যে অমল কমল-আনন দীপ্ত;
উপরে গগন ঘেরিয়া নৃত্য করিছে—তপন তারকা চন্দ্র;
মন্ত্রমুগ্ধ, চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদমন্দ্র।

ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ।"

শীর্ষে শুভ্র তুষারকিরীট, সাগর-ঊর্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা,
বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার—পঞ্চসিন্ধু যমুনা গঙ্গা।
কখন মা তুমি ভীষণ দীপ্ত তপ্ত মরুর উষর দৃশ্যে;
হাসিয়া কখন শ্যামল শস্যে, ছড়ায়ে পড়িছ নিখিল বিশ্বে।

ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!"

উপরে পবন প্রবল স্বননে শূন্যে গরজি অবিশ্রান্ত,
লুটায়ে পড়িছে পিক-কলরবে, চুম্বি তোমার চরণপ্রান্ত,
উপরে, জলদ হানিয়া বজ্র, করিয়া প্রলয়-সলিল-বৃষ্টি—
চরণে তোমার, কুঞ্জকানন কুসুমগন্ধ করিছে সৃষ্টি!

ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!"

জননি, তোমার বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে তোমার অভয়-উক্তি,
হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার বিতর মুক্তি;
জননি! তোমার সন্তান-তরে কত-না বেদনা কত-না হর্ষ;
জগৎপালিনি! জগত্তারিণি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ।

ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!"

মা আমার

কামিনী রায়

যেই দিন ও-চরণে ডালি দিনু এ জীবন,
হাসি-অশ্রু সেই দিন করিয়াছি বিসর্জন।
হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর,
দুখিনী জনমভূমি—মা আমার, মা আমার!

অনল পুষিতে চাহি আপনার হিয়া-মাঝে,
আপনারে অপরেরে নিয়োজিতে তব কাজে;
ছোটখাটো সুখ-দুঃখ—কে হিসাব রাখে তার,
তুমি যবে চাহ কাজ—মা আমার, মা আমার!

অতীতের কথা কহি বর্তমান যদি যায়,
সে কথাও কহিব না, হৃদয়ে জপিব তায়।
গাহি যদি কোনো গান, গাব তবে অনিবার,
মরিব তোমারি তরে—মা আমার, মা আমার!

মরিব তোমারি কাজে, বাঁচিব তোমারি তরে,
নহিলে বিষাদময় এ জীবন কে বা ধরে!
যত দিনে না ঘুচিবে তোমার কলঙ্কভার,
থাক্ প্রাণ, যাক্ প্রাণ—মা আমার, মা আমার!

দ্বিধা

প্রিয়ংবদা দেবী

পরিব্যাপ্ত নীলিমায় সম্মুখ আকাশে
নির্মল প্রসন্ন দৃষ্টি সূর্যরশ্মি হাসে
বরদাত্রী অভয়ার মত; দূরতর
দিগন্ত সীমায়, ঘন কৃষ্ণ মেঘস্তর
নেমেছে প্রান্তরে, যেন স্থান নাহি তার
অপার আকাশে; চমকিছে চপলার
বিহ্বল প্রলয়-দীপ্তি ত্রস্ত ক্ষণে ক্ষণে,
উঠিতেছে পড়িতেছে মত্ত আন্দোলনে
দ্রুমদল, পবনের ভৈরব আক্রোশে;
চেয়ে আছি ব্যাকুল আগ্রহে,—রুদ্ররোষে
মেঘপুঞ্জ আবরিবে মংগল-কিরণে,
অথবা আনিবে বর্ষা করুণা-প্লাবন;
হবে ইন্দ্রধনু মিশি হাসি অশ্রুজল
ব্যাপি সীমাহীন নভ, স্পর্শি ধরাতল।

বাঙালীর মা

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

হিমাদ্রি তোমার শিরে তুষারের শ্বেত ছত্র ধরে,
মেঘের ঝালর তায় ঢেউ খেলি দিক্ শোভা করে।
গর্জে নিম্নে গর্ গর্ লক্ষফণা অজগর—
বঙ্গসিন্ধু পদযুগ শিরে রাখি যতনে ধোয়ায়,
অঙ্গে অঙ্গে পুষ্পগন্ধ, মিষ্ট বায়ু চামর ঢুলায়।

তব মুক্তবেণীসম শোভা পায় সুনীল অটবী,
কাঞ্চীসম কটি বেড়ি ধ্বনিতেছে নাচিয়া জাহ্নবী।
হিরণ-হরিতে গড়া সরিতে সরিতে ভরা
আনন্দভুবন তব আমোদিত কলকলগীতে,
স্বর্গ নামে তব দ্বারে তোমার ও-ধূলায় লুটিতে।

চরে তব শ্যাম গোঠে বেণুরবে ধবলী শ্যামলী,
কুঞ্জ দেয় ফুলপুঞ্জে পাদপদ্মে পরান অঞ্জলি।
রবি দেয় নিত্য প্রাতে কিরণকমল হাতে,
জ্যোৎস্না নামে মৃদুপদে ঝাঁপি ল'য়ে লক্ষ্মীর মতন
রঞ্জিতে অলক্তরাগে তোমার ও-রাতুল চরণ।

ব্রহ্মপুত্র দামোদর বৈতালিক দুটি জলসখা,
নাচে পদ্মা ঝঞ্ঝা-সনে শিরে ল'য়ে অশনিকরকা।
অজয় ভৈরব ঘুরি বাজায় বিজয়তূরী,
তব মেঘধারাযন্ত্রে ঝর্ ঝর্ ঝরিছে অমিয়—
ক্ষুধিতে জোগায় অন্ন, পিপাসিতে শীতল পানীয়।

নিখিলসাগর-অঙ্কে তুমি যেন কমলে-কামিনী,
বসে আছ পদ্মাসনে মহাধ্যানে দিবসযামিনী!
ঋদ্ধি সিদ্ধি দুই করী শান্তিঘট শূন্যে ধরি
ঢালিতেছে তব শিরে দেবতার পাদোদকসুধা,
নিজে রহি অনশনে হরিতেছ জগতের ক্ষুধা!

কিরণের ছড়া ঊষা দিয়ে যায় তব আঙিনায়,
সন্ধ্যা ধূপদীপ জ্বালি করে আসি আরতি তোমায়,
মন্দিরে মন্দিরে শাঁখ 'মা' বলিয়া দেয় ডাক,
তুমি যেন অমরার পুঞ্জীভূত দূর্বা আর ধান,
তোমারে আশিসি পুন নমেন আপনি ভগবান।

জীবন-ভিক্ষা

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

বুদ্ধদেবের প্রতি কিসা-গোতমী

"দেউলে দেউলে কাঁদিয়া ফিরি গো, দুলালে আগলি' বক্ষে—
উষ্ণ বিয়োগ-উৎস-সরিত দরবিগলিত চক্ষে,
শত চুম্বনে মেলে না নয়ন, চুরি গেছে মোর আঁচলের ধন;
অভাগী বিহগী আজিকে আহত মরণশ্যেনের পক্ষে।

স্তনক্ষীরধার অধরে বাছার আজি কি লেগেছে তিক্ত?
রসনা-প্রসূন কোন্ পরসাদ-মধুরসে পরিষিক্ত?
মুখচম্পকে মরুর বর্ণ, শুষ্ক অধরকমলপর্ণ
কী পাপে আমার প্রাণের ইন্দু পীযূষবিন্দুরিক্ত?

কোথা সে মাধুরী আধো আধো বোলে? কুন্দ বৃন্তছিন্ন,
দন্তরুচিতে কই সে কান্তি পুণ্যহাসির চিহ্ন?
জানি, প্রভু, তব পাণির পরশে ননীর পুতলি জাগিবে হরষে
কোন্ পাষাণের বিষবাণে তার নয়নের মণি ভিন্ন?

অবনীর এই পদ্মবেদীতে হরিলে ত্রিতাপদুঃখ,
যাত্রা করেছ দুরগম পথ ক্ষুরধারসম সূক্ষ্ম।
দিয়ে তপোবল, মহানির্বাণ, কুমারে আমার করো প্রাণদান।
লুটায় যুবতী বুদ্ধ-চরণে, আলুথালু কেশ রুক্ষ।

কহেন বুদ্ধ, "তনয় তোমার নীরব-সমাধি-মগ্ন,
বরণ করেছে চিরসুন্দর মরণের মহালগ্ন।
থাকে যদি কোথা অশোকনিলয় ভিখ্ মাগি আনো সর্ষপচয়,
পরশে তাহার দুলিয়া উঠিবে পরান-মৃণাল ভগ্ন।"

বিশাল পুরীর দ্বারে দ্বারে ঘুরে, কেহ নাহি দেয় ভিক্ষা;
নিবেদিল শেষে গুরুপদে এসে, "শিখাইলে শেষ শিক্ষা.
জীয়াতে চাহি না তনয়ে আমার, ভবনে ভবনে ওঠে হাহাকার—
হরো জগতের বিরহ-আঁধার, দাও গো অমৃতদীক্ষা।"

জন্মভূমি

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

ঐ যে গাঁ-টি যাচ্ছে দেখা 'আইরি' খেতের আড়ে—
প্রান্তটি যার আঁধার-করা সবুজ কেয়াঝাড়ে,
পুবের দিকে আম-কাঁঠালের বাগান দিয়ে ঘেরা,
জট্‌লা করে যাহার তলে রাখাল বালকেরা—
ঐটি আমার গ্রাম, আমার স্বর্গপুরী,
ঐখানেতে হৃদয় আমার গেছে চুরি!

বাঁশ-বাগানের পাশটি দিয়ে পাড়ার পথটি বাঁকা,
পথের ধারে গলাগলি সজ্‌নে গাছের শাখা,
গোরুর গাড়ির চাকায় পথে শুকায় নাকো কাদা,
কোথাও বা তার বেড়ার পাশে ঘুঁটে-ছাইয়ের গাদা—
তবু আমার জন্মভূমি স্বর্গপুরী,
বিশ্বশোভা ঐখানেতে গেছে চুরি।

যত দেশের যত পাখি ঐ গাঁয়ে কি আছে!
ঝোপে-ঝাড়ে বেড়ায় উড়ে বাসার কাছে কাছে;
পথের পাশে গাছের ডগা নুইয়ে পড়ে গায়ে;
চলতে গেলেই শুক্‌নো পাতা গুঁড়োয় পায়ে পায়ে—
বনে-ভরা এমনি আমার স্বর্গপুরী,
তবু আমার চিত্ত সেথায় গেছে চুরি!

পদ্মদীঘি কোথায় পাব—পদ্ম নাইকো মোটে,
চৈৎ-বোশেখে শুকিয়ে উঠে, জলটুকু না জোটে!
পানায় মরা, ডোবায় ভরা, সিদ্ধি গাছে ছাওয়া,
ভাঁট-পিঠিলির জঙ্গলেতে হাঁপিয়ে বেড়ায় হাওয়া—
এমনি আমার স্বর্গছাড়া স্বর্গপুরী,
স্বর্গশোভা তবু সেথায় গেছে চুরি!

পাঠশালাটি নাইকো গাঁয়ে—নাইকো সে ডাকঘর,
কোথায় বদ্যি, যদিও কম্‌তি নয়কো বড়ো জ্বর;
রাজার প্রাসাদ নাইকো সেথায় ধনীর দেবালয়,
সজ্জাহীনে লজ্জা নাইকো, দারিদ্র্যে নাই ভয়;
সৃষ্টিছাড়া এমনি আমার স্বর্গপুরী,
সকল অভাব তবু সেথায় গেছে চুরি!

তবু ওঠে কুমোর পাড়ায় কদমতলার ধারে
সংকীর্তনে মিলন-গীতি সান্ধ্য অন্ধকারে,
সবাই যেন স্বাধীন সুখী, বাধা-বাঁধন-হারা—
আবাদ করে, বিবাদ করে, সুবাদ করে তারা;
এমনি আমার সাদাসিধে স্বর্গপুরী,
তাই তো আমার মনটি সেথায় গেছে চুরি!

শোভা বল, স্বাস্থ্য বল—আছে বা না আছে,
বুকটি তবু নেচে ওঠে এলে গাঁয়ের কাছে;
ঐখানেতে সকল শান্তি, আমার সকল সুখ—
বাপের স্নেহ, মায়ের আদর, প্রিয়ার হাসিমুখ;
তাই তো আমার জন্মভূমি স্বর্গপুরী,
যেথায় আমার হৃদয়খানি গেছে চুরি!

আমরা

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

মুক্তবেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে
আমরা বাঙালী বাস করি সেই তীর্থে বরদ বঙ্গে—
বাম হাতে যার কমলার ফুল, ডাহিনে মধুকমালা,
ভালে কাঞ্চন-শৃঙ্গ-মুকুট, কিরণে ভুবন আলা,
কোল-ভরা যার কনকধান্য, বুক-ভরা যার স্নেহ,
চরণে পদ্ম, অতসী-অপরাজিতায় ভূষিত দেহ,
সাগর যাহার বন্দনা রচে শততরঙ্গভঙ্গে—
আমরা বাঙালী বাস করি সেই বাঞ্ছিত ভূমি বঙ্গে।

বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি;
আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই, নাগেরই মাথায় নাচি।
আমাদের সেনা যুদ্ধ করেছে সজ্জিত চতুরঙ্গে
দশাননজয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহের সঙ্গে।
আমাদের ছেলে বিজয়সিংহ লঙ্কা করিয়া জয়
সিংহল নামে রেখে গেছে নিজ শৌর্যের পরিচয়।
এক হাতে মোরা মগেরে রুখেছি, মোগলেরে আর হাতে,
চাঁদপ্রতাপের হুকুমে হঠিতে হয়েছে দিল্লীনাথে।

জ্ঞানের নিধান আদিবিদ্বান্ কপিল সাংখ্যকার
এই বাংলার মাটিতে গাঁথিল সূত্রে হীরকহার।
বাঙালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ংকর,
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙালী দীপংকর।
কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষশাতন করি
বাঙালীর ছেলে ফিরে এল দেশে যশের মুকুট পরি।
বাংলার রবি জয়দেব-কবি কান্ত-কোমল পদে
করেছে সুরভি সংস্কৃতের কাঞ্চন-কোকনদে!

স্থপতি মোদের স্থাপনা করেছে 'বরভূধর'এর ভিত্তি,
শ্যাম কাম্বোজে 'ওংকারধাম' মোদেরি প্রাচীন কীর্তি।

খেয়ানের ধনে মূর্তি দিয়েছে আমাদের ভাস্কর
বিটপাল আর ধীমান্—যাদের নাম অবিনশ্বর।
আমাদেরি কোন্ সুপটু পটুয়া লীলায়িত তুলিকায়
আমাদের পট অক্ষয় ক'রে রেখেছে অজন্তায়।
কীর্তনে আর বাউলের গানে আমরা দিয়েছি খুলি
মনের গোপনে নিভৃত ভুবনে দ্বার ছিল যতগুলি।

মন্বন্তরে মরি নি আমরা, মারী নিয়ে ঘর করি,
বাঁচিয়া গিয়েছি বিধির আশিসে অমৃতের টিকা পরি।
দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি, আকাশে প্রদীপ জ্বালি,
আমাদেরি এই কুটীরে দেখেছি মানুষের ঠাকুরালি;
ঘরের ছেলের চক্ষে দেখেছি বিশ্বভূপের ছায়া,
বাঙালীর-হিয়া-অমিয়া মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া;
বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়—
বাঙালীর ছেলে ব্যাঘ্রে বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়।

তপের প্রভাবে বাঙালী সাধক জড়ের পেয়েছে সাড়া,
আমাদের এই নবীন সাধনা শবসাধনার বাড়া;
বিষম ধাতুর মিলন ঘটায়ে বাঙালী দিয়েছে বিয়া,
মোদের নব্য রসায়ন শুধু গরমিলে মিলাইয়া।
বাঙালীর কবি গাহিছে জগতে মহামিলনের গান,
বিফল নহে এ বাঙালী-জনম, বিফল নহে এ প্রাণ।
ভবিষ্যতের পানে মোরা চাই আশাভরা আহ্লাদে,
বিধাতার কাজ সাধিবে বাঙালী ধাতার আশীর্বাদে।

শ্মশানের বুকে আমরা রোপণ করেছি পঞ্চবটী
তাহারি ছায়ায় আমরা মিলাব জগতের শতকোটি।
অতীতে যাহার হয়েছে সূচনা সে ঘটনা হবে হবে,
বিধাতার বরে ভরিবে ভুবন বাঙালীর গৌরবে।
প্রতিভায় তপে সে ঘটনা হবে, লাগিবে না তার বেশি,
লাগিবে না তাহে বাহুবল কিবা জাগিবে না দ্বেষাদ্বেষি;
মিলনের মহামন্ত্রে মানবে দীক্ষিত করি ধীরে—
মুক্ত হইব দেব-ঋণে মোরা মুক্তবেণীর তীরে।

ছোটোর দাবি

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

ছোটো যে হায় অনেক সময় বড়োর দাবি দাবিয়ে চলে,
রেখা টেনে ছোটোর গতি, বড়ো যে জল গাবিয়ে চলে।
অতি-বড়ো তুচ্ছ যা তাই ভালোবাসি আমরা সবাই,
ভুলায় বড়োর অট্টহাসি ছোটোর কণা নয়ন-জলে।

তরুবরে হয় না স্মরণ, কুসুমটি তার ভুলতে নারি;
ভুলতে পারি হোলির দিবস, ফাগের দাগ যে ভুলতে নারি।
ভুলি সাগর—তার মুকুতায় গেঁথে রাখি গলার মালায়,
ছোটোর অনুরাগের রাখী আয়াস ক'রেও খুলতে নারি।

রামায়ণের অনেক ভুলি রাবণ-রাজার চিতার সাথে,
ভুলতে নারি রামের মিলন গুহক-গৃহে মিতার সাথে।
ভুলি কোশল-পৌরভবন, ভুলতে নারি অশোক-কানন
সরমার সে সখীত্বটি বন্দিনী মা সীতার সাথে।

ভুলি দ্বারাবতীর ঘটা, কংসবধের গৌরবও।
ভুলায় কুরুক্ষেত্র গোটা বিদুর-ক্ষুদের সৌরভও।
বাঁশরি আর শিখীর পাখা সুদর্শনকে দেয় যে ঢাকা,
সুদামার প্রেম-সখ্যে যে ম্লান পাণ্ডব এবং কৌরবও।

ভুলতে পারি সারনাথ আর নালন্দা-মঠ-ধ্বংসটিকে,
মনে পড়ে বুদ্ধদেবের বুকে কাতর হংসটিকে।
হাজার হাজার মূর্তি তাঁহার উহার কাছে মানছে যে হার
পূর্ণতা দেয় বিরাট ক'রে ক্ষুদ্র তাহার অংশটিকে।

মহামায়ায় যতই মানাক সিংহ এবং সিংহাসনে,
রামপ্রসাদের বেড়ার ধারে দেখেই যে হয় হিংসা মনে।
বাদ্যঘটা, লক্ষ বলি, অলক্ষ্যে সব যায় যে চলি—
বক্ষে জাগে দৃষ্টি মায়ের, মিষ্ট হাসি চন্দ্রাননে।

আদর করি শিখীর চেয়ে চূড়ার শোভা শিখীর পাখা,
বিশাল রসাল-বনের চেয়ে ঘটের ছোটো আমের শাখা।
খনি রেখে মণিই তুলি, মধু পেয়ে ভ্রমর ভুলি।
মা মেনকার অশ্রুকণায় বিশাল গিরীশ পড়ল ঢাকা।

হাট

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

দূরে দূরে গ্রাম দশবারো-খানি, মাঝে একখানি হাট,
সন্ধ্যায় সেথা জ্বলে না প্রদীপ, প্রভাতে পড়ে না ঝাঁট।
বেচা-কেনা সেরে বিকাল বেলায়
যে যাহার সবে ঘরে ফিরে যায়;
বকের পাখায় আলোক লুকায় ছাড়িয়া পূবের মাঠ;
দূরে দূরে গ্রামে জ্ব'লে ওঠে দীপ—আঁধারেতে থাকে হাট।

নিশা নামে দূরে শ্রেণীহারা একা ক্লান্ত কাকের পাখে;
নদীর বাতাস ছাড়ে প্রশ্বাস পার্শ্বে পাকুড়-শাখে।
হাটের দোচালা মুদিল নয়ান,
কারো তরে তার নাই আহ্বান;
বাজে বায়ু আসি বিদ্রূপ-বাঁশি জীর্ণ বাঁশের ফাঁকে;
নির্জন হাটে রাত্রি নামিল একক কাকের ডাকে।

দিবসেতে সেথা কত কোলাহল চেনা-অচেনার ভিড়ে;
কত-না ছিন্ন চরণচিহ্ন ছড়ানো সে ঠাঁই ঘিরে।
মাল-চেনাচিনি, দর-জানাজানি,
কানাকড়ি নিয়ে কত টানাটানি;
হানাহানি ক'রে কেউ নিল ভ'রে, কেউ গেল খালি ফিরে;
দিবসে থাকে না কথার অন্ত চেনা-অচেনার ভিড়ে।

কত কে আসিল, কত বা আসিছে, কত-না আসিবে হেথা;
ওপারের লোক নামালে পসরা ছুটে এপারের ক্রেতা।
শিশিরবিমল প্রভাতের ফল
শত হাতে সহি পরখের ছল
বিকাল বেলায় বিকায় হেলায় সহিয়া নীরব ব্যথা।
হিসাব নাহি রে—এল আর গেল কত ক্রেতা-বিক্রেতা।

নূতন করিয়া বসা আর ভাঙা পুরানো হাটের মেলা;
দিবসরাত্রি নূতন যাত্রী, নিত্য নাটের খেলা!
খোলা আছে হাট মুক্ত বাতাসে,
বাধা নাই ওগো—যে যায় যে আসে,
কেহ কাঁদে কেহ গাঁটে কড়ি বাঁধে ঘরে ফিরিবার বেলা।
উদার আকাশে মুক্ত বাতাসে চিরকাল একই খেলা।

কাল-বৈশাখী

মোহিতলাল মজুমদার

মধ্যদিনের রক্ত নয়ন অন্ধ করিল কে।
ধরণীর 'পরে বিরাট ছায়ার ছত্র ধরিল কে।
কানন-আনন পাণ্ডুর করি
জলস্থলের নিশ্বাস হরি
আলয়ে-কুলায়ে তন্দ্রা ভুলায়ে গগন ভরিল কে।

আজিকে যতেক বনস্পতির ভাগ্য দেখি যে মন্দ,
নিমেষ গণিছে তাই কি তাহারা সারি সারি নিস্পন্দ?
মরুৎ-পাথারে বারুদের ঘ্রাণ
এখনি ব্যাকুলি তুলিয়াছে প্রাণ?
পশিয়াছে কানে দূর গগনের বজ্রঘোষণ ছন্দ?

হেরি যে হোথায় আকাশকটাহে ধূম্র মেঘের ঘটা,
সে যেন কাহার বিরাট, মুণ্ডে ভীমকুণ্ডল জটা!
অথবা ও কি রে সচল অচল—
ভেদিয়া কোন্ সে অসীম অতল
ধাইছে উধাও গ্রাসিতে মিহিরে, ছিঁড়িয়া রশ্মিছটা!

ওই শোন তার ঘোর নির্ঘোষ, দুলিয়া উঠিল জটাভার।
শুরু হয়ে গেছে গুরু-গুরু রব—নাসা-গর্জন ঝঙ্কার;
পিঙ্গল হল গলতলদেশ,
ধূলিধূসরিত উন্মাদবেশ—
দিবসের ভাগে টানিয়া খুলিছে বেণীবন্ধন সন্ধ্যার;

অঙ্কুশ কার ঝলসিয়া উঠে দিক্ হতে দিক্-অন্তে!
দিগ্বারণেরা বেদনা-অধীর বিদারিছে নভ দন্তে।
বাজে ঘন ঘন রণদুন্দুভি,
ঝড়ে সে আওয়াজ কভু যায় ডুবি,
যুঝিতেছে কোন্ দুই মহাবল দ্যুলোকের দূর পন্থে!

বঙ্কিম-নীল অসির ফলকে দেহ হল কার ভিন্ন?
অনাবৃষ্টির অসুরের বাধা কে করিল নিশ্চিহ্ন?
নেমে আসে যেন বাঁধ-ভাঙা জল,
ম্লান হয়ে আসে মেঘকজ্জ্বল,
আলোকের মুখে কালো যবনিকা এতখনে হল ছিন্ন।

হেরো, ফিরে চলে সে রণবাহিনী বাজায়ে বিজয়শঙ্খ,
আকাশের নীল নির্মল হল—ধৌত ধরার পঙ্ক।
বায়ু বহে পুন মৃদু উচ্ছ্বাসে,
নদী উথলিছে কুলু কুলু ভাষে,
আলো-ঝলমল বিটপীর দল নিশ্বসে নিঃশঙ্ক।

নববর্ষের পুণ্য-বাসরে কাল-বৈশাখী আসে।
হোক সে ভীষণ, ভয় ভুলে যাই অদ্ভুত উল্লাসে।
ঝড় বিদ্যুৎ বজ্রের ধ্বনি—
দুয়ার জানালা উঠে ঝনঝনি—
আকাশ ভাঙিয়া পড়ে বুঝি, তবু প্রাণ ভরে আশ্বাসে।

চৈত্রের চিতা-ভস্ম উড়ায়ে জুড়াইয়া জ্বালা পৃথ্বীর,
তৃণ-অঙ্কুরে সঞ্চারি রস, মধু ভরি বুকে মৃত্তির,
সে আসিছে আজ কাল-বৈশাখে—
শুনি টঙ্কার তাহার পিনাকে
চমকিয়া উঠি—তবু জয় জয় তার সেই শুভ কীর্তির।

এত যে ভীষণ, তবু তারে হেরি ধরার ধরে না হর্ষ,
ওরি মাঝে আছে কাল-পুরুষের সুগভীর পরামর্শ।
নীল-অঞ্জন-গিরি-নিভ কায়া,
নিশীথনীরব ঘনঘোর ছায়া—
ওরি মাঝে আছে নববিধানের আশ্বাস দুর্ধর্ষ।

ত্রিরত্ন 1982

কালিদাস রায়

এল দিগ্‌জয়ী দিগ্‌গজ বীরপণ্ডিত ব্রজধামে,
যেন রণমদে মত্ত দন্তী পঙ্কজবনে নামে।
অশ্বমুণ্ডে উড়ায়ে ঝাণ্ডা চারণ ফুকারি চলে,
চতুর্দোলায় পণ্ডিত দোলে বিজয়মাল্য গলে।
জয়নাদ তুলি অনুচরগুলি চলে তার পাছে পাছে,
ভয়ে সবে পুঁথিপত্র গুটায়, কেহ না আগায় কাছে।

রূপ সনাতন রহেন দুজন সাধনভজন-রত,
কে আসে কে যায় ব্রজে তার খোঁজ রাখেন না অতশত।
পাণ্ডিত্যের খ্যাতি তাঁহাদের রটিয়াছে সারা দেশে,
বিচারমল্ল তাই শুনে আজ অভিযান করে শেষে।
দুই ভাই ব্রজে প্রেমাবেশে মজি বিভোর আছেন সুখে,
'যুদ্ধং দেহি' হাঁকিয়া দাঁড়াল সে তাঁদের সম্মুখে।
পরমাগ্রহে মৃদু হাসি দোঁহে বসাইয়া সমাদরে
বিজয়-পত্রী লিখিয়া দিলেন জয়-ভিখারীর করে।

বিজয়গর্বে তূর্য বাজায়ে পণ্ডিত যায় ফিরে,
সূর্য তখন মাথার উপরে উঠিতেছে ধীরে ধীরে।
পথের জনতা ভয়ে-বিস্ময়ে দু ধারে দাঁড়ায় সরি,
সিক্তবসনে শ্রীজীব তখন ফিরিছেন স্নান করি।
সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন জীব শুনিয়া আস্ফালন—
'বিনা বিচারেই হার মেনেছেন রূপ আর সনাতন!'

শুনি শ্রীজীবের ধৈর্য টলিল, বলিলেন, "পণ্ডিত,
এসো, আমি দিব দম্ভের তব প্রতিফল সমুচিত।
যাঁদের কুঞ্জে তুমি দিগ্‌গজ করেছিলে অভিযান,
তাঁদের আমি তো চরণাশ্রিত শিষ্য ও সন্তান;
পেয়েছি তাঁদের জ্ঞানসাগরের শুধু এক অঞ্জলি,
মোরে জিনি তবে জয়গৌরবে ব্রজ থেকে যাবে চলি।"

তরুণ কণ্ঠে শুনি অকুণ্ঠ রণে-আহ্বান-বাণী
অট্টহাস্য হাসিয়া উঠিল পণ্ডিত অভিমানী।
বলিল, "মূর্খ, কেশরী কি কভু ক্ষুদ্র শশকে বধে?
পারাবার পার হয়ে এসে শেষে ডুবিব কি গোষ্পদে?"
বাহকবৃন্দে বলিল সে, "চল্, কেন রয়ে গেলি থেমে?"
জীব বলিলেন, "তিষ্ঠ কেশরী, দোলা হতে এসো নেমে।"

তর্ক বাধিল যমুনার তীরে—দলে দলে সেথা আসি
দুই মল্লেরে দাঁড়াইল ঘিরে কুতূহলী পুরবাসী।

হানিতে লাগিল পণ্ডিত যত শাণিত প্রশ্নবাণ,
হেলায় সে-সব করিলেন জীব খণ্ডিত খান খান।
দুই দণ্ডেই হল দণ্ডিত পণ্ডিত দাম্ভিক,
শুনিতে পাইল জনতায় শুধু ধ্বনিতেছে "ধিক্ ধিক্"।

অবনতশির বিতণ্ডাবীর পাণ্ডুর মুখে ধীরে
ধ্বজা গুটাইয়া সোজা পলাইল মথুরার দিকে ফিরে।
ব্রজবাসিগণ শুভসংবাদ ভাবি, পুলকিত মনে
জানাল এ কথা—বিজয়-বারতা—রূপ আর সনাতনে।
সিক্ত বসন শুকায়েছে গায়, তৃতীয় প্রহর বেলা,
আরো দেরি হল ফিরিতে জীবের ঠেলি জনতার মেলা।

কুঞ্জে তখনো গ্রহণ করে নি কেহই অন্নজল—
বলিলেন রূপ, "জীব, পিছে তব এত কেন কোলাহল?
শুচি হয়ে আজ আসো নাই তুমি স্নান করি যমুনায়,
যশ-প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠা মেখে এলে সারা গায়।
মুখদর্শন করিব না তব—বৃথা তোমা পালিলাম,
রাজসভা তব সুযোগ্য ঠাঁই, নহে এই ব্রজধাম।"

চরণে পড়িয়া শ্রীজীব কতই করিলেন অনুনয়,
রূপের হৃদয় গলিল না তায়, কোপের হল না ক্ষয়।
শ্রীজীব তখন যমুনার তীরে তমাল-তরুর তল
আশ্রয় করি রহিলেন পড়ি ত্যজিয়া অন্নজল।
সকল সময় চোখে ধারা বয়, ফুলে ফুলে উঠে বুক,
শ্রীহরির নাম জপে অবিরাম বসনে ঢাকিয়া মুখ।

শ্রীজীবের দশা দেখে সনাতন মর্মে পেলেন ব্যথা,
করিল কাতর তাঁর অন্তর শ্রীজীবের কাতরতা।
বিরূপ শ্রীরূপে কহিলেন চুপে, "শ্রীজীবে ত্যজিলে কেন?
বৈষ্ণবগুরু হয়ে তব কেন বিকৃত বুদ্ধি হেন!
গুরুমর্যাদা রক্ষা করাই ছিল তার মনে সাধ,
আমি তো দেখি না এর বেশি কিছু গুরুতর অপরাধ।

রূপ কহিলেন, "বুঝাবার ভাই আছে কিছু প্রয়োজন?
হয়ে বৈষ্ণব জ্ঞানের গরব করে নি সে বর্জন।
তরু হতে যেবা হয় সহিষ্ণু, তৃণ হতে দীনতর,
সেই বৈষ্ণব—জয়গৌরব ভাবে না সে কভু বড়ো।
গুরুমর্যাদা?—হায় অদৃষ্ট, গুরুরেও সে না চিনে,
এত উপদেশে হল হায় শেষে এ শিক্ষা এতদিনে!"

শুনি সনাতন মৃদু হেসে ক'ন, "ত্যজিবারে অভিমান
পারে নাই জীব, এখনো বালক, আমাদেরি সন্তান।
তুমি তার তাত, তুমি গুরু ভ্রাতঃ, পারিলে না আজো হায়
বৈষ্ণব হয়ে রোষ জিনিবারে—দোষ কিছু নাই তায়?
সেই অছিলায় ত্যজিব তোমায়? দীনতার অভিমান—
তাও অভিমান, বৈষ্ণব-মনে তাও পাবে কেন স্থান?
সেই অভিমান থাকে যদি মনে, বৈষ্ণব মোরা নই;
জীবে দয়া তব পরম ধর্ম, 'জীবে' দয়া তব কই?"

এ কথা শুনিয়া চমকি উঠিয়া রূপ কহিলেন কাঁদি—
"কী কথা শুনালে! হায়, তার চেয়ে আমিই তো অপরাধী।
বৈষ্ণব হয়ে ক্ষমা করিতে তো পারিনি-কো সন্তানে,
না বুঝে অশনি হেনেছি জীবের কুসুমকোমল প্রাণে!
যাও ভাই যাও, এক্ষণি গিয়ে ডেকে নিয়ে এসো তারে
না জানি কত-না পায় সে যাতনা এ মূঢ়ের অবিচারে।"

সনাতন-সাথে শ্রীজীব এলেন, কঙ্কালসার দেহ,
অরুণ নয়ন, ছিন্ন বসন, চিনিতে পারে না কেহ।
জীবে বুকে ধরি কাঁদিলেন রূপ অবুঝ শিশুর মতো,
বার বার তার ললাট চুমিয়া জুড়ায়ে দিলেন ক্ষত।
চারি চক্ষুর ধারায় তিতিল বৃন্দাবনের রজ,
শুচি হল তায় দিগ্‌বিজয়ীর পরশে অশুচি ব্রজ।

ছাত্রধারা

কালিদাস রায়

বর্ষে বর্ষে দলে দলে আসে বিদ্যামঠ-তলে
চলে যায় তারা কলরবে,
কৈশোরের কিসলয় পর্ণে পরিণত হয়
যৌবনের শ্যামল গৌরবে।
ভালোবাসি, কাছে ডাকি, নামও সব জেনে রাখি,
দেখাশোনা হয় নিতি নিতি,
শাসন-তর্জন করি শিখাই প্রহর ধরি,
থাকে নাকো হায় কোনো স্মৃতি।
ক' দিনের এই দেখা? সাগর-সৈকতে রেখা
নূতন তরঙ্গে মুছে যায়।
ছোটো ছোটো দাগ পা'র ঘুচে হয় একাকার,
নব নব পদ-তাড়নায়।
জানে না কে কোথা যাবে, জুটে হেথা তাই—ভাবে
পাঠশালা—যেন পান্থশালা।
দু' দিন একত্রে মাতে, মেলে মেশে, ব'সে গাঁথে
নীতি-হার আর কথামালা।
রাজপথে দেখা হলে কেহ যদি গুরু ব'লে
হাত তুলে করে নমস্কার,
বলি তবে হাসি-মুখে "বেঁচে থাকো রও সুখে,"
স্পর্শ করি কেশগুলি তার।
ভাবিতে ভাবিতে যাই কি নাম? মনে তো নাই,
ছাত্র ছিল কত দিন আগে?
স্মৃতি-সূত্র ধরি টানি কৈশোরের মুখখানি
দেখি মনে জাগে কি না জাগে।
ঘন ঘন আনাগোনা, কত দিন দেখা-শোনা
তবু কেন মনে নাহি থাকে?
ব্যক্তি ডুবে যায় দলে, মালিকা পরিলে গলে
প্রতি ফুলে কেবা মনে রাখে?

এ জীবন ভেঙে গড়ে শ্যামল সরস করে
ছাত্রধারা বয়ে চলে যায়,
ফেনিলতা উচ্ছলতা হয়ে যায় তুচ্ছ কথা,
কলরব সকলি মিলায়।
স্বচ্ছতায় শুধু হেরি, আমার জীবন ঘেরি
জাগে শুধু ম্লান মুখগুলি,
কলহাস্য মহোৎসব, আর ভুলে যাই সব,
ম্লান মুখ কখনো না ভুলি!
কেহ বা ক্ষুধায় ম্লান, কেহ রোগে ম্রিয়মাণ,
শ্রমে কারো চাহনি করুণ,
কেহ বা বেত্রের ডরে, বন্দী হয়ে রয় ঘরে,
নেত্র কারো তন্দ্রায় অরুণ।
কেহ বা জানালা-পাশে চেয়ে রয় নীলাকাশে,
যেন বন্ধ পিঞ্জরের পাখি,
আকাশে হেরিয়া ঘুড়ি মন তার যায় উড়ি
বিষাদের ছায়াখানি রাখি।
স্মরিয়া খেলার মাঠ কেউ ভুলে যায় পাঠ,
বুদ্ধিতে বা কারো না কুলায়,
কেহ স্মরে গেহ-কোণ, স্নেহভরা ভাই বোন,
ঘড়ি পানে ঘন ঘন চায়।
ডাকিছে উদার বায়ু লয়ে স্বাস্থ্য লয়ে আয়ু,
ডাক শোনে বসে রুদ্ধ ঘরে,
হাতে মসী মুখে মসী, মেঘে ঢাকা শিশুশশী,
প্রতিবিম্বে মোর স্মৃতি ভরে।
আর সবি গেছি ভুলি, ভুলি নি এ মুখগুলি।
একবার মুদিলে নয়ন
আঁখিপাতা ভারী ভারী ম্লান মুখ সারি সারি
আকুল করিয়া তোলে মন।

কাণ্ডারী হুঁশিয়ার

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি-নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার!

দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ?
কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার।

তিমিররাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা, সাবধান!
যুগযুগান্তসঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান।
ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদেরে পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার।

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী! আজি দেখিব তোমার মাতৃমুক্তিপণ!
"হিন্দু না ওরা মুসলিম?" ঐ জিজ্ঞাসে কোন্ জন?
কাণ্ডারী! বলো, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র।

গিরিসঙ্কট ভীরু যাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ,
পশ্চাৎ-পথ-যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ।
কাণ্ডারী! তুমি ভুলিবে কি পথ? ত্যজিবে কি পথমাঝ?
ক'রে হানাহানি তবু চলো টানি নিয়াছ যে মহাভার।

কাণ্ডারী! তব সম্মুখে ঐ পলাশির প্রান্তর,
বাঙালীর খুনে লাল হল যেথা ক্লাইবের খঞ্জর!
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর!
উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্বার।

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন্ বলিদান?
আজি পরীক্ষা, জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ?
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারী হুঁশিয়ার।

আগামী

সুকান্ত ভট্টাচার্য

জড় নই, মৃত নই, নই অন্ধকারের খনিজ,
আমি তো জীবন্ত প্রাণ, আমি এক অঙ্কুরিত বীজ;
মাটিতে লালিত, ভীরু, শুধু আজ আকাশের ডাকে
মেলেছি সন্দিগ্ধ চোখ, স্বপ্ন ঘিরে রয়েছে আমাকে।
যদিও নগণ্য আমি, তুচ্ছ বটবৃক্ষের সমাজে
তবু ক্ষুদ্র এ শরীরে গোপনে মর্মরধ্বনি বাজে,
বিদীর্ণ করেছি মাটি, দেখেছি আলোর আনাগোনা
শিকড়ে আমার তাই অরণ্যের বিশাল চেতনা।
আজ শুধু অঙ্কুরিত, জানি কাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতা
উদ্দাম হাওয়ার তালে তাল রেখে নেড়ে যাব মাথা;
তারপর দৃপ্ত শাখা মেলে দেব সবার সম্মুখে,
ফোটাব বিস্মিত ফুল প্রতিবেশী গাছেদের মুখে।
সংহত কঠিন ঝড়ে দৃঢ়প্রাণ প্রত্যেক শিকড়:
শাখায় শাখায় বাধা, প্রত্যাহত হবে জানি ঝড়;
অঙ্কুরিত বন্ধু যত মাথা তুলে আমারই আহ্বানে
জানি তারা মুখরিত হবে নব অরণ্যের গানে।
আগামী বসন্তে জেনো মিশে যাব বৃহতের দলে;
জয়ধ্বনি কিশলয়ে: সংবর্ধনা জানাবে সকলে।
ক্ষুদ্র আমি তুচ্ছ নই—জানি আমি ভাবী বনস্পতি,
বৃষ্টির মাটির রসে পাই আমি তারি তো সম্মতি।

সেদিন ছায়ায় এস : হানো যদি কঠিন কুঠারে,
তবুও তোমায় আমি হাতছানি দেব বারে বারে;
ফল দেব, ফুল দেব, দেব আমি পাখিরও কূজন,
একই মাটিতে পুষ্ট তোমাদের আপনার জন॥

গদ্যাংশ

হিমালয়-ভ্রমণ

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পর দিন[১] প্রাতঃকালে দুগ্ধ পান করিয়া পদব্রজেই চলিলাম। অদূরেই নিবিড় বনে প্রবিষ্ট হইলাম, যেহেতু সে পথ বনের মধ্য দিয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে সেই বন ভেদ করিয়া রৌদ্রের কিরণ ভগ্ন হইয়া পথে পড়িয়াছে; তাহাতে বনের শোভা আরো দীপ্তি পাইতেছে। যাইতে যাইতে দেখি যে, বনের স্থানে স্থানে বহুকালের বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষসকল মূল হইতে উৎপাটিত হইয়া ভূমিষ্ঠ প্রণত রহিয়াছে। অনেক তরুণ-বয়স্ক বৃক্ষও দাবানলে দগ্ধ হইয়া অসময়ে দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে।

অনেক পথ চলিয়া পরে যানারোহণ করিলাম। ঝাঁপানে চড়িয়া ক্রমে আরো নিবিড় বনে প্রবিষ্ট হইলাম। পর্বতের উপরে আরোহণ করিতে করিতে তাহার মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া কেবল হরিদ্বর্ণ ঘন-পল্লবাবৃত বৃহৎ বৃক্ষসকল দেখিতে পাই। তাহাতে একটি পুষ্প কি একটি ফলও নাই। কেবল কেলু-নামক বৃহৎ বৃক্ষেতে হরিদ্বর্ণ একপ্রকার কদাকার ফল দৃষ্ট হয়, তাহা পক্ষীতেও আহার করে না। কিন্তু পর্বতের গাত্রেতে বিবিধ প্রকারের তৃণ-লতাদি যে জন্মে তাহারই শোভা চমৎকার। তাহা হইতে যে কত জাতি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা সহজে গণনা করা যায় না। শ্বেতবর্ণ রক্তবর্ণ পীতবর্ণ নীলবর্ণ স্বর্ণবর্ণ, সকল বর্ণেরই পুষ্প যথা তথা হইতে নয়নকে আকর্ষণ করিতেছে। এই পুষ্পসকলের সৌন্দর্য ও লাবণ্য, তাহাদিগের নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা দেখিয়া সেই পরম পবিত্র পুরুষের হস্তের চিহ্ন তাহাতে বর্তমান বোধ হইল। যদিও ইহাদিগের যেমন রূপ তেমন গন্ধ নাই, কিন্তু আর-এক প্রকার শ্বেতবর্ণ গোলাপ পুষ্পের গুচ্ছসকল বন হইতে বনান্তরে প্রস্ফুটিত হইয়া সমুদায় দেশ গন্ধে আমোদিত করিয়া রাখিয়াছে। এই শ্বেত গোলাপ চারি পত্রের এক স্তবক মাত্র। স্থানে স্থানে চামেলি পুষ্পও গন্ধ দান করিতেছে। মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ট্রবেরি ফলসকল খণ্ড খণ্ড রক্তবর্ণ উৎপলের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। আমার সঙ্গের এক ভৃত্য এক বনলতা হইতে তাহার পুষ্পিত শাখা আমার হস্তে দিল। এমন সুন্দর পুষ্পের লতা আমি আর কখনো দেখি নাই। আমার চক্ষু খুলিয়া গেল, আমার হৃদয় বিকশিত হইল। আমি সেই ছোট ছোট শ্বেত পুষ্পগুলির উপরে অখিলমাতার হস্ত পড়িয়া রহিয়াছে, দেখিলাম। এই বনের মধ্যে কে বা সেই-সকল পুষ্পের সুগন্ধ পাইবে, কে বা তাহাদের সৌন্দর্য দেখিবে; তথাপি তিনি কত যত্নে,

---

[১] ১১ জুন ১৮৫৭।

কত স্নেহে, তাহাদিগকে সুগন্ধ দিয়া, লাবণ্য দিয়া, শিশিরে সিক্ত করিয়া, লতাকে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার করুণা ও স্নেহ আমার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। নাথ! যখন এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পগুলির উপরে তোমার এত করুণা, তখন আমাদের উপর না জানি তোমার কত করুণা! 'তোমার করুণা, আমার মন প্রাণ হইতে কখনোই যাইবে না। তোমার করুণা আমার মন প্রাণে এমনি বিদ্ধ হইয়া আছে যে, যদি আমার মস্তক যায়, তথাপি প্রাণ হইতে তোমার করুণা যাইবে না।'

هرگزم مهر تو از لوح دل و جان نرود

* * * * *

انچنان مهر توام در دل و جان جائی گرفت

که گرم سر برود مهــــر تو از جان نرود

[হর্‌গিজ্.ম মেহরে তো অজ্. লওহে দিল্ ও জাঁ ন-রবদ্

...

আঁচুনাঁ মেহ্‌রে তো অম্ দর্ দিল্ ও জা জায়ে গিরিফ্‌ৎ,

কে গর্ অম্ সর্ বে-রবদ্ মেহ্‌রে তো অজ্. জাঁ ন-রবদ।

দীবান্-হাফিজ., ২৬৬।১, ২।]

হাফেজের এই কবিতা পথে সমস্ত দিন উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে পড়িতে তাঁহার করুণারসে নিমগ্ন হইয়া সূর্য অস্তের কিছু পূর্বে সায়ংকালে সুঙ্ঘ্রী নামক পর্বতচূড়াতে উপস্থিত হইলাম।[২] দিন কখন চলিয়া গেল কিছুই জানিতে পারিলাম না। এই উচ্চ শিখর হইতে পরস্পর অভিমুখী দুই পর্বতশ্রেণীর শোভা দেখিয়া পুলকিত হইলাম। এই শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে কোনো পর্বতে নিবিড় বন, ঋক্ষ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর আবাসস্থান। কোনো পর্বতের আপাদমস্তক পক্ক গোধূম-ক্ষেত্র দ্বারা স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত রহিয়াছে। তাহার মধ্যে মধ্যে বিস্তর ব্যবধানে এক এক গ্রামে দশ-বারোটি করিয়া গৃহপুঞ্জ সূর্য-কিরণে দীপ্তি পাইতেছে। কোনো পর্বত আপাদ-মস্তক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

[২] দেবেন্দ্রনাথের পত্র হইতে জানা যায় যে সিমলা হইতে নারকাণ্ডা প্রায় ২০ ক্রোশ এবং নারকাণ্ডা হইতে সুঙ্ঘ্রী ১২ ক্রোশ। সুঙ্ঘ্রীতেই আরোহণ শেষ হইল; ইহার পরে অবরোহণ।

তৃণদ্বারা ভূষিত রহিয়াছে। কোনো পর্বত একেবারে তৃণশূন্য হইয়া তাহার নিকটস্থ বনাকীর্ণ পর্বতের শোভা বর্ধন করিতেছে। প্রতি পর্বতই আপনার মহোচ্চতার গরিমাতে স্তব্ধ হইয়া পশ্চাতে হেলিয়া রহিয়াছে, কাহাকেও শঙ্কা নাই। কিন্তু তাহার আশ্রিত পথিকেরা রাজ-ভৃত্যের ন্যায় সর্বদা সশঙ্কিত—একবার পদস্খলন হইলে আর রক্ষা নাই। সূর্য অস্তমিত হইল, অন্ধকার ভুবনকে ক্রমে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল, তখনো আমি সেই পর্বতশৃঙ্গে একাকী বসিয়া আছি। দূরে হইতে পর্বতের স্থানে স্থানে কেবল প্রদীপের আলোক মনুষ্যবসতির পরিচয় দিতেছে।

পরদিবস প্রাতঃকালে সেই পর্বতশ্রেণীর মধ্যে যে পর্বত বনাকীর্ণ, সেই পর্বতের পথ দিয়া নিম্নে পদব্রজেই অবরোহণ করিতে লাগিলাম। পর্বত আরোহণ করিতে যেমন কষ্ট, অবরোহণ করা তেমনি সহজ। এ পর্বতে কেবল কেলু বৃক্ষের বন। ইহাকে তো বন বলা উচিত হয় না, ইহা উদ্যান অপেক্ষাও ভালো। কেলু বৃক্ষ দেবদারু বৃক্ষের ন্যায় ঋজু এবং দীর্ঘ। তাহার শাখাসকল তাহার অগ্রভাগ পর্যন্ত বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, এবং ঝাউগাছের পত্রের ন্যায়, অথচ সূচী-প্রমাণ দীর্ঘমাত্র, ঘন পত্র তাহার ভূষণ হইয়াছে। বৃহৎ পক্ষীর পক্ষের ন্যায় প্রসারিত ও ঘন পত্রাবৃত শাখাসকল শীত-কালে বহু তুষার-ভার বহন করে, অথচ ইহার পত্রসকল সেই তুষার দ্বারা জীর্ণ শীর্ণ না হইয়া আরো সতেজ হয়, কখনো আপনার হরিৎ বর্ণ পরিত্যাগ করে না। ইহা কি আশ্চর্য নহে? ঈশ্বরের কোন্ কার্য না আশ্চর্য! এই পর্বতের তল হইতে তাহার চূড়া পর্যন্ত এই বৃক্ষসকল সৈন্যদলের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বিনীতভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই দৃশ্যের মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য কি মনুষ্যকৃত কোনো উদ্যানে থাকিবার সম্ভাবনা? এই কেলু বৃক্ষের কোনো পুষ্প হয় না। ইহা বনস্পতি, এবং ইহার ফলও অতি নিকৃষ্ট, তথাপি ইহার দ্বারা আমরা বিস্তর উপকার প্রাপ্ত হই। ইহাতে আল্‌কাতরা[৩] জন্মে।

কতক দূর চলিয়া পরে ঝাঁপানে চড়িলাম। যাইতে যাইতে স্নানের উপযুক্ত এক প্রস্রবণ প্রাপ্ত হইয়া সেই তুষার-পরিণত হিম জলে স্নান করিয়া নূতন স্ফূর্তি ধারণ করিলাম, এবং ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া পবিত্র হইলাম। পথে এক পাল অজা অবি[৪] চলিয়া যাইতেছিল। আমার ঝাঁপানী একটা দুগ্ধবতী অজা ধরিয়া আমার নিকটে আনিল, এবং বলিল যে 'ইস্‌সে দুধ মিলেগা'। আমি তাহা হইতে এক পোয়া মাত্র দুগ্ধ পাইলাম। উপাসনার পরে আমার নিয়মিত দুগ্ধ পথের মধ্যে পাইয়া আশ্চর্য হইলাম, এবং করুণাময় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া তাহা পান করিলাম। 'সভূর্না জীয়াকঃ

---

[৩] পাইন গাছ হইতে ধুনো ও তার্পিণ জন্মে; আল্‌কাতরা নহে।
[৪] ছাগল ও ভেড়া।

তুম্ দাতা, সো মৈঁ বিসর না জাই"[*]। সকল জীবের তুমি দাতা, তাহা যেন আমি বিস্মৃত না হই। তাহার পরে পদব্রজে অগ্রসর হইলাম। বনের অন্তে এক গ্রামে উপনীত হইলাম, পুনর্বার সেখানে পক্ক গোধূম যবাদির ক্ষেত্র দেখিয়া প্রহৃষ্ট হইলাম। মধ্যে মধ্যে আফিমের ক্ষেত্র রহিয়াছে। এক ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকেরা প্রসন্নমনে পক্ক শস্য কর্তন করিতেছে, অন্য ক্ষেত্রে কৃষকেরা ভাবী ফল প্রত্যাশায় হল বহন দ্বারা ভূমি কর্ষণ করিতেছে।

রৌদ্রের জন্য পুনর্বার ঝাঁপানে চড়িয়া প্রায় দুই প্রহরের সময় বোয়ালি নামক পর্বতে উপস্থিত হইলাম। সুঙ্ঘী হইতে ইহা অনেক নিম্নে। এই পর্বতের তলে 'নগরী' নদী এবং ইহার নিকটেই অন্যান্য পর্বত-তলে শতদ্রু নদী বহিতেছে। বোয়ালি পর্বতের চূড়া হইতে শতদ্রু নদীকে দুই হস্ত মাত্র প্রশস্ত বোধ হইতেছে, এবং তাহা রৌপ্যপত্রের ন্যায় সূর্য-কিরণে চিক্ চিক্ করিতেছে। এই শতদ্রু-নদীতীরে রামপুর নামে যে এক নগর আছে, তাহা এখানে অতিশয় প্রসিদ্ধ, যেহেতু এই-সকল পর্বতের অধিকারী যে রাজা, রামপুর তাঁহার রাজধানী। রামপুর যে পর্বতের উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাহা ইহার সন্নিকট দেখা যাইতেছে; তথাপি ইহাতে যাইতে হইলে নিম্নগামী বহু পথ ভ্রমণ করিতে হয়। এই রাজার বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর হইবে, এবং ইংরাজি ভাষাও অল্প অল্প শিখিয়াছে। শতদ্রু নদী এই রামপুর হইতে ভজ্জীর রানার রাজধানী সোহিনী হইয়া, তাহার নিম্নে বিলাসপুরে যাইয়া পর্বত ত্যাগ করিয়া পঞ্জাবে বহমানা হইয়াছে।

গত কল্য সুঙ্ঘী হইতে ক্রমিক অবরোহণ করিয়া বোয়ালিতে আসিয়াছিলাম. অদ্যও[*] তদ্রূপ প্রাতঃকালে এখান হইতে অবরোহণ করিয়া অপরাহ্ণে নগরী নদীতীরে উপস্থিত হইলাম। এই মহা বেগবতী স্রোতস্বতী স্বীয় গর্ভস্থ বৃহৎ বৃহৎ হস্তিকায় তুল্য প্রস্তরখণ্ডে আঘাত পাইয়া রোষান্বিতা ও ফেনময়ী হইয়া গম্ভীর শব্দ করতঃ সর্বনিয়ন্তার শাসনে সমুদ্রসমাগমে গমন করিতেছে। ইহার উভয় তীর হইতে দুই পর্বত বৃহৎ প্রাচীরের ন্যায় অনেক উচ্চ পর্যন্ত সমান উঠিয়া পরে পশ্চাতে হেলিয়া গিয়াছে। রৌদ্রের কিরণ বিস্তর কাল এখানে থাকিবার স্থান প্রাপ্ত হয় না। এই নদীর উপর একটি সুন্দর সেতু ঝুলিতেছে, আমি সেই সেতু দিয়া নদীর পরপারে গিয়া একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাঙ্গালাতে বিশ্রাম করিলাম। এই উপত্যকাভূমি অতি রম্য ও অতি বিরল। ইহার দশ ক্রোশ মধ্যে একটি লোক নাই, একটি গ্রাম নাই। এখানে স্ত্রীপুত্র লইয়া কেবল একটি ঘরে এক জন মনুষ্য বাস করিতেছে। সে তো ঘর নহে,

---

[*] জপজী সাহিব, পোড়ী ৫, ৬, ৭। মূলের পাঠ 'একো দাতা'।

[*] ১৩ জুন ১৮৫৭।

সে পর্বতের গহ্বর; সেখানেই তাহারা রন্ধন করে, সেখানেই তাহারা শয়ন করে। দেখি যে, তাহার স্ত্রী একটি শিশুকে পিঠে নিয়া আহ্লাদে নৃত্য করিতেছে, তাহার আর-একটি ছেলে পর্বতের উপরে সংকট-স্থান দিয়া হাসিয়া হাসিয়া দৌড়াদৌড়ি করিতেছে; তাহার পিতা একটি ছোট ক্ষেত্রে আলু চাষ করিতেছে। এখানে ঈশ্বর তাহাদের সুখের কিছুই অভাব রাখেন নাই। রাজাসনে বসিয়া রাজাদিগের এমন শান্তিসুখ দুর্লভ।

আমি সায়ংকালে এই নদীর সৌন্দর্যে মোহিত হইয়া একাকী তাহার তীরে বিচরণ করিতেছিলাম, হঠাৎ উপরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি যে 'পর্বতো বহ্নিমান্', পর্বতের উপরে দীপমালা শোভা পাইতেছে। সায়ংকালের অবসান হইয়া রাত্রি যত বৃদ্ধি হইতে লাগিল, সেই অগ্নিও ক্রমে তত ব্যাপ্ত হইল। উপর হইতে অগ্নিবাণের ন্যায় নক্ষত্রবেগে শত সহস্র বিস্ফুলিঙ্গ পতিত হইয়া নদীতীর পর্যন্ত নিম্নস্থ বৃক্ষসকলকে আক্রমণ করিল। ক্রমে একে একে সমুদায় বৃক্ষ স্বীয় রূপ পরিত্যাগ করিয়া অগ্নিরূপ ধারণ করিল, এবং অন্ধ তিমির সে স্থান হইতে বহু দূরে প্রস্থান করিল। অগ্নির এই অপরূপ রূপ দেখিতে দেখিতে, যে দেবতা অগ্নিতে তাঁহার মহিমা অনুভব করিতে লাগিলাম। আমি পূর্বে এখানকার অনেক বনে দাবানলের চিহ্ন দগ্ধ বৃক্ষসকল দেখিয়াছি, এবং রাত্রিতে দূরস্থ পর্বতের প্রজ্বলিত অগ্নির শোভাও দর্শন করিয়াছি; কিন্তু এখানে দাবানলের উৎপত্তি ব্যাপ্তি উন্নতি নিবৃত্তি, প্রত্যক্ষ করিয়া আমার বড়ই আহ্লাদ হইল। সমস্ত রাত্রি এই দাবানল জ্বলিয়াছিল। রাত্রিতে যখনি আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, তখনি তাহার আলোক দেখিয়াছি। প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখি যে, অনেক দগ্ধ দারু হইতে ধূম নির্গত হইতেছে, এবং উৎসব-রজনীর প্রভাতকালের অবশিষ্ট দীপালোকের ন্যায়, মধ্যে মধ্যে সর্বভুক্ লোলুপ অগ্নিও ম্লান ও অবসন্ন হইয়া জ্বলিত রহিয়াছে।

আমি সেই নদীতে যাইয়া স্নান করিলাম। ঘটী করিয়া তাহা হইতে জল তুলিয়া মস্তকে দিলাম। সে জল এমনি হিম যে, বোধ হইল যেন মস্তকের মস্তিষ্ক জমিয়া গেল। স্নান ও উপাসনার পর কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করিয়া এখান হইতে প্রস্থান করিলাম। প্রাতঃকাল অবধি আবার এখান হইতে ক্রমিক আরোহণ করিয়া দুপ্রহরের সময় 'দারুণ ঘাট' নামক দারুণ উচ্চ পর্বতের শিখরে উপস্থিত হইয়া দেখি যে সম্মুখে আর-এক নিদারুণ উচ্চ পর্বতশৃঙ্গ তুষারাবৃত হইয়া উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহদ্ভয় ঈশ্বরের মহিমা উন্নত মুখে ঘোষণা করিতেছে। আমি আষাঢ় মাসের প্রথম দিবসে[১] দারুণ ঘাটে উপস্থিত হইয়া সম্মুখস্থিত তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গের আশ্লিষ্ট মেঘাবলী হইতে তুষার বর্ষণ দর্শন করিলাম। আষাঢ় মাসে তুষার বর্ষণ সিমলাবাসীদিগের পক্ষেও আশ্চর্য,

---

[১] ১৪ জুন ১৮৫৭। মেঘদূতের ছায়া এখানকার বর্ণনায় পড়িয়াছে।

যেহেতু চৈত্র মাস শেষ না হইতে হইতেই সিমলা-পর্বত তুষারজীর্ণ বসন পরিত্যাগ করিয়া বৈশাখ মাসে মনোহর বসন্তবেশ ধারণ করে।

২রা আষাঢ়ে এই পর্বত হইতে অবরোহণ করিয়া সিরাহন নামক পর্বতে উপস্থিত হই। সেখানে রামপুরের রানার একটি অট্টালিকা আছে, গ্রীষ্মকালে রামপুরে অধিক উত্তাপ হইলে কখনো কখনো শীতল বায়ু সেবনার্থে রাজা এখানে আসিয়া থাকেন। গ্রীষ্মকালে পর্বততলে আমাদিগের দেশ অপেক্ষা অধিক উত্তাপ হয়; পর্বতচূড়াতেই বারো মাস শীতল বায়ু বহিতে থাকে। ৪ঠা আষাঢ় এখান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ১৩ই আষাঢ়ে[৮] ঈশ্বর প্রসাদাৎ নির্বিঘ্নে আমার সিমলার প্রবাস-ঘরে রুদ্ধ দ্বারে আসিয়া ঘা মারিলাম।

ঠাকুরদাসের বাল্যশিক্ষা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

এই সময়ে, মোটামুটি ইঙ্গরেজী জানিলে, সওদাগর সাহেবদিগের হৌসে, অনায়াসে কর্ম হইত। এজন্য, সংস্কৃত না পড়িয়া, ইঙ্গরেজী পড়াই, তাঁহার পক্ষে পরামর্শসিদ্ধ স্থির হইল। কিন্তু, সে সময়ে, ইঙ্গরেজী পড়া সহজ ব্যাপার ছিল না। তখন, এখনকার মত, প্রতি পল্লীতে ইঙ্গরেজী বিদ্যালয় ছিল না। তাদৃশ বিদ্যালয় থাকিলেও, তাঁহার ন্যায় নিরুপায় দীন বালকের তথায় অধ্যয়নের সুবিধা ঘটিত না। ন্যায়ালংকার মহাশয়ের পরিচিত এক ব্যক্তি কার্যোপযোগী ইঙ্গরেজী জানিতেন। তাঁহার অনুরোধে, ঐ ব্যক্তি ঠাকুরদাসকে ইঙ্গরেজী পড়াইতে সম্মত হইলেন। তিনি বিষয়কর্ম করিতেন; সুতরাং দিবাভাগে, তাঁহার পড়াইবার অবকাশ ছিল না। এজন্য, তিনি ঠাকুরদাসকে সন্ধ্যার সময়, তাঁহার নিকটে যাইতে বলিয়া দিলেন। তদনুসারে, ঠাকুরদাস, প্রত্যহ সন্ধ্যার পর, তাঁহার নিকটে গিয়া, ইঙ্গরেজী পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

ন্যায়ালংকার মহাশয়ের বাটীতে, সন্ধ্যার পরেই উপরিলোকের আহারের কান্ড শেষ হইয়া যাইত। ঠাকুরদাস, ইঙ্গরেজী পড়ার অনুরোধে, সে সময়ে উপস্থিত থাকিতে পারিতেন না; যখন আসিতেন, তখন আর আহার পাইবার সম্ভাবনা থাকিত না; সুতরাং, তাঁহাকে রাত্রিতে অনাহারে থাকিতে হইত। এইরূপে নক্তন আহারে বঞ্চিত হইয়া, তিনি, দিন দিন, শীর্ণ ও দুর্বল হইতে লাগিলেন। একদিন, তাঁহার শিক্ষক

[৮] ২৬ জুন ১৮৫৭।

জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এমন শীর্ণ ও দুর্বল হইতেছ কেন? তিনি কী কারণে তাঁহার সেরূপ অবস্থা ঘটিতেছে, অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাহার পরিচয় দিলেন। ঐ সময়ে, সেই স্থানে শিক্ষকের আত্মীয় শূদ্রজাতীয় এক দয়ালু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, তিনি অতিশয় দুঃখিত হইলেন, এবং ঠাকুরদাসকে বলিলেন, যেরূপ শুনিলাম, তাহাতে আর তোমার ওরূপ স্থানে থাকা কোনও মতে চলিতেছে না। যদি তুমি রাঁধিয়া খাইতে পার, তাহা হইলে, আমি তোমায় আমার বাসায় রাখিতে পারি। এই সদয় প্রস্তাব শুনিয়া, ঠাকুরদাস, যারপরনাই আহ্লাদিত হইলেন, এবং পর দিন অবধি, তাঁহার বাসায় গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এই সদাশয় দয়ালু মহাশয়ের দয়া ও সৌজন্য যেরূপ ছিল, আয় সেরূপ ছিল না। তিনি, দালালি করিয়া, সামান্যরূপ উপার্জন করিতেন। যাহা হউক, এই ব্যক্তির আশ্রয়ে আসিয়া, ঠাকুরদাসের নির্বিঘ্নে, দুইবেলা আহার ও ইংরেজী পড়া চলিতে লাগিল। কিছুদিন পরে, ঠাকুরদাসের দুর্ভাগ্যক্রমে, তদীয় আশ্রয়দাতার আয় বিলক্ষণ খর্ব হইয়া গেল, সুতরাং তাঁহার নিজের ও তাঁহার আশ্রিত ঠাকুরদাসের, অতিশয় কষ্ট উপস্থিত হইল। তিনি, প্রতি দিন, প্রাতঃকালে, বহির্গত হইতেন, এবং কিছু হস্তগত হইলে, কোনও দিন দেড় প্রহরের, কোনও দিন দুই প্রহরের, কোনও দিন আড়াই প্রহরের সময়, বাসায় আসিতেন; যাহা আনিতেন, তাহা দ্বারা, কোনও দিন বা কষ্টে, কোনও দিন বা স্বচ্ছন্দে, নিজের ও ঠাকুরদাসের আহার সম্পন্ন হইত। কোনও কোনও দিন, তিনি দিবাভাগে বাসায় আসিতেন না। সেই সেই দিন, ঠাকুরদাসকে, সমস্ত দিন উপবাসী থাকিতে হইত।

ঠাকুরদাসের সামান্যরূপ একখানি পিতলের থালা ও একটি ছোট ঘটী ছিল। থালাখানিতে ভাত ও ঘটীটিতে জল খাইতেন। তিনি বিবেচনা করিলেন, এক পয়সার শালপাতা কিনিয়া রাখিলে, ১০।১২ দিন ভাত খাওয়া চলিবেক; সুতরাং থালা না থাকিলে, কাজ আট্‌কাইবেক না; অতএব, থালাখানি বেচিয়া ফেলি; বেচিয়া যাহা পাইব, তাহা আপনার হাতে রাখিব। যে দিন দিনের বেলায় আহারের যোগাড় না হইবেক, এক পয়সার কিছু কিনিয়া খাইব। এই স্থির করিয়া, তিনি সেই থালাখানি, নূতন বাজারে, কাঁসারিদের দোকানে বেচিতে গেলেন। কাঁসারিরা বলিল, আমরা অজানিত লোকের নিকট হইতে পুরান বাসন কিনিতে পারিব না। পুরান বাসন কিনিয়া কখনও কখনও, বড় ফেসাতে পড়িতে হয়। অতএব, আমরা তোমার থালা লইব না। এইরূপে কোনও দোকানদারই সেই থালা কিনিতে সম্মত হইল না। ঠাকুরদাস, বড় আশা করিয়া, থালা বেচিতে গিয়াছিলেন; এক্ষণে, সে আশায় বিসর্জন দিয়া, বিষণ্ণ মনে বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

একদিন মধ্যাহ্ন সময়ে ক্ষুধায় অস্থির হইয়া ঠাকুরদাস বাসা হইতে বহির্গত

হইলেন, এবং অন্যমনস্ক হইয়া ক্ষুধার যাতনা ভুলিবার অভিপ্রায়ে, পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিয়ংক্ষণ ভ্রমণ করিয়া, তিনি অভিপ্রায়ের সম্পূর্ণ বিপরীত ফল পাইলেন। ক্ষুধার যাতনা ভুলিয়া যাওয়া দূরে থাকুক, বড়বাজার হইতে ঠনঠনিয়া পর্যন্ত গিয়া, এত ক্লান্ত ও ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় এত অভিভূত হইলেন, যে আর তাঁহার চলিবার ক্ষমতা রহিল না। কিঞ্চিৎ পরেই তিনি এক দোকানের সম্মুখে উপস্থিত ও দণ্ডায়মান হইলেন; দেখিলেন, এক মধ্যবয়স্কা বিধবা নারী ঐ দোকানে বসিয়া মুড়ি মুড়কি বেচিতেছেন। তাঁহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, ঐ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপাঠাকুর, দাঁড়াইয়া আছ কেন? ঠাকুরদাস তৃষ্ণার উল্লেখ করিয়া, পানার্থে জল প্রার্থনা করিলেন। তিনি, সাদর ও সস্নেহ বাক্যে ঠাকুরদাসকে বসিতে বলিলেন, এবং ব্রাহ্মণের ছেলেকে শুধু জল দেওয়া অবিধেয়, এই বিবেচনা করিয়া, কিছু মুড়কি ও জল দিলেন। ঠাকুরদাস যেরূপ ব্যগ্র হইয়া, মুড়কিগুলি খাইলেন, তাহা এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া, ঐ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপাঠাকুর, আজ বুঝি তোমার খাওয়া হয় নাই? তিনি বলিলেন, না, মা, আজ আমি, এখন পর্যন্ত, কিছুই খাই নাই। তখন, সেই স্ত্রীলোক ঠাকুরদাসকে বলিলেন, বাপাঠাকুর, জল খাইও না, একটু অপেক্ষা কর। এই বলিয়া নিকটবর্তী গোয়ালার দোকান হইতে, সত্বর, দই কিনিয়া আনিলেন, এবং আরও মুড়কি দিয়া, ঠাকুরদাসকে পেট ভরিয়া ফলার করাইলেন; পরে, তাঁহার মুখে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, জিদ করিয়া বলিয়া দিলেন, যে দিন তোমার এরূপ ঘটিবেক, এখানে আসিয়া ফলার করিয়া যাইবে।

পিতৃদেবের মুখে এই হৃদয়বিদারণ উপাখ্যান শুনিয়া, আমার অন্তঃকরণে যেমন দুঃসহ দুঃখানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, স্ত্রীজাতির উপর তেমনই প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল। এই দোকানের মালিক, পুরুষ হইলে, ঠাকুরদাসের উপর কখনই, এরূপ দয়া প্রকাশ ও বাৎসল্য প্রদর্শন করিতেন না। যাহা হউক, যে যে দিন, দিবাভাগে আহারের যোগাড় না হইত, ঠাকুরদাস সেই সেই দিন, ঐ দয়াময়ীর আশ্বাসবাক্য অনুসারে তাঁহার দোকানে গিয়া, পেট ভরিয়া, ফলার করিয়া আসিতেন।

সে-কালের ইংরেজী-শিক্ষা

রাজনারায়ণ বসু

যখন বঙ্গসমাজ এইরূপে চলিতেছিল, তখন ইহা পরিবর্তন করিতে এক ব্যক্তি বিশেষ চেষ্টান্বিত ছিলেন। তিনি কে, না, স্কুল মাষ্টার। প্রথমে তাঁহার বেশভূষা

অদ্ভুত, ইংরাজী উচ্চারণ কদাকার, শিক্ষাপ্রণালী অপকৃষ্ট ছিল। রাজা সর্ রাধাকান্ত
দেব বাহাদুরকে এক জন ইংরাজী পড়াইতেন। তিনি যখন পড়াইতে আসিতেন, তখন
জরির জুতা ও মতির মালা পরিয়া আসিতেন। এখন একবার মনে করে দেখুন দেখি,
প্রেসিডেন্সি কালেজের এক জন বাঙ্গালী অধ্যাপক মতির মালা গলায় ও জরির জুতা
পায় দিয়া বসিয়া পড়াইতেছেন, কি চমৎকার বোধ হয়! সর্ব্বপ্রথমে লোকের ইংরাজী
পড়িতে হইলে, টামস্ ডিস্ প্রণীত স্পেলিং বুক, স্কুলমাষ্টার, কামরূপা ও তুতিনামা
এই সকল পুস্তক পাঠ করিতে হইত। "স্কুলমাষ্টার" পুস্তকে সকলই ছিল, গ্রামার,
স্পেলিং ও রীডর। কামরূপাতে এক রাজপুত্রের গল্প লিখিত ছিল। তুতিনামা ঐ
নামের পারসিক পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ। কেহ যদি অত্যন্ত অধিক পড়িতেন, তিনি
আরবি নাইট পড়িতেন। যিনি রয়েল গ্রামার পড়িতেন, লোকে মনে করিত, তাঁহার
মত বিদ্বান্ আর কেহ নাই। Grammar, Logic ও Rhetoric অর্থাৎ ব্যাকরণ,
ন্যায় ও অলঙ্কার এই তিন বিষয়ে তখন কতকগুলি উত্তম পুস্তক রচিত হইয়াছিল।
তাহাদের নাম Port Royal Grammar, Port Royal Logic ইত্যাদি। লোকে
বলিত, "রয়েল গ্রামার ময়াল সাপ"; যেমন ময়াল সাপ বৃহৎ সাপ, তেমনি রয়েল গ্রামার
পড়া অনেক বিদ্যার কর্ম্ম। তখন স্পেলিংএর প্রতি লোকের বড় মনোযোগ ছিল।
বিবাহ সভায় এই বিষয়ে বড় পীড়াপীড়ি হইত। কেহ জিজ্ঞাসা করিতেন, How do
you spell Nebuchadnezzar? কেহ জিজ্ঞাসা করিতেন, How do spell
Xerxes? ঐ সকল শব্দ ও Xenophone, Kamschatka প্রভৃতি শব্দের বানান
জিজ্ঞাসা দ্বারা লোকের বিদ্যার পরীক্ষা হইত। তখন ঐরূপ সভায় ইংরাজীওয়ালারা
পরস্পর এই বলিয়া নাম জিজ্ঞাসা করিতেন, "What denomination put your
papa?" তখন শব্দের অর্থ মুখস্থ করিবার বিবিধ প্রণালী ছিল। যথা—

(এক একটি শব্দের এক একটি অর্থ)।

গাড (God) ঈশ্বর॥ কম্ (Come) আইস॥ আই (I) আমি॥

লাড (Lord) ঈশ্বর॥ গো (Go) যাও॥ ইউ (You) তুমি॥ ইত্যাদি।

এক একটি ইংরাজী শব্দের কতকগুলি অর্থও একেবারে সাধিতে হইত। যথা:
Well—আচ্ছা, ভাল, পাতকো; Bear—সহ, বহ, ভল্লুক। সে কালের লোকেরা
যাহার উচ্চারণ সমান মনে করিতেন, এমন কতকগুলি ইংরাজী শব্দের ভিন্ন ভিন্ন
অর্থ একেবারে অভ্যাস করিতেন। যথা—ফ্লোর (Flower) ফুল; ফ্লোর (Flour)
ময়দা, ফ্লোর (Floor) মেঝে। তাঁহারা "Flower", "Flour", Floor" এই তিন
শব্দ এক রকম উচ্চারণ করিতেন। তখন লোকে ডিক্‌ষনারি মুখস্থ করিত। তাঁহারা
এক জনে Walking Dictionary অর্থাৎ সচল অভিধান ছিলেন। মনে করুন,
ডিক্‌ষনারি মুখস্থ করা কি বিষম ব্যাপার! তখন ঘোষাণোর রীতি ছিল। ঘোষাণোর

অর্থ পয়ার ছন্দে গ্রথিত, কোন দ্রব্যশ্রেণীর অন্তর্গত সমস্ত দ্রব্যের ইংরাজী নাম সুর করিয়া মুখস্থ বলা। আপনি এক স্কুল দেখিতে গেলেন, স্কুল মাষ্টার আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ঘোষাব? গ্যার্ডেন (Garden) ঘোষাব, না স্পাইস্ (Spice) ঘোষাব?" ইহার অর্থ, উদ্যানজাত সকল দ্রব্যের নাম মুখস্থ বলাব, না সকল মশলার নাম মুখস্থ বলাব? যদি স্থির হইল গ্যার্ডেন ঘোষাও, তবে সর্দ্দার পোড়ো চেঁচিয়ে বলিল, "পম্‌কিন (Pumpkin) লাউ কুমড়ো"; অমনি আর সকলে বলিয়া উঠিল, "পম্‌কিন—লাউ কুমড়ো।" সর্দ্দার পোড়ো বলিল, "কোকোম্বর (Cucumber) শসা;" আর সকলে অমনি বলিল "কোকোম্বর—শসা।" সর্দ্দার পোড়ো বলিল "প্লোম্যান (Ploughman) চাসা," আর সকলে অমনি বলিল, "প্লোম্যান—চাসা।" এই সকল শব্দগুলি একত্র করিলে একটি কবিতা উৎপন্ন হয়।—

পম্‌কিন লাউ কুম্‌ড়ো, কোকোম্বর শসা।
ব্রিঞ্জেল বার্ত্তাকু, প্লোম্যান চাসা॥

কখন কখন সঙ্গীত আকারে ইংরাজী শব্দের বাঙ্গালা অর্থ বসান হইত। যথা—

নাই (Nigh) কাছে, নিয়র (Near) কাছে
নিয়রেষ্ট (Nearest) অতি-কাছে।
কট্ (Cut) কাট, কট (Cot) খাট
ফলোয়িং (Following) পাছে।

এ ছাড়া আবার "আরবি নাইটের পালা" হইত, অর্থাৎ তবলা ঢোলক মন্দিরা লইয়া ইংরাজী পয়ারে লিখিত আরবিয়ান নাইটের গল্প বাসায় বাসায় গান করিয়া বেড়ান হইত।

"The Chronicles of the Sasarians
That extended their dominions."

এইরূপ পয়ারে উল্লিখিত আরবি নাইটের পালা রচিত হইত।

ইংরাজদিগের যে সকল সরকার থাকিত, তাহাদের ভাষা ও কথোপকথন আরো চমৎকার ছিল। একজন সাহেব তাঁহার সরকারের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। সরকার বলিল—মাষ্টার ক্যান্ লিব্, মাষ্টার ক্যান্ ডাই (Master can live, master can die) অর্থাৎ মনিব আমাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারেন, অথবা মারিয়া ফেলিতে পারেন। সাহেব "What, master can die?" এই কথা বলিয়া সরকারকে মারিবার জন্য লাঠি উচাইলেন। সরকারের তখন মনে পড়িল "ডাই" শব্দের অন্য অর্থ আছে, তখন "ষ্টাপ্ দেয়ার" (Stop there) অর্থাৎ প্রহার করিতে লাঠি উঠাইও না, এই বলিয়া হাত উঁচু করিল, তৎপরে অঙ্গুলি দ্বারা আপনাকে দেখাইয়া বলিল, "ডাই মি"

(Die me) অর্থাৎ আমাকে মারিয়া ফেলিতে পারেন। "ইফ্ মাষ্টার ডাই, দেন আই ডাই, মাই কো ডাই, মাই ব্লাক ষ্টোন্ ডাই, মাই ফোরটীন জেনারেষণ ডাই।" If master die, then I die, my cow die, my black stone die, my fourteen generation die." "যদ্যপি মনিব মরেন, তবে আমি মরিব, আমার কো অর্থাৎ গরু মরিবে, আমার ব্লাক ষ্টোন্ অর্থাৎ বাড়ির শালগ্রাম ঠাকুর মরিবেন, আমার ফোরটীন্ জেনারেষণ অর্থাৎ চোদ্দ পুরুষ মরিবে।" একবার রথের দিবস এক সরকার কামাই করে। পরদিন সে আইলে সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল কেন আইস নাই?" সরকার রথের ব্যাপার কিরূপে বুঝাইবে ভাবিয়া আকুল। শেষে বলিয়া উঠিল চর্চ্চ (Church) রথের আকার গির্জার মত, তাই কথাটি বুঝাইবার পক্ষে বড় উপায় হইল। কিন্তু চর্চ্চ বলিলে ইটের গাঁথুনি বুঝায়, এ জন্য পরক্ষণেই বলা হইল, "উডেন চর্চ্চ" অর্থাৎ কাষ্ঠের গির্জ্জা। তাহা হইলেও বুঝা গেল না; তখন তাহাকে আরো ব্যাখ্যা করিতে হইল—"থ্রি ষ্টারিস হাই।" "Three stories high," "গাড আলমাইটী সিট্ অপন" (God Almighty sit upon) অর্থাৎ জগন্নাথ দেব বসিয়া আছেন, "লাং লাং রোপ" (Long Long rope), "থোঁজন্ড মেন ক্যাচ" (Thousand men catch), "পুল পুল পুল" (Pull, pull, pull) রনাওয়ে রনাওয়ে" (Run away, run away) "হরি হরি বোল—হরি হরি বোল।"

ইংরাজী শিক্ষার এই দুর্দ্দশা হিন্দু কালেজ সংস্থাপিত হইলে বিমোচিত হইল।

সাগরসঙ্গমে নবকুমার

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রায় দুই শত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এক দিন মাঘ মাসের রাত্রিশেষে একখানি যাত্রীর নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল। পর্তুগীস ও অন্যান্য নাবিকদস্যু-দিগের ভয়ে যাত্রীর নৌকা দলবদ্ধ হইয়া যাতায়াত করাই তৎকালের প্রথা ছিল; কিন্তু এই নৌকারোহীরা সঙ্গিহীন। তাহার কারণ এই যে, রাত্রিশেষে ঘোরতর কুজ্ঝটিকা দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়াছিল; নাবিকেরা দিঙ্‌নিরূপণ করিতে না পারিয়া বহর হইতে দূরে পড়িয়াছিল। এক্ষণে কোন্ দিকে কোথায় যাইতেছে, তাহার কিছুই নিশ্চয়তা ছিল না। নৌকারোহিগণ অনেকেই নিদ্রা যাইতেছিলেন। এক জন প্রাচীন এবং এক

STATE INSTITUTE OF EDUCATION Govt. of ...

জন যুবা পুরুষ, এই দুই জন মাত্র জাগ্রৎ অবস্থায় ছিলেন। প্রাচীন যুবকের সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। বারেক কথাবার্তা স্থগিত রাখিয়া বৃদ্ধ নাবিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাঝি, আজ কত দূর যেতে পারবি?"

মাঝি কিছু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "বলিতে পারিলাম না।"

বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া মাঝিকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। যুবক কহিলেন, "মহাশয়, যাহা জগদীশ্বরের হাত, তাহা পণ্ডিতে বলিতে পারে না—ও মূর্খ কি প্রকারে বলিবে? আপনি ব্যস্ত হইবেন না।"

বৃদ্ধ উগ্রভাবে কহিলেন, "ব্যস্ত হব না? বল কি, বেটারা বিশ-পঁচিশ বিঘার ধান কাটিয়া লইয়া গেল, ছেলেপিলে সম্বৎসর খাবে কি?"

এ সংবাদ তিনি সাগরে উপনীত হইলে পরে পশ্চাদাগত অন্য যাত্রীর মুখে পাইয়াছিলেন। যুবা কহিলেন, "আমি তো পূর্বেই বলিয়াছিলাম, মহাশয়ের বাটীতে অভিভাবক আর কেহ নাই—মহাশয়ের আসা ভালো হয় নাই।"

প্রাচীন পূর্ববৎ উগ্রভাবে কহিলেন, "আসব না? তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে! এখন পরকালের কর্ম করিব না তো কবে করিব?"

যুবা কহিলেন, "যদি শাস্ত্র বুঝিয়া থাকি, তবে তীর্থদর্শনে যেরূপ পরকালের কর্ম হয়, বাটী বসিয়াও সেরূপ হইতে পারে।"

বৃদ্ধ কহিলেন, "তবে তুমি এলে কেন?"

যুবা উত্তর করিলেন, "আমি তো আগেই বলিয়াছি যে, সমুদ্র দেখিব বড়ো সাধ ছিল, সেই জন্যই আসিয়াছি।" পরে অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন, "আহা! কি দেখিলাম! জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না—

'দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশের্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥'

বৃদ্ধের শ্রুতি কবিতার প্রতি ছিল না, নাবিকেরা পরস্পর যে কথোপকথন করিতেছিল তাহাই একতান-মনা হইয়া শুনিতেছিলেন।

একজন নাবিক অপরকে কহিতেছিল, "ও ভাই, এ তো বড়ো কাজটা খারাবি হল—এখন কি বার-দরিয়ায় পড়লেম, কি কোন্ দেশে এলেম, তা যে বুঝিতে পারি না।"

বক্তার স্বর অত্যন্ত ভয়কাতর। বৃদ্ধ বুঝিলেন যে, কোনো বিপদ্-আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হইয়াছে। সশঙ্কচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাঝি, কি হয়েছে?" মাঝি উত্তর করিল না। কিন্তু যুবক উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে, প্রায় প্রভাত হইয়াছে। চতুর্দিক্ অতিগাঢ় কুজ্ঝটিকায় ব্যাপ্ত হইয়াছে—আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, উপকূল, কোনো দিকে কিছুই দেখা যাইতেছে না। বুঝিলেন, নাবিকদিগের দিগ্‌ভ্রম হইয়াছে। এক্ষণে কোন্ দিকে যাইতেছে তাহার

নিশ্চয়তা পাইতেছে না—পাছে বাহির-সমুদ্রে পড়িয়া অকূলে মারা যায় এই আশঙ্কায় ভীত হইয়াছে।

হিমনিবারণ-জন্য সম্মুখে আবরণ দেওয়া ছিল, এজন্য নৌকার ভিতর হইতে আরোহীরা এ-সকল বিষয় কিছুই জানিতে পারেন নাই। কিন্তু নব্য যাত্রী অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বৃদ্ধকে সবিশেষ কহিলেন; তখন নৌকামধ্যে মহাকোলাহল পড়িয়া গেল। যে কয়েকটি স্ত্রীলোক নৌকামধ্যে ছিল, তন্মধ্যে কেহ কেহ কথার শব্দে জাগিয়াছিল, শুনিবামাত্র তাহারা আর্তনাদ করিয়া উঠিল। প্রাচীন কহিলেন, "কেনারায় পড়! কেনারায় পড়! কেনারায় পড়!"

নব্য ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "কেনারা কোথা, তাহা জানিতে পারিলে এত বিপদ হইবে কেন?"

ইহা শুনিয়া নৌকারোহীদিগের কোলাহল আরও বৃদ্ধি পাইল। নব্য যাত্রী কোনোমতে তাহাদিগকে স্থির করিয়া নাবিকদিগকে কহিলেন, "আশঙ্কার বিষয় কিছুই নাই, প্রভাত হইয়াছে—চারি-পাঁচ দণ্ডের মধ্যে অবশ্য সূর্যোদয় হইবে। চারি-পাঁচ দণ্ডের মধ্যে নৌকা কদাচ মারা যাইবে না। তোমরা এক্ষণে বাহন বন্ধ করো, স্রোতে নৌকা যথায় যায় যাক; পশ্চাৎ রৌদ্র হইলে পরামর্শ করা যাইবে।"

নাবিকেরা এই পরামর্শে সম্মত হইয়া তদনুরূপ আচরণ করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত নাবিকেরা নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। যাত্রীরা ভয়ে কণ্ঠাগতপ্রাণ। বেশি বাতাস নাই। সুতরাং তাঁহারা তরঙ্গান্দোলনকম্প বড়ো জানিতে পারিলেন না। তথাপি সকলেই মৃত্যু নিকট নিশ্চিত করিলেন। পুরুষেরা নিঃশব্দে দুর্গানাম জপ করিতে লাগিলেন, স্ত্রীলোকেরা সুর তুলিয়া বিবিধ শব্দবিন্যাসে কাঁদিতে লাগিল। একটি স্ত্রীলোক গঙ্গসাগরে সন্তান বিসর্জন করিয়া আসিয়াছিল, ছেলে জলে দিয়া আর তুলিতে পারে নাই—সে-ই কেবল কাঁদিল না।

প্রতীক্ষা করিতে করিতে অনুভবে বেলা প্রায় এক প্রহর হইল। এমত সময়ে অকস্মাৎ নাবিকেরা দরিয়ার পাঁচ-পীরের নাম কীর্তিত করিয়া মহাকোলাহল করিয়া উঠিল। যাত্রীরা সকলেই জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "কি! কি! মাঝি, কি হইয়াছে?" মাঝিরাও একবাক্যে কোলাহল করিয়া কহিতে লাগিল, "রোদ উঠেছে! রোদ উঠেছে! ঐ দেখো ডাঙা!" যাত্রীরা সকলেই ঔৎসুক্যসহকারে নৌকার বাহিরে আসিয়া, কোথায় আসিয়াছেন, কি বৃত্তান্ত, দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, সূর্য প্রকাশ হইয়াছে। কুজ্‌ঝটিকার অন্ধকাররাশি হইতে দিঙ্‌মণ্ডল একেবারে বিমুক্ত হইয়াছে। বেলা প্রায় প্রহরাতীত হইয়াছে। যে স্থানে নৌকা আসিয়াছে সে প্রকৃত মহাসমুদ্র নহে, নদীর মোহানা মাত্র, কিন্তু তথায় নদীর যেরূপ বিস্তার, সেরূপ বিস্তার আর কোথাও নাই। নদীর এক কূল নৌকার অতি নিকটবর্তী বটে, এমন-কি পঞ্চাশৎ হস্তের মধ্যগত;

কিন্তু অপর কূলের চিহ্ন দেখা যায় না। আর, যে দিকেই দেখা যায়, অনন্তজলরাশি চঞ্চল রবিরশ্মিমালা প্রদীপ্ত হইয়া গগনপ্রান্তে গগন-সহিত মিশিয়াছে। নিকটস্থ জল সচরাচর সকর্দম-নদীজল-বর্ণ; কিন্তু দূরস্থ বারিরাশি নীলপ্রভ; আরোহীরা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করিলেন যে, তাঁহারা মহাসমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছেন; তবে সৌভাগ্য এই যে, উপকূল নিকটে, আশঙ্কার বিষয় নাই। সূর্য-প্রতি দৃষ্টি করিয়া দিক্ নিরূপিত করিলেন। সম্মুখে যে উপকূল দেখিতেছিলেন, সে সহজেই সমুদ্রের পশ্চিম তট বলিয়া সিদ্ধান্ত হইল। তটমধ্যে নৌকার অনতিদূরে এক নদীর মুখ মন্দগামী কলধৌত-প্রবাহবৎ আসিয়া পড়িতেছিল। সঙ্গমস্থলে দক্ষিণ পার্শ্বে বৃহৎ সৈকতভূমিখণ্ডে নানাবিধ পক্ষিগণ অগণিত সংখ্যায় ক্রীড়া করিতেছিল। এই নদী এক্ষণে 'রসুলপুরের নদী' নাম ধারণ করিয়াছে।

আরোহীদিগের স্ফূর্তিব্যঞ্জক কথা সমাপ্ত হইলে নাবিকেরা প্রস্তাব করিল যে, জোয়ারের বিলম্ব আছে—এই অবকাশে আরোহিগণ সম্মুখস্থ সৈকতে পাকাদি সমাপন করুন, পরে জলোচ্ছ্বাস-আরম্ভেই স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিতে পারিবেন। আরোহি-বর্গও এই পরামর্শে সম্মতি দিলেন। তখন নাবিকেরা তরী তীরলগ্ন করিলে আরোহিগণ অবতরণ করিয়া স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য-সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন।

স্নানাদির পর পাকের উদ্‌যোগে আর-এক নূতন বিপত্তি উপস্থিত হইল—নৌকায় পাকের কাষ্ঠ নাই। ব্যাঘ্রভয়ে উপর হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনিতে কেহই স্বীকৃত হইল না। পরিশেষে সকলের উপবাসের উপক্রম দেখিয়া প্রাচীন, প্রাগুক্ত যুবাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বাপু নবকুমার! তুমি ইহার উপায় না করিলে আমরা এতগুলি লোক মারা যাই।"

নবকুমার কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আচ্ছা যাইব; কুড়ালি দাও, আর দা লইয়া একজন আমার সঙ্গে আইস।"

কেহই নবকুমারের সহিত যাইতে চাহিল না।

"খাবার সময় বুঝা যাবে" এই বলিয়া নবকুমার কোমর বাঁধিয়া একাকী কুঠারহস্তে কাষ্ঠাহরণে চলিলেন।

তীরোপরি আরোহণ করিয়া নবকুমার দেখিলেন যে, যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর-মধ্যে কোথাও বসতির লক্ষণ কিছুই নাই—কেবল বন মাত্র। কিন্তু সে বন, দীর্ঘ বৃক্ষাবলীশোভিত বা নিবিড় বন নহে—কেবল স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্ মণ্ডলাকারে কোনো কোনো ভূমিখণ্ড ব্যাপিয়া আছে। নবকুমার তন্মধ্যে আহরণযোগ্য কাষ্ঠ দেখিতে পাইলেন না; সুতরাং উপযুক্ত বৃক্ষের অনুসন্ধানে নদীতট হইতে অধিক দূর গমন করিতে হইল। পরিশেষে ছেদনযোগ্য একটি বৃক্ষ পাইয়া তাহা হইতে প্রয়োজনীয় কাষ্ঠ সমাহরণ করিলেন। কাষ্ঠ বহন করিয়া আনা আর-এক বিষম কঠিন

ব্যাপার বোধ হইল। নবকুমার দরিদ্রের সন্তান ছিলেন না, এ-সকল কর্মে অভ্যাস ছিল না; সম্যক্‌ বিবেচনা না করিয়া কাষ্ঠ-আহরণে আসিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে কাষ্ঠভার-বহন বড়ো ক্লেশকর হইল। যাহাই হউক্‌, যে কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহাতে অল্পে ক্ষান্ত হওয়া নবকুমারের স্বভাব ছিল না, এজন্য তিনি কোনোমতে কাষ্ঠভার বহিয়া আনিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর বহেন, পরে ক্ষণিক বসিয়া বিশ্রাম করেন, আবার বহেন; এইরূপে আসিতে লাগিলেন।

এই হেতুবশতঃ নবকুমারের প্রত্যাগমনে বিলম্ব হইতে লাগিল। এ দিকে সমভিব্যাহারিগণ তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া উদ্‌বিগ্ন হইতে লাগিল। তাহাদিগের এইরূপ আশঙ্কা হইল যে, নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিয়াছে। সম্ভাব্য কাল অতীত হইলে এইরূপই তাহাদিগের হৃদয়ে স্থির সিদ্ধান্ত হইল; অথচ কাহারও এমন সাহস হইল না যে, তীরে উঠিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহার অনুসন্ধান করে।

নৌকারোহিগণ এইরূপে কল্পনা করিতেছিল, ইত্যবসরে জলরাশি-মধ্যে ভৈরব-কল্লোল উত্থিত হইল। নাবিকেরা বুঝিল যে, জোয়ার আসিতেছে। নাবিকেরা বিশেষ জানিত যে, এ-সকল স্থানে জলোচ্ছ্বাসকালে তটদেশে এরূপ প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাত হয় যে, তখন নৌকাদি তীরবর্তী থাকিলে তাহা খণ্ড-খণ্ড হইয়া যায়। এজন্য তাহারা অতিব্যস্তে নৌকার বন্ধন মোচন করিয়া নদীমধ্যবর্তী হইতে লাগিল। নৌকা মুক্ত হইতে না হইতে সম্মুখস্থ সৈকতভূমি জলপ্লাবিত হইয়া গেল, যাত্রিগণ কেবল ত্রস্তে নৌকায় উঠিতে অবকাশ পাইয়াছিল, তণ্ডুলাদি যাহা যাহা চরে স্থিত হইয়াছিল, তৎসমুদয় ভাসিয়া গেল। দুর্ভাগ্যবশতঃ নাবিকেরা সুনিপুণ নহে, নৌকা সামলাইতে পারিল না; প্রবল জলপ্রবাহবেগে তরণী রসুলপুরের নদীর মধ্যে যাইতে লাগিল। একজন অরোহী কহিল, "নবকুমার রহিল যে!" একজন নাবিক কহিল, "আঃ, তোর নবকুমার কি আছে? তাকে 'শিয়ালে' খাইয়াছে।"

জলবেগে নৌকা রসুলপুরের নদীর মধ্যে লইয়া যাইতেছে, প্রত্যাগমন করিতে বিস্তর ক্লেশ হইবে, এইজন্য নাবিকেরা প্রাণপণে তাহার বাহিরে আসিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। এমন-কি সেই মাঘ মাসে তাহাদিগের ললাটে স্বেদস্রুতি হইতে লাগিল। এইরূপ পরিশ্রম-দ্বারা রসুলপুরের নদীর ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে লাগিল বটে, কিন্তু নৌকা যেমন বাহিরে আসিল, অমনি তথাকার প্রবলতর স্রোতে উত্তরমুখী হইয়া তীরবৎ বেগে চলিল, নাবিকেরা তাহা তিলার্ধমাত্র সংযম করিতে পারিল না। নৌকা আর ফিরল না।

যখন জলবেগ এমন মন্দীভূত হইয়া আসিল যে, নৌকার গতি সংযত করা যাইতে পারে, তখন যাত্রীরা রসুলপুরের মোহানা অতিক্রম করিয়া অনেক দূর আসিয়াছিলেন। এখন নবকুমারের জন্য প্রত্যাবর্তন করা যাইবে কি না, এ বিষয়ের মীমাংসা আবশ্যক

হইল। এ স্থানে বলা আবশ্যক যে, নবকুমারের সহযাত্রীরা তাঁহার প্রতিবেশী মাত্র, কেহই আত্মবন্ধু নহেন। তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, তথা হইতে প্রতিবর্তন করা আর-এক ভাঁটার কর্ম। পরে রাত্রি আগত হইবে, আর রাত্রে নৌকাচালনা হইতে পারিবে না, অতএব পরদিনের জোয়ারের প্রতীক্ষা করিতে হইবে। এ কাল পর্যন্ত সকলকে অনাহারে থাকিতে হইবে। দুই দিন নিরাহারে সকলের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবে। বিশেষ, নাবিকেরা প্রতিগমন করিতে অসম্মত, তাহারা কথার বাধ্য নহে; তাহারা বলিতেছে যে, নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিয়াছে। তাহাই সম্ভব। তবে এত ক্লেশ-স্বীকার কি জন্য?

এরূপ বিবেচনা করিয়া যাত্রীরা নবকুমার ব্যতীত স্বদেশে গমনই উচিত বিবেচনা করিলেন। নবকুমার সেই ভীষণ সমুদ্রতীরে বনবাসে বিসর্জিত হইলেন।

ইহা শুনিয়া যদি কেহ প্রতিজ্ঞা করেন, কখনও পরের উপবাসনিবারণার্থ কাষ্ঠা-হরণে যাইবেন না, তবে তিনি উপহাসাস্পদ। আত্মোপকারীকে বনবাসে বিসর্জন করা যাহাদিগের প্রকৃতি তাহারা চিরকাল আত্মোপকারীকে বনবাস দিবে—কিন্তু যতবার বনবাসিত করুক না কেন, পরের কাষ্ঠাহরণ করা যাহার স্বভাব, সে পুনর্বার পরের কাষ্ঠাহরণে যাইবে। তুমি অধম—তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?

বাহুবল ও বাক্যবল

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

যে-বলে পশুগণ এবং মনুষ্যগণ উভয়ে প্রধানতঃ স্বার্থসাধন করে, তাহাই বাহুবল। প্রকৃত পক্ষে ইহা পশুবল, কিন্তু কার্যে সর্বক্ষণ, এবং সর্বত্রই শেষ নিষ্পত্তিস্থল। যাহার আর কিছুতেই নিষ্পত্তি হয় না—তাহার নিষ্পত্তি বাহুবলে। এমন গ্রন্থি নাই যে, ছুরিতে কাটা যায় না—এমত প্রস্তর নাই যে, আঘাতে ভাঙে না। বাহুবল ইহজগতের উচ্চ আদালত—সকল আপীলের পর আপীল এইখানে; ইহার উপর আর আপীল নাই। বাহুবল—পশুর বল; কিন্তু মনুষ্য অদ্যাপি কিয়দংশে পশু, এজন্য বাহুবল মনুষ্যের প্রধান অবলম্বন।

কিন্তু পশুগণের বাহুবলে এবং মনুষ্যের বাহুবলে একটু গুরুতর প্রভেদ আছে। পশুগণের বাহুবল নিত্য ব্যবহার করিতে হয়—মনুষ্যের বাহুবল নিত্য ব্যবহারের

প্রয়োজন নাই। ইহার কারণ দুইটি। বাহুবল অনেক পশুগণের একমাত্র উদরপূর্তির উপায়। দ্বিতীয় কারণ, পশুগণ প্রযুক্ত বাহুবলের বশীভূত বটে, কিন্তু প্রয়োগের পূর্বে প্রয়োগসম্ভাবনা বুঝিয়া উঠে না। এবং সমাজবদ্ধ নহে বলিয়া বাহুবলপ্রয়োগের প্রয়োজন নিবারণ করিতে পারে না। উপন্যাসে কথিত আছে যে, এক বনের পশুগণ, কোনো সিংহকর্তৃক বন্য পশুগণ নিত্য হত হইতেছে দেখিয়া, সিংহের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিল যে, প্রত্যহ পশুগণের উপর পীড়ন করিবার প্রয়োজন নাই—একটি একটি পশু প্রত্যহ তাঁহার আহারজন্য উপস্থিত হইবে। এ স্থলে পশুগণ সমাজনিবদ্ধ মনুষ্যের ন্যায় আচরণ করিল, সিংহকর্তৃক বাহুবলের নিত্য প্রয়োগ নিবারণ করিল। মনুষ্য বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতে পারে যে, কোন্ অবস্থায় বাহুবল প্রযুক্ত হইবার সম্ভাবনা। এবং সামাজিক শৃঙ্খলের দ্বারা তাহার নিবারণ করিতে পারে। রাজা মাত্রই বাহুবলে রাজা, কিন্তু নিত্য বাহুবল প্রয়োগের দ্বারা তাঁহাদিগকে প্রজাপীড়ন করিতে হয় না। প্রজাগণ দেখিতে পায় যে, এই এক লক্ষ সৈনিক পুরুষ রাজার আজ্ঞাধীন; রাজাজ্ঞার বিরোধ তাহাদের কেবল ধ্বংসের কারণ হইবে। অতএব প্রজা বাহুবল-প্রয়োগ সম্ভাবনা দেখিয়া, রাজাজ্ঞাবিরোধী হয় না। বাহুবলও প্রযুক্ত হয় না। অথচ বাহুবল প্রয়োগের যে উদ্দেশ্য তাহা সিদ্ধ হয়। এ দিকে এই এক লক্ষ সৈন্য যে রাজার আজ্ঞাধীন, তাহারও কারণ প্রজার অর্থ অথবা অনুগ্রহ। প্রজার অর্থ যে রাজার কোষগত বা প্রজার অনুগ্রহ যে তাঁহার হস্তগত, সেটুকু সামাজিক নিয়মের ফল। অতএব এ স্থলে বাহুবল যে প্রযুক্ত হইল না, তাহার মধ্যে কারণ মনুষ্যের দূরদৃষ্টি, গৌণ কারণ সমাজবন্ধন।

আমরা এ প্রবন্ধে গৌণ কারণটি ছাড়িয়া দিলেও দিতে পারি। সামাজিক অত্যাচার যে যে বলে নিরাকৃত হয়, তাহার আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত। সমাজনিবদ্ধ না হইলে সামাজিক অত্যাচারের অস্তিত্ব নাই। সমাজবন্ধন সকল সামাজিক অবস্থার নিত্য কারণ। যাহা নিত্য কারণ, বিকৃতির কারণানুসন্ধানে তাহা ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে।

ইহা বুঝিতে পারা গিয়াছে যে, এইরূপ করিলে আমাদিগের শাসনের জন্য বাহুবল প্রযুক্ত হইবে—এই বিশ্বাসই বাহুবল প্রয়োগ নিবারণের মূল। কিন্তু মনুষ্যের দূর-দৃষ্টি সকল সময়ে সমান নহে—সকল সময়ে বাহুবল প্রয়োগের আশঙ্কা করে না। অনেক সময়েই যাঁহারা সমাজের মধ্যে তীক্ষ্ণদৃষ্টি, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন যে, এই এই অবস্থায় বাহুবল প্রয়োগের সম্ভাবনা। তাঁহারা অন্যকে সেই অবস্থা বুঝাইয়া দেন। লোকে তাহাতে বুঝে। বুঝে যে, যদি আমরা এই সময়ে কর্তব্য সাধন না করি, তবে আমাদিগের উপর বাহুবল প্রয়োগের সম্ভাবনা। বুঝে যে, বাহুবল প্রয়োগে কতকগুলি অশুভ ফলের সম্ভাবনা। সেই-সকল অশুভ ফল আশঙ্কা করিয়া যাহারা বিপরীত পথগামী, তাহারা গন্তব্য পথে গমন করে।

অতএব যখন সমাজের এক ভাগ অপর ভাগকে পীড়িত করে, তখন সেই পীড়ন নিবারণের দুইটি উপায়। প্রথম, বাহুবল প্রয়োগ। যখন রাজা প্রজাকে উৎপীড়ন করিয়া সহজে নিরস্ত হয়েন না, তখন প্রজা বাহুবল প্রয়োগ করে। কখনও কখনও রাজাকে যদি কেহ বুঝাইতে পারে যে, এইরূপ উৎপীড়নে প্রজাগণ-কর্তৃক বাহুবল প্রয়োগের আশঙ্কা, তবে রাজা অত্যাচার হইতে নিরস্ত হয়েন।

ইংলন্ডের প্রথম চার্ল্স্ যে প্রজাগণের বাহুবলে শাসিত হইয়াছিলেন, তাহা সকলে অবগত আছেন। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় জেম্স্, বাহুবল প্রয়োগের উদ্যম দেখিয়াই দেশ পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু এরূপ বাহুবল প্রয়োগের প্রয়োজন সচরাচর ঘটে না। বাহুবলের আশঙ্কাই যথেষ্ট। অসীম প্রতাপশালী ভারতীয় ইংরেজগণ যদি বুঝেন যে, কোনো কার্যে প্রজাগণ অসন্তুষ্ট হইবে, তবে সে কার্যে হস্তক্ষেপ করেন না। ১৮৫৭/৫৮ সালে দেখা গিয়াছে, ভারতীয় প্রজাগণ বাহুবলে তাঁহাদিগের সমকক্ষ নহে। তথাপি প্রজার সঙ্গে বাহুবলের পরীক্ষা সুখদায়ক নহে। অতএব তাঁহারা বাহুবল প্রয়োগের আশঙ্কা দেখিলে বাঞ্ছিত পথে গতি করেন না।

অতএব কেবল ভাবী ফল বুঝাইতে পারিলেই, বিনা প্রয়োগে বাহুবলের কার্য সিদ্ধ হয়। এই প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি-দায়িনী শক্তি আর একটি দ্বিতীয় বল। কথায় বুঝাইতে হয়। এইজন্য আমি ইহাকে বাক্যবল নাম দিয়াছি।

এই বাক্যবল অতিশয় আদরণীয় পদার্থ। বাহুবল মনুষ্যসংহার প্রভৃতি বিবিধ অনিষ্ট সাধন করে, কিন্তু বাক্যবল বিনা রক্তপাতে, বিনা অস্ত্রাঘাতে, বাহুবলের কার্য সিদ্ধ করে। অতএব এই বাক্যবল কি, এবং তাহার প্রয়োগ লক্ষণ ও বিধান কি প্রকার, তাহা বিশেষ প্রকারে সমালোচিত হওয়া কর্তব্য। বিশেষতঃ এতদ্দেশে। অস্মদ্দেশে বাহুবল প্রয়োগের কোনো সম্ভাবনা নাই—বর্তমান অবস্থায় অকর্তব্যও বটে। সামাজিক অত্যাচার নিবারণে বাক্যবল একমাত্র উপায়। অতএব বাক্যবলের বিশেষ প্রকারে উন্নতির প্রয়োজন।

বস্তুতঃ বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবল সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ। এ পর্যন্ত বাহুবলে পৃথিবীর কেবল অবনতিই সাধন করিয়াছে—যাহা কিছু উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা বাক্যবলে। সভ্যতার যাহা কিছু উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা বাক্যবলে। সমাজনীতি রাজনীতি ধর্মনীতি সাহিত্য বিজ্ঞান শিল্প—যাহারই উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা বাক্যবলে। যিনি বক্তা, যিনি কবি, যিনি লেখক—দার্শনিক বৈজ্ঞানিক নীতিবেত্তা ধর্মবেত্তা ব্যবস্থাবেত্তা সকলেই বাক্যবলেই বলী।

ইহা কেহ মনে না করেন যে, কেবল বাহুবলের প্রয়োগ নিবারণই বাক্যবলের পরিণাম বা তদর্থেই বাক্যবল প্রযুক্ত হয়। মনুষ্য কতক দূর পশুচরিত্র পরিত্যাগ করিয়া উন্নতাবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। অনেক সময়ে মনুষ্য ভয়ে ভীত না হইয়াও, সৎ-

কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত। যদি সমগ্র সমাজের কখনও এক কালে কোনো বিশেষ সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে, তবে সে সৎকার্য অবশ্য অনুষ্ঠিত হয়। এই সৎপথে জনসাধারণের প্রবৃত্তি কখনও কখনও জ্ঞানীর উপদেশ ব্যতীত ঘটে না। সাধারণ মনুষ্যগণ অজ্ঞ, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে শিক্ষা দেন। সেই শিক্ষাদায়িনী উপদেশমালা যদি যথাবিহিত বলশালিনী হয়, তবেই তাহা সমাজের হৃদয়ঙ্গতা হয়। যাহা সমাজের একবার হৃদ্‌গত হয়, সমাজ আর তাহা ছাড়ে না—তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। উপদেশবাক্য-বলে আলোড়িত সমাজ বিপ্লুত হইয়া উঠে। বাক্যবলে এইরূপ যাদৃশ সামাজিক ইষ্ট সাধিত হয়, বাহুবলে তাদৃশ কখনও ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

মুসা, ইসা, শাক্যসিংহ প্রভৃতি বাহুবলে বলী নহেন—বাক্যবীর মাত্র। কিন্তু ইসা, শাক্যসিংহ প্রভৃতি দ্বারা পৃথিবীর যে ইষ্ট সাধিত হইয়াছে, বাহুবলবীরগণ-কর্তৃক তাহার শতাংশ নহে। বাহুবলে যে কখনও কোনো সমাজের ইষ্ট সাধন হয় না, এমত নহে। আত্মরক্ষার জন্য বাহুবলই শ্রেষ্ঠ। আমেরিকায় প্রধান উন্নতিসাধনকর্তা বাহু-বলবীর ওয়াশিংটন। হলন্ড বেলজিয়ামের প্রধান উন্নতিসাধনকর্তা বাহুবলবীর অরেঞ্জের উইলিয়ম। ভারতবর্ষের আধুনিক দুর্গতির প্রধান কারণ—বাহুবলের অভাব। কিন্তু মোটের উপর দেখিতে গেলে, দেখা যাইবে যে, বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবলেই জগতের ইষ্ট সাধিত হইয়াছ। বাহুবল পশুর বল—বাক্যবল মনুষ্যের বল। কিন্তু কতকগুলা বকিতে পারিলে বাক্যবল হয় না। বাক্যের বলকে আমি বাক্যবল বলিতেছি না। বাক্যে যাহা ব্যক্ত হয়, তাহারই বলকে বাক্যবল বলিতেছি। চিন্তাশীল চিন্তার দ্বারা জাগতিক তত্ত্বসকল মনোমধ্য হইতে উদ্ভূত করেন—বক্তা তাহা বাক্যে লোকের হৃদয়গত করান। এতদুভয়ের বলের সমবায়কে বাক্যবল বলিতেছি।

অনেক সময়েই এই বল একাধারে নিহিত—কখনও কখনও বলের আধার পৃথক্‌ভূত। একত্রিত হউক, পৃথক্‌ভূত হউক, উভয়ের সমবায়ই বাক্যবল।

প্রতিভা

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

ভূমণ্ডলে যে-সকল লোক প্রাধান্য লাভ করেন, তাঁহাদিগকে দুই দলে বিভক্ত করা যাইতে পারে। একদল পুরাতন জ্ঞান ও কার্যপ্রণালীতে সুপরিপক্ব, অপর দল নূতন-পথদর্শী। একদল অন্যনির্দিষ্ট কর্মে বিলক্ষণ দক্ষতা দেখাইতে পারেন, অপর দল ভাঙিয়া-চুরিয়া নূতন গড়িতে বা অভিনবপ্রকার সৃষ্টি বা আবিষ্কার করিতে পারেন। প্রথমোক্তদিগকে দক্ষ বা পারদর্শী এবং শেষোক্তদিগকে প্রতিভাশালী বলা যায়।

কেহ কেহ অন্যনির্মিত কল দেখিয়া তদনুরূপ গড়িতে পারেন, অন্যাবিষ্কৃত তত্ত্ব স্মরণ রাখিতে পারেন, বা অন্যোদ্ভাবিত ভাবে অলংকৃত হইতে পারেন। কিন্তু নূতন কল-নির্মাণ, নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার বা নূতন ভাবের উদ্ভাবন, তাঁহাদিগের শক্তিসাধ্য নহে। এরূপ লোক কার্যক্ষম, বিজ্ঞানবিদ্ বা পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। তাঁহাদিগকে দক্ষ বা পারদর্শী বলা যাইবে, কিন্তু প্রতিভাশালী বলা যাইবে না। তাঁহারা ভগবানের পালনশক্তি পাইয়াছেন, কিন্তু বিধাতার সৃষ্টিশক্তিতে বঞ্চিত রহিয়াছেন। আদ্যন্ত রামায়ণ যাঁহার কণ্ঠস্থ, এবং কথাবার্তায় ও লিখন-পঠনে যিনি রামায়ণের শ্লোক উদ্‌ধৃত করিতে পারেন, তিনি যত কেন ক্ষমতাপন্ন হউন-না, তাঁহার ঈদৃশী দক্ষতা আদিকবি বাল্মীকির নূতন-ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টি-কারিণী প্রতিভা হইতে কত বিভিন্ন।

পূর্বকালে প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ দেবানুগৃহীত বলিয়া গণ্য হইতেন। তখন লোকের এরূপ বিশ্বাস ছিল যে, প্রতিভা শিক্ষানিরপেক্ষ দেবদত্ত শক্তি। এই প্রত্যয়ের সাহায্যে অন্ধকারময় অতীতকাল ভেদ করিতে গিয়া রঙ্গময়ী কল্পনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, দুরাচার জ্ঞানহীন দস্যু রত্নাকর ব্রহ্মার বরে ভাবরত্নাকর বাল্মীকি। এই বিশ্বাসের বলেই জনশ্রুতি প্রচার করিয়াছেন যে, শকুন্তলাপ্রণেতা কালিদাস মহামূর্খ ছিলেন, পরে বিদ্যাবতী রমণীর পদাঘাতে অভিমানে কাননে প্রবেশ করিয়া সরস্বতীর প্রসাদে সর্ববিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতচূড়ামণি হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন।

কেবল ভারতবর্ষে নহে, অন্যান্য দেশেও ঈদৃশী কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। ইংলন্ডীয় পুরাবিদ্ বিডি সাহেব বলেন যে, প্রসিদ্ধ সাক্সন্ কবি সিড্‌মন্ প্রথমে এমন সঙ্গীতরসাস্বাদবিহীন ছিলেন যে, গান শুনিলেই বিরক্ত হইয়া উঠিয়া যাইতেন, পরে স্বপ্নাদেশবশতঃ তাঁহার অত্যাশ্চর্য গীতিশক্তি জন্মে। যদিও ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এ প্রকার আকস্মিক দৈবশক্তির আবির্ভাব অপ্রামাণ্য ও অনৈসর্গিক, তথাপি প্রতিভা যে দেবদত্ত, এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়।

সৃষ্টিকর্তা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি দিয়াছেন। একদল হয়তো গণিত বুঝিতে পারিবে না, সাহিত্যরসপান করিতে পারিবে। অপর কেহ বা সাত-কাণ্ড রামায়ণ শুনিয়া অম্লানমুখে বলিবে, "ইহাতে তো কিছুরই উপপত্তি হইল না।" কেহ হয়তো একখানি চিত্র দেখিয়া মোহিত হইবে, সংগীতের মনোহর তান বিরক্তিকর ভাবিবে। কেহ বা সুরম্য চিত্রপট অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিয়া গীতসাগরে নিমগ্ন হইবে। কেহ প্রফুল্ল কুসুমোদ্যান পরিত্যাগ করিয়া বিজন বন্য শৈলময় প্রদেশ ভালোবাসিবে; কেহ বা তরুলতাশূন্য বন্ধুর গিরি কষ্টকর বোধ করিয়া প্রসূনপরিপূরিত বল্লরী-পল্লববিভূষিত নিকুঞ্জে মনস্তুষ্টিসাধনার্থ আশ্রয় লইবে। কেহ চিন্তাশীল, কার্যে অপটু; কেহ বা কার্যদক্ষ, চিন্তায় অপটু। এইরূপ স্বাভাবিক শক্তিভেদ যে প্রতিভার মূল, তাহাতে সন্দেহ নাই। নতুবা, আমি, তুমি, সকলেই কালিদাস বা আর্যভট্ট, সেক্সপিয়র বা নিউটন হইতে পারিতাম।

প্রতিভা যদিও আমাদিগের মতে স্বাভাবিক শক্তি, তথাপি আমরা এরূপ বলি না যে, ইহা শিক্ষানিরপেক্ষ। যদি কেহ আপনাকে প্রতিভাশালী মনে করেন, তিনি যেন স্বপ্নেও ভাবেন না, 'আমি শিক্ষাব্যতিরেকেই বড়োলোক হইব।' সকলপ্রকার উন্নতিই পরিশ্রমসাপেক্ষ।

যত্নশীলই রত্নলাভে অধিকারী। সেক্সপিয়র 'কল্পনার পুত্র' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। যাঁহাকে লোকে অনেক অনেক দিন ধরিয়া অশিক্ষিত ভাবিয়া আসিয়াছে, তাঁহার নাটকনিচয় পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায় যে, তিনি তৎকালিক অনেক ইংরেজি গ্রন্থ পাঠ ও বহুবিধ নাটকের অভিনয় দর্শন করিয়াছিলেন এবং আইনে ও লাটিন ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। যে কালিদাস 'সরস্বতীর বরপুত্র', তিনিও অধ্যয়নশূন্য ছিলেন না। তিনি রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণাদি পড়িয়াছিলেন, ইহা বলা বাহুল্য। কালিদাস অন্যান্য শাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। অতএব কালিদাস যে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যদি কালিদাস ও সেক্সপিয়র অশিক্ষিত না হইলেন, তবে আমরা একপ্রকার ধরিয়া লইতে পারি যে, শিক্ষা-ব্যতিরেকে কেহই বড়োলোক হইতে পারে না। শিক্ষার স্থল অনেক—বিদ্যালয়, গ্রন্থ, মনুষ্যসমাজ, বাহ্যজগৎ। ইহাদের মধ্যে কেহ একটি কেহ অপরটি হইতে বিশেষ সাহায্য পান। কিন্তু যত্নপূর্বক অধ্যয়ন না করিলে কোনোটি হইতে পর্যাপ্ত উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

অপর পক্ষে, কেহ কেহ বা শিক্ষার অমৃতময় ফল সন্দর্শন করিয়া এমন মোহিত হন যে, তাঁহারা প্রতিভাকে স্বাভাবিক শক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহাদিগের মতে প্রতিভা অভ্যাস বা মনোযোগ মাত্র। তাঁহারা বলেন যে, 'যে কার্য কোনো ব্যক্তি বারংবার করে, বা যে বিষয়ে অধিক মনোযোগ দেয়, তাহাতেই তাহার

একপ্রকার বিশেষ ক্ষমতা জন্মে—উহাকেই প্রতিভা কহে; বাস্তবিক, সৃষ্টিকর্তা যে কাহারও প্রতি পক্ষপাতী হইয়া তাহাকে অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন করিয়াছেন ইহা সম্ভব নহে।'

এক্ষণে দেখা যাউক, প্রতিভা অভ্যাস মাত্র—এই মতটি কতদূর সুসংগত। যদি আমি তুমি কবিতা লিখিতে অভ্যাস করি, তাহা হইলে কি কালিদাস হইতে পারিব? অনেক পদ্যলেখক আছেন যাঁহারা ছন্দোগ্রন্থনে পাণ্ডিত্য দেখাইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কয়জন কবি? ভট্টিকার বৈয়াকরণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারেন, কিন্তু কে তাঁহাকে রঘুবংশরচয়িতার সহিত তুলনা করিবে? তিনি বিলক্ষণ পদ্য লিখিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কবিত্ব কতদূর প্রকাশ পাইয়াছে?

অভ্যাসের প্রকৃতি বিবেচনা করিলে এ বিষয়ের মীমাংসা সহজ হইবে। অভ্যাস কার্যসমষ্টিজাত। একটি কার্য বারংবার সম্পাদন করিলে তৎসম্পাদন পূর্বাপেক্ষা অল্পায়াসসাধ্য হয় এবং তৎপক্ষে প্রবল প্রবৃত্তি ও দক্ষতা জন্মে। যে বারংবার অনুষ্টুপ্ লিখে, সে সহজে অনুষ্টুপ্ লিখিতে পারিবে, কিন্তু বাল্মীকি হইতে পারিবে না।

অভ্যস্ত বিদ্যা পুরাতনাতিরিক্ত হইতে পারে না। লোকে যাহা করিয়াছে, অভ্যাস-দ্বারা তাহাতেই পারদর্শী হওয়া যায়। কিন্তু যে 'নূতন সৃষ্টি' প্রতিভার অন্তরাত্মা-স্বরূপ তাহা অভ্যাস কোথা পাইবে? আমি ভাস্করাচার্যের সিদ্ধান্তশিরোমণি বা নিউটনের প্রিন্সিপিয়া অভ্যাস করিতে পারি; কিন্তু তাদৃশ অভ্যাস-দ্বারা তাঁহাদিগের নিরূপিত তত্ত্বগুলিই জানিতে পারিব, অভিনব তত্ত্বের আবিষ্কার করিতে পারিব না।

যাঁহারা বিবেচনা করেন প্রতিভা মনোযোগমাত্র, তাঁহাদিগেরও বিষয় ভ্রম। যে বিষয়ে যে পরিমাণে মনোনিবেশ করা যায়, সে বিষয়ের সেই পরিমাণে স্মরণ থাকে। কিন্তু স্মরণ-দ্বারা পূর্বপরিচিত তত্ত্বের পুনরুদ্ধার হয়, নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার হয় না। সুতরাং প্রতিভার যেটি প্রধান লক্ষণ, মনোযোগে সেটি নাই। কাজে কাজেই প্রতিভাকে মনোযোগমাত্র বলা যাইতে পারে না।

যদিও মনোযোগ বা অভ্যাস প্রতিভার অঙ্গস্বরূপ নহে, তথাপি তাহারা প্রয়োজনীয় সহকারী। যিনি কোনো বিষয়ে নূতন তত্ত্ব প্রকাশ করিতে চাহেন, তাঁহার তদ্‌বিষয়ক পুরাতন তত্ত্বগুলি জানা আবশ্যক। পুরাতন-তত্ত্ব-সংগ্রহের জন্য মনোযোগ ও অভ্যাসের প্রয়োজন। এইরূপ পুরাতন-তত্ত্ব-সংগ্রহই শিক্ষার উদ্দেশ্য। এইজন্যই আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, প্রতিভা শিক্ষানিরপেক্ষ নহে। কিন্তু যাঁহারা ঈদৃশ শিক্ষাতেই সন্তুষ্ট থাকেন তাঁহারা প্রাচীন বিদ্যায় পারদর্শী; প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের ন্যায় তাঁহাদিগের অভিনব তত্ত্বমন্দিরে প্রবেশের অধিকার নাই।

আশ্বিনের ঝড়

শিবনাথ শাস্ত্রী

এখন নিজের জীবন-বিবরণ আবার বলি। চৌধুরী মহাশয়দিগের ভবনে অবস্থানকালে ১৮৬৪ সালের আশ্বিন মাসে মহা ঝড় ঘটে। সেই ঘটনা স্মৃতিতে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত রহিয়াছে। সেটা পূজার ছুটির সময়, বোধ হয় পঞ্চমী কি ষষ্ঠীর দিন। অনেকে পূজার সময় কলিকাতা হইতে বাড়ি যাইতেছিল, সুতরাং পথে ঝড়ে পড়িতে হয়। আমার স্বগ্রামের একটি যুবক ও আমি দুইজনে ঝড়ের পূর্ব দিন শালতি করিয়া কালীঘাট হইতে বাসগ্রামের অভিমুখে যাত্রা করি। সেদিন সন্ধ্যা হইতেই আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া জোরে বায়ু বহিতে আরম্ভ হয় ও বৃষ্টি নামে। সেই বায়ু ও বৃষ্টিতে আমরা কোনো প্রকারে শালতিতে বসিয়া রাত্রি কাটাইলাম। শয়নের সুখ আর হইল না। পরদিন প্রত্যূষে যখন মেঘের অন্তরালে ঊষার আলোক দেখা দিল, তখন দেখিলাম, আমাদের শালতি মগরাহাট নামক স্থানের উত্তরে জালাসি নামক দ্বীপগ্রামের কিঞ্চিৎ উত্তরে, বিশাল জলা ও ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে, ঝড় ও তরঙ্গের আঘাতে আন্দোলিত হইতেছে। বায়ুর বেগ এত অধিক যে সম্মুখ দিকে এক পা অগ্রসর হওয়া কঠিন। কোনো প্রকারে শালতির চালকদ্বয় জালাসি গ্রামের বাজারের ধারে গিয়া শালতি লাগাইল। আমরা লাফাইয়া তীরে উঠিলাম এবং একটি দোকানে গিয়া আশ্রয় লইলাম। দেখিলাম, আমাদের ন্যায় আরও কয়েকজন শালতির যাত্রী নানা স্থান হইতে আসিয়া সেখানে আশ্রয় লইয়াছে। তখনো কাহারও মনে হয় নাই যে ঝড় অবিলম্বে ভীষণ সাইক্লোনের আকার ধারণ করিবে। সকলে পরামর্শ হইতে লাগিল যে, সকলে মিলিয়া খিচুড়ি রাঁধিয়া খাওয়া যাক। যাত্রীদের মধ্যে দুইজন ব্রাহ্মণ এই কার্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। বলিলেন, দুইজনের জন্য রাঁধাও যা, দশজনের জন্য রাঁধাও তা। আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে সেই দুর্যোগের দিনে খিচুড়ি খাইতে পাইব বলিয়া আনন্দিত হইতে লাগিলাম। কিন্তু দেবতা আর এক প্রকার বন্দোবস্ত করিলেন।

খিচুড়ির পরামর্শ শেষ হইতে না হইতে দোকানদারের সহিত চাউল-দাউলের মূল্য নির্ধারণ হইতে না হইতে, হু-হু করিয়া সাইক্লোনের বায়ু ডাকিয়া আসিল। আমাদের চক্ষের সমক্ষে কয়েকখানি চালা-ঘর পড়িয়া গেল। অবশেষে যে দোকানে আমরা বসিয়াছিলাম, সে ঘর কাঁপিতে লাগিল। আমরা বিপদ গণনা করিয়া কোমর বাঁধিতে লাগিলাম। তখনো দেখি যাত্রীদের মধ্যে এক ব্যক্তি তুড়ি দিয়া মন-আনন্দে 'বৃন্দাবন-বিলাসিনী রাই আমাদের' ইত্যাদি কীর্তনটি গাইতেছেন। তাঁহাকে বলা গেল, "মশাই, গান রাখুন, কোমর বাঁধুন, এ-ঘর যে পড়ে।" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "রেখে দাও ঘড় পড়া, গাইতে

বড়ো ভালো লাগছে; শোনো শোনো কীর্তনটা শোনো।" আর শোনো! চড়চড় করিয়া ঘর হেলিতে লাগিল, আমরা দৌড়িয়া বাহিরে গেলাম, সে ভদ্রলোকটি চাপা পড়িলেন। যেই ঘরের বাহির হওয়া, অমনি আমাদিগকে ঝড়ে উড়াইয়া কোথায় লইয়া গেল! সৌভাগ্যক্রমে আমার স্বগ্রামবাসী সেই যুবক বন্ধুটির সহিত আমি হাতে হাত বাঁধিয়াছিলাম, আমাদের দুইজনকে অধিক দূরে লইয়া যাইতে পারিল না। একখানা দোকানঘর পড়িয়া গিয়া তাহার দুখানা চাল মাটিতে পড়িয়া দাঁড়াইয়া ছিল, আমরা দুজনে গিয়া তাহার উপরে পড়িলাম। পড়িয়া ভাঙা ঘরের খুঁটি ধরিয়া ঝড় ভোগ করিতে ও থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখি, সেই কীর্তনকারী ভদ্রলোকটি পূর্বকার দোকানঘরের চাল ফুঁড়িয়া উপরে উঠিতেছেন। আমাদিগকে অদূরে দেখিয়াই তিনি হাসিতে লাগিলেন, এবং অতি কষ্টে আমাদিগের নিকট আসিয়া হাসিয়া বলিলেন, "বড়ো পিতৃপুণ্যে বেঁচে গেছি। আপনারা বোধ হয় ভাবছিলেন মারা পড়েছি। আরও কিছুদিন কর্মভোগ বাকি আছে কিনা, এখন কেন যাব?" বলিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই হাসি আমার আজও মনে আছে। কতবার ভাবিয়াছি, এরূপ সুখে দুঃখে প্রসন্ন চিত্ত পাওয়া বড়ো সৌভাগ্যের বিষয়। কতকগুলি মানুষ এরূপ আছে, যাহাদিগকে কিছুতেই বিষণ্ন করিতে পারে না। ইহাদের অবস্থা স্পৃহণীয়।

কিয়ৎক্ষণ তিনজনে ঝড় ভোগ করিয়া পরামর্শ করা গেল যে, অদূরে রানী রাসমণির কাছারি-বাড়ি দেখা যাইতেছে—সে গ্রামটা তাঁহারই জমিদারি—সেই কাছারিতে গিয়া আশ্রয় লওয়া যাউক। তিনজনে হাত ধরাধরি করিয়া বাহির হইলাম। কাছারি-বাড়ির নিকটস্থ হইতে না হইতে সমগ্র বাড়ি ভূমিসাৎ হইল। চারি দিকের প্রাচীর পর্যন্ত ধরাশায়ী হইয়া সমভূম হইয়া গেল।

তখন বাত্যার প্রকোপ দুর্দান্ত দৈত্যের বিক্রমের ন্যায় হইয়াছে। গ্রামের প্রায় একখানিও গৃহ দণ্ডায়মান নাই, সমুদয় সমভূম হইয়াছে। চারি দিকে চাহিতে চাহিতে অদূরে একখানি গৃহ তখনো দণ্ডায়মান দৃষ্ট হইল। স্থির করা গেল যে, সেখানে গিয়া আশ্রয় লওয়া যাউক। গিয়া দেখি সেই গ্রামের স্ত্রীলোক বালক-বালিকাতে সে ঘর পরিপূর্ণ। ঘরখানি নূতন ছিল বলিয়া তখনো দণ্ডায়মান আছে। সেই গৃহস্বামী অতি বৃদ্ধ। তাহার যুবক পুত্র বৃদ্ধ পিতামাতাকে তাড়াতাড়ি খাওয়াইয়া, ঘরের ভিতরে পুরিয়া, বীরের ন্যায় কোমর বাঁধিয়াছে, এবং সেই ঝড়ে ছুটাছুটি করিয়া চারি দিকের স্ত্রীলোক বালক-বালিকা সংগ্রহ করিয়া সেই ঘরে পুরিতেছে। আমরা ঘরের নিকটে পৌঁছিয়া দেখি স্ত্রীলোকে ঘর পরিপূর্ণ। আমাদের সঙ্গের ভদ্রলোকটি ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন, আমাদের দুই বন্ধুর কিরূপ সংকোচ বোধ হইতে লাগিল। আমরা দ্বার হইতে ফিরিয়া পার্শ্বের দাবাতে গিয়া দাঁড়াইলাম। তৎক্ষণাৎ সে দাবার চালটি

আমাদের মাথার উপরে পড়িয়া গেল। তখন আমরা ভাবিলাম যে, এরূপ ঘর চাপা পড়িয়া মরা অপেক্ষা বাহিরের উঠানে বসিয়া ঝড় খাওয়া ভালো। এই ভাবিয়া বাহিরে যাইতেছি, এমন সময় গৃহের ভিতর হইতে এক বৃদ্ধা রমণীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "বাবা, তোমরা কোথায় যাও? এত লোকের যদি জায়গা হয়ে থাকে, তোমাদের দুজনেরও হবে।" তখন আমরা বাধ্য হইয়া গৃহের ভিতরে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়া স্ত্রীলোক বালক-বালিকার ক্রন্দনের ধ্বনি শুনিয়া মনে হইতে লাগিল, সেখানে না ঢুকিলেই ভালো ছিল। ক্রমে বেলা অবসান হইল। অপরাহ্ণ চারিটার পর ঝড়ের বেগ কমিয়া আসিতে লাগিল। গ্রামস্থ যাহারা সেই গৃহে আশ্রয় লইয়াছিল তাহারা 'বাবা রে, মা রে' করিতে করিতে স্বীয়-স্বীয় ভবনের উদ্দেশে যাত্রা করিল। আমাদের শালতির চালক দুইজন আমাদের বিছানা ও কিছু-কিছু জিনিসপত্র মাথায় করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, শালতি খাল হইতে লইয়া এক পুকুরের ধারে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, দড়ি ছিঁড়িয়া পুকুরের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে। তখন আর উদ্ধার করিবার সময় নাই, সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়। তাহাদিগকে সেই ভাঙা দাবাতে কোনো প্রকারে রাত্রি যাপন করিতে বলিয়া আমরা সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের ভাঙা ঘরে রাত্রি যাপন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইল। সেই গৃহের বৃদ্ধ-বৃদ্ধার বীর প্রকৃতিসম্পন্ন যুবক পুত্র সমস্ত দিনের অনাহার ও গুরুতর শ্রমের পর ক্লান্ত হইয়া আসিয়া ঘরের মধ্যে পড়িল। পিতামাতা ব্যাকুল হইয়া অনুরোধ করিতে লাগিল, "ওরে, তুই মুখ হাত ধুয়ে, ওই চৌকির নীচে তোর ভাত আছে, খা।" তখন আমরা সেই ঘরে নয়জন, আমরা বিদেশীয় পাঁচজন, ও বুড়ো বুড়ি যুবক পুত্র ও গর্ভিণী পুত্রবধূ এই চারিজন। পিতা-মাতার অনুরোধ ও ব্যগ্রতা দেখিয়া যুবকটি বলিল, "বাবুরা সমস্ত দিন অনাহারে আছেন, ও'রা ঘরে বসে থাকবেন আর আমি খাব, তা কি হয়?" কোনোরূপেই সে খাইবে না। ইহাতে আমরা বাহিরের লোক চটিয়া উঠিলাম, বলিলাম, "সে কি কথা! এই বিপদে কি কেউ আতিথ্য করতে পারে? তুমি সমস্ত দিন ছুটাছুটি করেছ, তুমি ঐ ভাত খাও, কিছুই অন্যায় হবে না।" সে তাহা শুনিল না, বসিয়া রহিল। শেষে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা, তোমাদের ঘরে আমাদের খাবার মতো কিছু আছে কি না?" যুবক কহিল, "চাউল আছে, তা ভিজে গিয়েছে।" উত্তর, "আচ্ছা, ভিজা চাউল আমাদিগকে দাও।" সেই ভিজা চাউল লইয়া আমি সকলকে দিলাম, বলিলাম, "ভালো লাগুক না লাগুক আপনারা খান, তা না হলে ও-ব্যক্তি খাবে না।" আমরা ভিজা চাউল খাইতে প্রবৃত্ত হইলাম। হঠাৎ মনে হইল, শালতিতে এক হাঁড়ি মাষকলাই বাড়ির জন্য লইয়া যাইতেছিলাম, সমস্ত দিন ভিজিয়া তাহাতে কল বাহির হইয়াছে। আমি সেই ভিজা কলাই আনিয়া সকলকে চাউলের সঙ্গে খাইতে দিলাম। আমাদের

আহারটা বড়ো মন্দ হইল না। তৎপরে শয়নের ব্যাপার। সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে যতগুলি লেপ-কাঁথা-মাদুর ছিল, সমুদয় সমাগত কম্পান্বিত বালকবালিকাদিগকে চাপা দিবার জন্য দিয়াছিল, তাহাতে সে সমুদয় ভিজিয়া গিয়াছে, কেবল দুইটি সেঁতলা মাদুর তখনো শুকনো আছে। গৃহস্বামীর পুত্র প্রস্তাব করিল যে, তাহার একটিতে তাহারা সপরিবারে শয়ন করিবে, আর একটিতে আমরা পাঁচজন শয়ন করিব। আমার সঙ্গের লোকেরা তাহাতে সম্মত হইয়া আদরের সহিত মাদুরটি লইলেন, তাহা লইয়া তাঁহাদের সঙ্গে আমার ঝগড়া হইল। আমি বলিতে লাগিলাম, "ছি ছি! ও মাদুর নেবেন না, ওরা মাদুরে শুক।" এই প্রস্তাবে সঙ্গের পথিকেরা হাসিতে লাগিলেন, "আমরা পাঁচজনে এক মাদুরে শুই, ওরা চারজনে আর এক মাদুরে শুক। এ বিপদে আর ভদ্রতা করবার সময় নাই।" এই কথাতে আমি রাগ করিয়া মাদুরের বাহিরে কাদাতে শুইয়া অগাধ নিদ্রা দিলাম।

পরদিন প্রাতে যখন চক্ষু খুলিলাম, তখন দেখি বেশ রোদ উঠিয়াছে। আমার অগ্রেই আর সকলে জাগিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিতেছিলেন। আমি বাহিরে গিয়া দেখি, বৃদ্ধ-বৃদ্ধার যুবক পুত্রটি আমাদের শালতির চালকদ্বয়ের সঙ্গে পুকুরে ডুবিয়া ডুবিয়া শালতিখানি তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। দেখিয়া, তাহাকে ও প্রকার জলে ডুবিতে বারণ করিলাম, কিন্তু সে সে-কথার প্রতি কর্ণপাত করিল না। ক্রমে তিনজনে শালতিখানি তুলিল। চালকদ্বয় তাহার জল ছেঁচিয়া পরিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইল, ব্রাহ্মণ যুবক কুলীর ন্যায় মাথায় করিয়া আমাদের জিনিসপত্র বহন করিতে প্রবৃত্ত হইল। আমি চাহিয়া দেখি যে, সেই সময়ে পথে পতিত একটা ভগ্ন বোলতার চাকের উপর পা দেওয়ায় তাহার পায়ে অনেকগুলি বোলতা কামড়াইয়াছে, তাহার পা ফুলিয়া উঠিতেছে, তবু সে সেই কাজ করিতেছে। তাহা দেখিয়া তাহার প্রতি কিরূপ কৃতজ্ঞতার উদয় হইল, তাহা আর ভাষায় বর্ণন করিবার নহে।

সমুদ্রপথে ১৭৪২

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

ক্রমে ডিঙাগুলি গিয়া বালীদ্বীপে পঁহুছিল। সেই জায়গাটাকে বড়ো আড্ডা করিয়া বিহারী সমস্ত দ্বীপে দ্বীপে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বোর্নিও সব জায়গাই এক-একবার ঘুরিলেন। কর্মচারীদের কাজকর্ম তদারক করিলেন। হিসাব

দেখিলেন। বাহাল-বরখাস্ত করিলেন। দেশের লোকের সঙ্গে ব্যবসায়ের পথ ফলাও করিলেন। এইরূপে চারি পাঁচ মাস থাকিয়া ফিরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এবারে ব্যবসায়ে অনেক লাভ হইল; কারণ, যে-সব জিনিস সঙ্গে আনিয়াছিলেন সবই বিকাইয়া গিয়াছে। তাহার বদলে যাহা পাইয়াছেন, তত ভালো জিনিস, আর তত বেশি জিনিস আর কখনও পান নাই। সুতরাং তিনি খুব খুশি। তাঁহার সংস্কার, মেয়ের পয়েই তাঁহার লাভ বেশি হইয়াছে; সুতরাং মেয়ের উপর তাঁহার ভালোবাসা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। মেয়েও খুব খুশি। বিহারীর সঙ্গে যাহারই কারবার ছিল, সকলেই মেয়েকে খুব আদর করিয়াছে, নানা জিনিস দিয়াছে। রাজারা মেয়েকে কোলে করিয়া তাহাকে খাবার দিয়াছেন, গহনা দিয়াছেন। সে যাহা দেখিতে চাহিয়াছে, সব দেখাইয়াছেন। সব মন্দিরে সে গিয়াছে, সব জায়গায় পূজা দিয়াছে, সময়টা তার খুব সুখেই কাটিয়াছে। তথাপি দেশে ফিরিবার নামে তাহার বড়োই আনন্দ। দেশের এমনি টান! আবার সাতগাঁ যাইবে, আবার পুরানো খেলুড়িদের সঙ্গে খেলা করিবে, গঙ্গায় স্নান করিবে, ঠাকুরদের বাড়ি বাড়ি ঘুরিবে, তাহার ভারি আহ্লাদ।

ক্রমে ক্রমে ঊনপঞ্চাশখানা ডিঙা আসিয়া বালীদ্বীপে জুটিল। যার যা মেরামতের ছিল, মেরামত করা হইল। সব ডিঙা আবার বাঙ্গালার দিকে চলিল।

সব ডিঙা ভাসিল, কেহ বলিল 'জয় কালী', কেহ বলিল 'জয় সাতগাঁয়ের কালী'। কেহ বলিল 'জয় গঙ্গামার জয়', কেহ বলিল 'জয় বরুণদেবের জয়', কেহ বলিল 'জয় সমুদ্রের জয়'। বেশ আমোদে দিন কাটিতে লাগিল। যাবার সময় স্থির সমুদ্রের উপর দিয়া পাল তুলিয়া আসিয়াছে। আসার সময়ও ঠিক সেই ভাব। বিহারীর আনন্দ ধরে না। সে এক-একবার ছইএর উপর উঠিয়া ডিঙা গনিয়া দেখে; সব ডিঙাই চোখের সামনে আছে। মনে মনে লাভালাভ কষে, আর দেখে যে, এত লাভ তাহার অদৃষ্টে আর কখনোই হয় নাই।

কিন্তু সব দিন সমান যায় না। একদিন সকালে উঠিয়া দেখিল, দক্ষিণ-পূর্ব কোণে কালো মিস্‌মিসে একখানা মেঘ উঠিয়াছে। মাঝি বলিল, "দত্তমহাশয়, আজ বড়ো সুবিধা নয়, ঐ যে মেঘখানা দেখিতেছেন ওখানা ভালা নয়। একটু বাদেই ঝড় উঠিবে। আপনারা আপন আপন কামরায় যান, স্থির হইয়া বসিয়া থাকিবেন। বেশি নড়াচড়া করিলে প্রমাদ ঘটিবে জানিবেন।"

বলিতে বলিতে ঝড় উঠিল। প্রথমে বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ, তাহার পর ঝাপ্‌টা, এক এক ঝপ্‌টায় নৌকাগুলা যেন উল্টাইয়া পড়ে। কিন্তু বাঙ্গালার পাটনী মাঝি বড়ো শক্ত মাঝি, হাল চাপিয়া ধরে আর নৌকা ঠিক থাকে। ঝাপ্‌টা আসার পূর্বে মাঝির হুকুমে সব পালগুলি গুটানো ও নামানো হইয়াছিল; সুতরাং পাল-সুদ্ধ নৌকা গুঁজড়াইয়া অতল জলে ডুবিবে, সে ভয় ঘুচিয়া গিয়াছে। ঝড়-ঝাপ্‌টা, ঝড়ের

ধাক্কা, গোঁগোঁয়ানি, এ-সকলের চেয়ে আর-এক ঘোর বিপদ আসিয়া পোঁছিল, সে হইল সমুদ্রের ঢেউ। জোর বাতাসে ঢেউগুলি জোরে জোরে উঠিতে লাগিল। সিকি মাইল, আধ মাইল, এমন-কি এক মাইল লম্বা এক-একটি ঢেউ আসিয়া নৌকায় লাগিতে লাগিল। নৌকা যেন চুরমার হইয়া যাইতে লাগিল। ছইএর উপর দিয়া ঢেউ গিয়া নৌকার ওপারে পড়িতে লাগিল। ঢেউয়ের মাঝখানে নৌকা পড়িলে, চড়ন্দারেরা 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছাড়ে। সকলে ইষ্টদেবতার নাম করে; ভাবে, আর রক্ষা নাই। এক মুহূর্ত পরে আবার ঢেউ সরিয়া গেলে, আবার তাহাদের মনটা একটু সুস্থ হয়। কিন্তু সে সুস্থভাব কতক্ষণ? আবার ঢেউ—আবার ঢেউ। যেন রাশি রাশি, বস্তা বস্তা তুলা—পিঁজা তুলা—সমুদ্রের চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। বাতাসে জল প্রথম ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠে; দশ হাত, কুড়ি হাত, ত্রিশ হাত পর্যন্ত জল ফুলিয়া উঠে; সেই ফুলা জলের মাথায় নৌকাগুলি মোচার খোলার মতো উঠিয়া পড়ে; তাহার পর সেই ফোলা জলের মাথাটা ফাটিয়া ফেনা বাহির হয়। চড়ন্দারেরা মাঝিদের সঙ্গে ঝগড়া করে, 'তোরা আপনার দোষে আমাদের ডুবাইলি দেখিতেছি!' তাহারা মাঝিদের গালি পাড়ে। মাঝিমাল্লারা প্রাণপণে নৌকারক্ষার চেষ্টা করিতেছে। সেই ভয়ানক ঝড়-বৃষ্টির মধ্যেও তাহাদের গলদ্ঘর্ম হইতেছে, নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইতেছে। গালি দিলে তাহারা সহ্য করিবে কেন? তাহারাও গালি পাড়ে।

একজন বলিল, "বেটারা জানিস্, এই সাম্বায় বিহারী দত্ত আছে? সে যদি ডুবে, বাঙ্গালা দেশটা অন্ধকার হইয়া যাইবে।"

তাহারা বলিল, "হাঁ হাঁ জানি; কিন্তু আমাদের নিজের প্রাণটা আমাদের কাছে শত শত বিহারী দত্তের চেয়েও বেশি দরকারী। বিহারী মরিলে, তাহার ধন আছে, দৌলত আছে, তাহার পরিবারদের দেখিবার অনেক লোক হইবে। আমাদের স্ত্রী-পুত্রকে দেখিবার কে আছে বলো দেখি।"

আবার ঢেউ আসিল। সব ঝগড়া-বিবাদ, সব চেঁচামেচি বন্ধ হইয়া গেল। আবার 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক পড়িয়া গেল।

এ দিকে বিহারীর নৌকায় ঢেউ দেখিয়া মেয়েটি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে। তাহার দাঁত-কপাটি লাগিয়াছে। বিহারীরা স্ত্রী-পুরুষে জলের ঝাপ্‌টা দিয়া তাহাকে সুস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু সে কিছুতেই সমুদ্রের গোঁগোঁয়ানি সহিতে পারিতেছে না, আবার মূর্ছিত হইয়া পড়িতেছে। এমন সময় বিহারীর স্ত্রীর গা বমি-বমি করিয়া উঠিল। মাঝিরা একখানা কাঠের সেঁউতি আগাইয়া দিল, বেনেবউ তাহাতে বমি করিতে লাগিলেন, বমি থামে না।

মেয়ের ও স্ত্রীর এই অবস্থা দেখিয়া বিহারী স্থির থাকিতে পারিল না। বার বার

বড়ো মাঝিকে ডাকিতে লাগিল। মাঝি আসে না। সে বলে, "এখন আমি হাল ছাড়িলে রক্ষা থাকিবে না।"

তখন বিহারী পাগলের মতো হইয়া তাহার কাছে গিয়া উপস্থিত। বলিল, "আমার স্ত্রীর এই অবস্থা, আমার মেয়ের এই অবস্থা, আমায় রক্ষা করো।"

মাঝি বলিল, "মশাই, আমি এই ঢেউ থামাইয়া দিতে পারি—কিন্তু তাহাতে আপনার সাত-আট লক্ষ টাকা ক্ষতি হইবে। সহিতে পারিবেন তো বলুন।"

বিহারী বলিল, "আমার যথাসর্বস্ব যায় সেও আচ্ছা, আমার স্ত্রী ও কন্যা যেন প্রাণ পায় ও সুস্থ হয়।"

"আচ্ছা, তবে আপনি ঘরে যান, আমি যাহা জানি, করিয়া ফেলি।" বলিয়া মাঝি আর-একজন মাঝিকে ডাকিয়া কি বলিয়া দিল। সে নৌকার খোলের ভিতর গেল, আর, সমস্ত মাঝি-মাল্লা ডাকিয়া পঞ্চাশটা গর্জন-তেলের পীপা বাহির করিয়া পাটাতনের উপর রাখিল। ঝড় যখন খুব জোরে আসিতেছে, তখন সেই পীপার সমস্ত তেল সমুদ্রের মধ্যে ঢালিয়া দিতে লাগিল। অনেক কষ্টের সংগ্রহ করা তেলের পীপাগুলি এইরূপে নষ্ট করায় বিহারীর মনে একটু কষ্ট হইল বটে, কিন্তু সে কিছুই বলিল না।

তেল যতদূর যাইতে লাগিল, সমুদ্র স্থির হইতে লাগিল। বাতাসের যে জোর, সেই জোরই রহিল, কিন্তু সমুদ্রে আর ঢেউ উঠে না। সমুদ্র দর্পণের মতো স্থির হইল; নৌকা জোরে চলিতে লাগিল, কিন্তু টলে না। বেনেবউ একটু সুস্থ হইল, তাহার বমি থামিয়া গেল। মেয়েও সুস্থ হইল; বেনেরও মনটা ঠাণ্ডা হইল, সে মাঝিকে অনেক টাকা পুরস্কার দিবে স্বীকার করিল। মাঝির উপর তাহার বিশ্বাস খুব বাড়িয়া গেল। ঝড় তখনও সমানে বহিতেছে। মাঝি দত্তমহাশয়কে নিকটে ডাকিয়া পাঠাইল। বেলা তখন দুপুর। বিহারী মাঝির ঘরে বসিয়া দেখিল, তাহার নৌকা স্থির সমুদ্রের উপর দিয়া বেগে উত্তর-পশ্চিম মুখে যাইতেছে। তাহার সব ডিঙাগুলি দূরে দূরে দেখা যাইতেছে। মাঝি বলিল, "ঝড়ে আমাদের বড়োই উপকার করিয়াছে, আমরা এক বেলায় সাত-আট দিনের পথ আসিয়া পড়িয়াছি। আজ সন্ধ্যার পূর্বেই হউক বা একটু পরেই হউক, গঙ্গার মোহানায় গিয়া পৌঁছিব।"

ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে

জগদীশচন্দ্র বসু

আমাদের বাড়ির নিম্নেই গঙ্গা প্রবাহিত। বাল্যকাল হইতেই নদীর সহিত আমার সখ্য জন্মিয়াছিল। বৎসরে এক সময়ে কূলপ্লাবন করিয়া জলস্রোত বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইত; আবার হেমন্তের শেষে ক্ষীণ কলেবর ধারণ করিত। প্রতিদিন জোয়ার-ভাঁটায় বারিপ্রবাহের পরিবর্তন লক্ষ্য করিতাম। নদীকে আমার একটি গতি-পরিবর্তনশীল জীব বলিয়া মনে হইত। সন্ধ্যা হইতেই একাকী নদীতীরে আসিয়া বসিতাম। ছোটো ছোটো তরঙ্গগুলি তীরভূমিতে আছড়াইয়া পড়িয়া কুলুকুলু গীত গাহিয়া অবিশ্রান্ত চলিয়া যাইত। যখন অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া আসিত, এবং বাহিরের কোলাহল একে একে নীরব হইয়া যাইত, তখন নদীর সেই কুলুকুলু ধ্বনির মধ্যে কত কথাই শুনিতে পাইতাম! কখনও মনে হইত, এই যে অজস্র জলধারা প্রতিদিন চলিয়া যাইতেছে, ইহা তো কখনও ফিরে না; তবে এই অনন্ত স্রোত কোথা হইতে আসিতেছে? ইহার কি শেষ নাই? নদীকে জিজ্ঞাসা করিতাম, 'তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?' নদী উত্তর করিত, 'মহাদেবের জটা হইতে।' তখন ভগীরথের গঙ্গা-আনয়ন-বৃত্তান্ত স্মৃতিপটে উদিত হইত। তাহার পর, বড়ো হইয়া নদীর উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক ব্যাখ্যা শুনিয়াছি; কিন্তু যখনই শ্রান্তমনে নদীতীরে বসিয়াছি তখনই সেই চিরাভ্যস্ত কুলু-কুলু ধ্বনির মধ্যে সেই পূর্বকথা শুনিতাম, 'মহাদেবের জটা হইতে।'

একবার নদীতীরে আমার এক প্রিয়জনের পার্থিব অবশেষ চিতানলে ভস্মীভূত হইতে দেখিলাম। আমার সেই আজন্মপরিচিত বাৎসল্যের বাসমন্দির সহসা শূন্যে পরিণত হইল। সেই স্নেহের এক গভীর বিশাল প্রবাহ কোন্ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় দেশে বহিয়া চলিয়া গেল! যে যায়, সে তো আর ফিরে না; তবে কি সে অনন্তকালের জন্য লুপ্ত হয়? মৃত্যুতেই কি জীবনের পরিসমাপ্তি? যে যায় সে কোথা যায়? আমার প্রিয়জন আজ কোথায়?

তখন নদীর কলধ্বনির মধ্যে শুনিতে পাইলাম, "মহাদেবের পদতলে!"

চতুর্দিক অন্ধকার হইয়া আসিয়াছিল, কুলুকুলু শব্দের মধ্যে শুনিতে পাইলাম, "আমরা যথা হইতে আসি, আবার তথায় ফিরিয়া যাই। দীর্ঘ প্রবাসের পর উৎসে মিলিত হইতে যাইতেছি।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথা হইতে আসিয়াছ, নদী?" নদী সেই পুরাতন স্বরে উত্তর করিল, "মহাদেবের জটা হইতে।"

একদিন আমি বলিলাম, "নদী, আজ বহুকাল অবধি তোমার সহিত আমার সখ্য।

পুরাতনের মধ্যে কেবল তুমি। বাল্যকাল হইতে এ পর্যন্ত তুমি আমার জীবন বেষ্টন করিয়া আছ, আমার জীবনের এক অংশ হইয়া গিয়াছ; তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ, জানি না। আমি তোমার প্রবাহ অবলম্বন করিয়া তোমার উৎপত্তিস্থান দেখিয়া আসিব।"

শুনিয়াছিলাম, উত্তর-পশ্চিমে যে তুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ দেখা যায়, তাহা হইতে জাহ্নবীর উৎপত্তি হইয়াছে। আমি সেই শৃঙ্গ লক্ষ্য করিয়া, বহু গ্রাম জনপদ ও বিজন অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলাম। যাইতে যাইতে কূর্মাচল-নামক পুরাণপ্রথিত দেশে উপস্থিত হইলাম। তথা হইতে সরযূনদীর উৎপত্তিস্থান দর্শন করিয়া দানবপুরে আসিলাম। তাহার পর, পুনরায় বহুল গিরিগহন লঙ্ঘনপূর্বক উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

একদিন অতীব বন্ধুর পার্বত্য পথে চলিতে চলিতে পরিশ্রান্ত হইয়া বসিয়া পড়িলাম। আমার চতুর্দিকে পর্বতমালা, তাহাদের পার্শ্বদেশে নিবিড় অরণ্যানী; এক অভ্রভেদী শৃঙ্গ তাহার বিরাট দেহ-দ্বারা পশ্চাতের দৃশ্য অন্তরাল করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান। আমার পথপ্রদর্শক বলিল, "এই শৃঙ্গে উঠিলেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। নিম্নে যে রজতসূত্রের ন্যায় রেখা দেখা যাইতেছে, উহাই বহু দেশ অতিক্রম করিয়া তোমাদের দেশে অতি বেগবতী কূলপ্লাবিনী স্রোতস্বতী মূর্তি ধারণ করিয়াছে। সম্মুখস্থ শিখরে আরোহণ করিলেই দেখিতে পাইবে, এই সূক্ষ্ম সূত্রের আরম্ভ কোথায়।"

এই কথা শুনিয়া আমি সমুদয় পথশ্রম বিস্মৃত হইয়া নব উদ্যমে পর্বতে আরোহণ করিতে লাগিলাম। আমার পথপ্রদর্শক হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "সম্মুখে দেখো—জয় নন্দাদেবী! জয় ত্রিশূল!"

কিয়ৎক্ষণ পূর্বে পর্বতমালা আমার দৃষ্টি অবরোধ করিয়া ছিল। এখন উচ্চতর শৃঙ্গে আরোহণ করিবামাত্র আমার সম্মুখের আবরণ অপসৃত হইল। দেখিলাম, অনন্তপ্রসারিত নীল নভোমণ্ডল। সেই নিবিড় নীল স্তর ভেদ করিয়া দুই শুভ্র তুষারমূর্তি শূন্যে উত্থিত হইয়াছে। একটি গরীয়সী রমণীর ন্যায়—মনে হইল যেন আমার দিকে সস্নেহ প্রশান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন। যাঁহার বিশাল বক্ষে বহু জীব আশ্রয় ও বৃদ্ধি পাইতেছে, এই মূর্তি সেই মাতৃরূপিণী ধরিত্রীর বলিয়া চিনিলাম। ইঁহার অনতিদূরে মহাদেবের ত্রিশূল স্থাপিত। এই ত্রিশূল পাতালগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া মেদিনী বিদারণপূর্বক শাণিত অগ্রভাগ দ্বারা আকাশ বিদ্ধ করিতেছে। ত্রিভুবন এই মহাস্ত্রে গ্রথিত।[১]

---

[১] কুমায়ুনের উত্তরে দুই তুষারশিখর দেখা যায়। একটির নাম নন্দাদেবী, অপরটি ত্রিশূল নামে খ্যাত।

এইরূপে পরস্পরের পার্শ্বে, সৃষ্ট জগৎ ও সৃষ্টিকর্তার হস্তের আয়ুধ, সাকার-রূপে দর্শন করিলাম। এই ত্রিশূল যে স্থিতি ও প্রলয়ের চিহ্নরূপী, তাহা পরে বুঝিলাম।

আমার পথপ্রদর্শক বলিল, "সম্মুখে এখনও দীর্ঘ পথ রহিয়াছে, উহা অতীব দুর্গম; দুই দিন চলিলে পর তুষারনদী দেখিতে পাইবে।"

সেই দুই দিন বহু বন ও গিরিসংকট অতিক্রম করিয়া অবশেষে তুষারক্ষেত্রে উপনীত হইলাম। নদীর ধবল সূত্রটি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া এ পর্যন্ত আসিয়াছিল, কল্লোলিনীর মৃদু গীত এত দিন কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল, সহসা যেন কোন্ ঐন্দ্রজালিকের মন্ত্রপ্রভাবে সে গীত নীরব হইল, নদীর তরল নীর অকস্মাৎ কঠিন নিস্তব্ধ তুষারে পরিণত হইল। ক্রমে দেখিলাম, স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড ঊর্মিমালা প্রস্তরীভূত হইয়া রহিয়াছে, যেন ক্রীড়াশীল চঞ্চল তরঙ্গগুলিকে কে 'তিষ্ঠ' বলিয়া অচল করিয়া রাখিয়াছে। কোন্ মহাশিল্পী যেন সমগ্র বিশ্বের স্ফটিকখনি নিঃশেষ করিয়া এই বিশালক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের মূর্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

দুই দিকে উচ্চ পর্বতশ্রেণী, বহুদূরপ্রসারিত সেই পর্বতের পাদমূল হইতে উত্তুঙ্গ ভৃগুদেশ পর্যন্ত অগণ্য উন্নত বৃক্ষ নিরন্তর পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে। শিখর-তুষারনিঃসৃত জলধারা বঙ্কিম গতিতে নিম্নস্থ উপত্যকায় পতিত হইতেছে। সম্মুখে নন্দাদেবী ও ত্রিশূল এখন আর স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। মধ্যে ঘন কুজ্ঝটিকা; এই যবনিকা অতিক্রম করিলেই সৃষ্টি অবারিত হইবে।

তুষারনদীর উপর দিয়া ঊর্ধ্বে আরোহণ করিতে লাগিলাম। এই নদী ধবলগিরির উচ্চতম শৃঙ্গ হইতে আসিতেছে। আসিবার সময়ে পর্বতদেহ ভগ্ন করিয়া প্রস্তরস্তূপ বহন করিয়া আনিতেছে, সেই প্রস্তরস্তূপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। অতি দুরারোহ স্তূপ হইতে স্তূপান্তরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। যত ঊর্ধ্বে উঠিতেছি, বায়ুস্তর ততই ক্ষীণতর হইতেছে; সেই ক্ষীণ বায়ু দেবধূপের সৌরভে পরিপূর্ণ। ক্রমে শ্বাস-প্রশ্বাস কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল, শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। অবশেষে হতচেতনপ্রায় হইয়া নন্দাদেবীর পদতলে পতিত হইলাম।

সহসা শত শত শঙ্খনাদ একত্র কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। অর্ধোন্মীলিত নেত্রে দেখিলাম, সমগ্র পর্বত ও বনস্থলীতে পূজার আয়োজন হইয়াছে। জলপ্রপাতগুলি যেন সুবৃহৎ কমণ্ডলু-মুখ হইতে পতিত হইতেছে; সেইসঙ্গে পারিজাত বৃক্ষসকল স্বতঃ পুষ্পবর্ষণ করিতেছে। দূরে দিক্ আলোড়ন করিয়া শঙ্খধ্বনির ন্যায় গভীর ধ্বনি উঠিতেছে। ইহা শঙ্খধ্বনি কি পতনশীল তুষারপর্বতের বজ্রনিনাদ স্থির করিতে পারিলাম না।

কতক্ষণ পরে সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে হৃদয় উচ্ছ্বসিত

ও দেহ পুলকিত হইয়া উঠিল। এতক্ষণ যে কুজ্ঝটিকা নন্দাদেবী ও ত্রিশূল আচ্ছন্ন করিয়া ছিল, তাহা উর্ধ্বে উত্থিত হইয়া শূন্যমার্গ আশ্রয় করিয়াছে। নন্দাদেবীর শিরোপরি এক অতি বৃহৎ ভাস্বর জ্যোতি বিরাজ করিতেছে, তাহা একান্ত দুর্নিরীক্ষ্য। সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ হইতে নির্গত ধূমরাশি দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। তবে এই কি মহাদেবের জটা? এই জটা পৃথিবীরূপিণী নন্দাদেবীকে চন্দ্রাতপের ন্যায় আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। এই জটা হইতে হীরককণার তুল্য তুষারকণাগুলি নন্দাদেবীর মস্তকে উজ্জ্বল মুকুট পরাইয়া দিয়াছে। এই কঠিন হীরককণাই ত্রিশূলাগ্র শাণিত করিতেছে।

শিব ও রুদ্র! রক্ষক ও সংহারক! এখন ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম। মানসচক্ষে উৎস হইতে বারিকণার সাগরোদ্দেশে যাত্রা ও পুনরায় উৎসে প্রত্যাবর্তন স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। এই মহাচক্র-প্রবাহিত স্রোতে সৃষ্টি ও প্রলয়-রূপ পরস্পরের পার্শ্বে স্থাপিত দেখিলাম।

সম্মুখে আকাশভেদী যে পর্বতশ্রেণী দেখিতেছি, হিমাণুরূপ বারিকণা উহাদের শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে। প্রবেশ করিয়া মহাবিক্রমে উহাদের দেহ বিদীর্ণ করিতেছে। চ্যুত শিখর বজ্রনিনাদে নিম্নে পতিত হইতেছে।

বারিকণারাই নিম্নে শুভ্র তুষারশয্যা রচনা করিয়া রাখিয়াছে। ভগ্ন শৈল এই তুষারশয্যায় শায়িত হইল। তখন কণাগুলি একে অন্যকে ডাকিয়া বলিল, "আইস, আমরা ইহার অস্থি দিয়া পৃথিবীর দেহ নূতন করিয়া নির্মাণ করি।"

কোটি কোটি ক্ষুদ্রহস্ত অসংখ্য অণুপ্রমাণ শক্তির মিলনে, অনায়াসে সেই পর্বতভার বহিয়া নিম্নে চলিল। কোনও পথ ছিল না, পতিত পর্বতখণ্ডের ঘর্ষণেই পথ কাটিয়া গেল—উপত্যকা রচিত হইল। পর্বতগাত্রে ঘর্ষিত হইতে হইতে উপল-স্তূপ চূর্ণীকৃত হইল।

আমি যে স্থানে বসিয়া আছি, তাহার উভয়তঃ তুষারবাহিত প্রস্তরখণ্ড রাশীকৃত রহিয়াছে। ইহার নিম্নেই তুষারকণা তরলাকৃতি ধারণ করিয়া ক্ষুদ্র সরিতে পরিণত হইয়াছে। এই সরিৎ পর্বতের অস্থিচূর্ণ বহন করিয়া গিরিদেশ অতিবর্তন করিয়া বহুল সমৃদ্ধ নগর ও জনপদের মধ্য দিয়া সাগরোদ্দেশে প্রবাহিত হইতেছে।

পথে এক স্থানে উভয়কূলস্থ দেশ মরুভূমিপ্রায় হইয়াছিল। নদী তট উল্লঙ্ঘন করিয়া দেশ প্লাবিত করিল। পর্বতের অস্থিচূর্ণ সংযোগে মৃত্তিকার উর্বরতা-শক্তি বর্ধিত হইল। কঠিন পর্বতের দেহাবশেষ দ্বারা বৃক্ষলতার সজীব শ্যাম দেহ নির্মিত হইল।

বারিকণাগণই বৃষ্টিরূপে পৃথিবী ধৌত করিতেছে, এবং মৃত ও পরিত্যক্ত দ্রব্য বহন করিয়া সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিতেছে। তথায় মনুষ্যচক্ষুর অগোচরে নূতন

রাজ্যের সৃষ্টি হইতেছে। সমুদ্রে মিলিত বারিকণাকুল সর্বদা বিতাড়িত হইয়া বেলাভূমি ভগ্ন করিতেছে। জলকণা কখনও ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া পাতালপুরস্থ অগ্নিকুণ্ডে আহুতিস্বরূপ হইতেছে। সেই মহাযজ্ঞোত্থিত ধূমরাশি পৃথিবী বিদারণ করিয়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গাররূপে প্রকাশ পাইতেছে; সেই মহাতেজে পৃথিবী কম্পিত হইতেছে; ঊর্ধ্বভূমি অতলে নিমজ্জিত ও সমুদ্রতল উন্নত হইয়া নূতন মহাদেশ নির্মিত হইতেছে।

সমুদ্রে পতিত হইয়াও বারিবিন্দুগণের বিশ্রাম নাই। সূর্যের তেজে উত্তপ্ত হইয়া ইহারা ঊর্ধ্বে উড্ডীন হইতেছে। ইহারাই একদিন অশনি ও ঝঞ্ঝা বলে পর্বত-শিখরাভিমুখে ধাবিত হইয়া, তথায় বিপুল জটাজালের মধ্যে আশ্রয় লইবে; আবার কালক্রমে বিশ্রামান্তে পর্বতপৃষ্ঠে তুহিনাকারে পতিত হইবে। এই গতির বিরাম নাই, শেষ নাই।

এখনও ভাগীরথীতীরে বসিয়া তাহার কুলুকুলু ধ্বনি শ্রবণ করি। এখনও তাহাতে পূর্বের ন্যায় কথা শুনিতে পাই। এখন আর বুঝিতে ভুল হয় না। 'নদী, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ' ইহার উত্তরে এখনও সুস্পষ্ট স্বরে শুনিতে পাই—'মহাদেবের জটা হইতে।'

ঘর ও বাহির

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের শিশুকালে ভোগবিলাসের আয়োজন ছিল না বলিলেই হয়। মোটের উপরে তখনকার জীবনযাত্রা এখনকার চেয়ে অনেক বেশি সাদাসিধা ছিল। তখনকার কালের ভদ্রলোকের মানরক্ষার উপকরণ দেখিলে এখনকার কাল লজ্জায় তাহার সঙ্গে সকল-প্রকার সম্বন্ধ অস্বীকার করিতে চাহিবে। এই তো তখনকার কালের বিশেষত্ব, তাহার 'পরে আবার বিশেষভাবে আমাদের বাড়িতে ছেলেদের প্রতি অত্যন্ত বেশি দৃষ্টি দিবার উৎপাত একেবারেই ছিল না। আসলে, আদর করা ব্যাপারটা অভিভাবকদেরই বিনোদনের জন্য, ছেলেদের পক্ষে এমন বালাই আর নাই।

আমরা ছিলাম চাকরদেরই শাসনের অধীনে। নিজেদের কর্তব্যকে সরল করিয়া লইবার জন্য তাহারা আমাদের নড়াচাড়া একপ্রকার বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। সেদিকে

বন্ধন যতই কঠিন থাক্‌, অনাদর একটা মস্ত স্বাধীনতা—সেই স্বাধীনতায় আমাদের মন মুক্ত ছিল। খাওয়ানো-পরানো সাজানো-গোজানোর দ্বারা আমাদের চিত্তকে চারি দিক হইতে একেবারে ঠাসিয়া ধরা হয় নাই।

আহারে আমাদের শৌখিনতার গন্ধও ছিল না। কাপড়চোপড় এতই যৎসামান্য ছিল যে এখনকার ছেলের চক্ষে তাহার তালিকা ধরিলে সম্মানহানির আশঙ্কা আছে। বয়স দশের কোঠা পার হইবার পূর্বে কোনো দিন কোনো কারণেই মোজা পরি নাই। শীতের দিনে একটা সাদা জামার উপরে আর-একটা সাদা জামাই যথেষ্ট ছিল। ইহাতে কোনোদিন অদৃষ্টকে দোষ দিই নাই। কেবল, আমাদের বাড়ির দরজি নেয়ামত খলিফা অবহেলা করিয়া আমাদের জামায় পকেট-যোজনা অনাবশ্যক মনে করিলে দুঃখ বোধ করিতাম—কারণ, এমন বালক কোনো অকিঞ্চনের ঘরেও জন্মগ্রহণ করে নাই, পকেটে রাখিবার মতো স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি যাহার কিছুমাত্র নাই; বিধাতার কৃপায় শিশুর ঐশ্বর্য সম্বন্ধে ধনী ও নির্ধনের ঘরে বেশি কিছু তারতম্য দেখা যায় না। আমাদের চটিজুতা একজোড়া থাকিত, কিন্তু পা দুটা যেখানে থাকিত সেখানে নহে। প্রতি পদক্ষেপে তাহাদিগকে আগে আগে নিক্ষেপ করিয়া চলিতাম; তাহাতে যাতায়াতের সময় পদচালনা অপেক্ষা জুতাচালনা এত বাহুল্য পরিমাণে হইত যে, পাদুকাসৃষ্টির উদ্দেশ্য পদে পদে ব্যর্থ হইয়া যাইত।

আমাদের চেয়ে যাঁহারা বড়ো তাঁহাদের গতিবিধি, বেশভূষা, আহারবিহার, আরাম-আমোদ, আলাপ-আলোচনা, সমস্তই আমাদের কাছ হইতে বহু দূরে ছিল। তাহার আভাস পাইতাম কিন্তু নাগাল পাইতাম না। এখনকার কালে ছেলেরা গুরুজনদিগকে লঘু করিয়া লইয়াছে; কোথাও তাহাদের কোনো বাধা নাই এবং না চাহিতেই তাহারা সমস্ত পায়। আমরা এত সহজে কিছুই পাই নাই। কত তুচ্ছ সামগ্রীও আমাদের পক্ষে দুর্লভ ছিল; বড়ো হইলে কোনো-এক সময়ে পাওয়া যাইবে, এই আশায় তাহাদিগকে দূর ভবিষ্যতের জিম্মায় সমর্পণ করিয়া বসিয়াছিলাম। তাহার ফল হইয়াছিল এই যে, তখন সামান্য যাহাকিছু পাইতাম তাহার সমস্ত রসটুকু পুরা আদায় করিয়া লইতাম, তাহার খোসা হইতে আঁঠি পর্যন্ত কিছুই ফেলা যাইত না। এখনকার সম্পন্ন ঘরের ছেলেদের দেখি, তাহারা সহজেই সব জিনিস পায় বলিয়া তাহার বারো-আনাকেই আধখানা কামড় দিয়া বিসর্জন করে—তাহাদের পৃথিবীর অধিকাংশই তাহাদের কাছে অপব্যয়েই নষ্ট হয়।

বাহিরবাড়িতে দোতলায় দক্ষিণপূর্ব কোণের ঘরে চাকরদের মহলে আমাদের দিন কাটিত।

আমাদের এক চাকর ছিল, তাহার নাম শ্যাম। শ্যামবর্ণ দোহারা বালক, মাথায় লম্বা চুল, খুলনা জেলায় তাহার বাড়ি। সে আমাকে ঘরের একটি নির্দিষ্ট স্থানে

বসাইয়া আমার চারি দিকে খড়ি দিয়া গণ্ডি কাটিয়া দিত। গম্ভীর মুখ করিয়া তর্জনী তুলিয়া বলিয়া যাইত, গণ্ডির বাহিরে গেলেই বিষম বিপদ। বিপদটা আধিভৌতিক কি আধিদৈবিক তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতাম না, কিন্তু মনে বড়ো একটা আশঙ্কা হইত। গণ্ডি পার হইয়া সীতার কী সর্বনাশ হইয়াছিল তাহা রামায়ণে পড়িয়াছিলাম, এইজন্য গণ্ডিটাকে নিতান্ত অবিশ্বাসীর মতো উড়াইয়া দিতে পারিতাম না।

জানালার নীচেই একটি ঘাটবাঁধানো পুকুর ছিল। তাহার পূর্বধারের প্রাচীরের গায়ে প্রকাণ্ড একটা চীনা বট—দক্ষিণধারে নারিকেলশ্রেণী। গণ্ডি বন্ধনের বন্দী আমি জানলার খড়খড়ি খুলিয়া প্রায় সমস্তদিন সেই পুকুরটাকে একখানা ছবির বহির মতো দেখিয়া দেখিয়া কাটাইয়া দিতাম। সকাল হইতে দেখিতাম, প্রতিবেশীরা একে একে স্নান করিতে আসিতেছে। তাহাদের কে কখন আসিবে আমার জানা ছিল। প্রত্যেকের স্নানের বিশেষত্বটুকুও আমার পরিচিত। কেহ-বা দুই কানে আঙুল চাপিয়া ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া দ্রুতবেগে কতকগুলো ডুব পাড়িয়া চলিয়া যাইত; কেহ-বা ডুব না দিয়া গামছায় জল তুলিয়া ঘন ঘন মাথায় ঢালিতে থাকিত; কেহ-বা জলের উপরিভাগের মলিনতা এড়াইবার জন্য বারবার দুই হাতে জল কাটাইয়া লইয়া হঠাৎ একসময়ে ধাঁ করিয়া ডুব পাড়িত; কেহ-বা উপরের সিঁড়ি হইতেই বিনা ভূমিকায় সশব্দে জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া আত্মসমর্পণ করিত; কেহ-বা জলের মধ্যে নামিতে নামিতে এক নিশ্বাসে কতকগুলি শ্লোক আওড়াইয়া লইত; কেহ-বা ব্যস্ত, কোনোমতে স্নান সারিয়া লইয়া বাড়ি যাইবার জন্য উৎসুক; কাহারো-বা ব্যস্ততা লেশমাত্র নাই—ধীরেসুস্থে স্নান করিয়া, জপ করিয়া, গা মুছিয়া, কাপড় ছাড়িয়া, কোঁচাটা দুই-তিনবার ঝাড়িয়া, বাগান হইতে কিছু-বা ফুল তুলিয়া, মৃদুমন্দ দোদুল-গতিতে স্নানস্নিগ্ধ শরীরের আরামটিকে বায়ুতে বিকীর্ণ করিতে করিতে বাড়ির দিকে তাহার যাত্রা। এমনি করিয়া দুপুর বাজিয়া যায়, বেলা একটা হয়। ক্রমে পুকুরের ঘাট জনশূন্য নিস্তব্ধ। কেবল রাজহাঁস ও পাতিহাঁসগুলা সারা বেলা ডুব দিয়া গুগলি তুলিয়া খায় এবং চঞ্চুচালনা করিয়া ব্যতিব্যস্তভাবে পিঠের পালক সাফ করিতে থাকে।

পুষ্করিণী নির্জন হইয়া গেলে সেই বটগাছের তলাটা আমার সমস্ত মনকে অধিকার করিয়া লইত। তাহার গুঁড়ির চারি ধারে অনেকগুলা ঝুরি নামিয়া একটা অন্ধকারময় জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই কুহকের মধ্যে, বিশ্বের সেই একটা অস্পষ্ট কোণে যেন ভ্রমক্রমে বিশ্বের নিয়ম ঠেকিয়া গেছে। দৈবাৎ সেখানে যেন স্বপ্ন-যুগের একটা অসম্ভবের রাজত্ব বিধাতার চোখ এড়াইয়া আজও দিনের আলোর মাঝখানে রহিয়া গিয়াছে। মনের চক্ষে সেখানে যে কাহাদের দেখিতাম এবং তাহাদের ক্রিয়াকলাপ যে কী রকম, আজ তাহা স্পষ্ট ভাষায় বলা অসম্ভব। এই বটকেই উদ্দেশ করিয়া একদিন লিখিয়াছিলাম—

নিশিদিন দাঁড়িয়ে আছ মাথায় লয়ে জট,
ছোটো ছেলেটি মনে কি পড়ে, ওগো প্রাচীন বট।

কিন্তু হায়, সে-বট এখন কোথায়? যে-পুকুরটি এই বনস্পতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার দর্পণ ছিল তাহাও এখন নাই; যাহারা স্নান করিত তাহারাও অনেকেই এই অন্তর্হিত বটগাছের ছায়ারই অনুসরণ করিয়াছে। আর, সেই বালক আজ বাড়িয়া উঠিয়া নিজের চারি দিক হইতে নানাপ্রকারের ঝুরি নামাইয়া দিয়া বিপুল জটিলতার মধ্যে সুদিন-দুর্দিনের ছায়ারৌদ্রপাত গণনা করিতেছে।

বাড়ির বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল, এমন-কি বাড়ির ভিতরেও আমরা সর্বত্র যেমন-খুশি যাওয়া-আসা করিতে পারিতাম না। সেইজন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়ল-আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্ত প্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ শব্দ গন্ধ দ্বার-জানালার নানা ফাঁক-ফুকর দিয়া এদিক-ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইশারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ—মিলনের উপায় ছিল না, সেইজন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল। আজ সেই খড়ির গণ্ডি মুছিয়া গেছে, কিন্তু গণ্ডি তবু ঘোচে নাই। দূর এখনো দূরে, বাহির এখনো বাহিরেই। বড়ো হইয়া যে কবিতাটি[১] লিখিয়াছিলাম তাহাই মনে পড়ে—

খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে,
বনের পাখি ছিল বনে।
একদা কী করিয়া মিলন হল দোঁহে,
কী ছিল বিধাতার মনে।
বনের পাখি বলে, "খাঁচার পাখি, আয়,
বনেতে যাই দোঁহে মিলে।"
খাঁচার পাখি বলে, "বনের পাখি, আয়,
খাঁচায় থাকি নিরিবিলে।"
বনের পাখি বলে, "না,
আমি শিকলে ধরা নাহি দিব।"
খাঁচার পাখি বলে, "হায়,
আমি কেমনে বনে বাহিরিব।"

আমাদের বাড়ির ভিতরের ছাদের প্রাচীর আমার মাথা ছাড়াইয়া উঠিত। যখন একটু বড়ো হইয়াছি এবং চাকরদের শাসন কিঞ্চিৎ শিথিল হইয়াছে, যখন বাড়িতে

---

১ 'দুই পাখি', সোনার তরী।

নূতন বধূসমাগম[২] হইয়াছে এবং অবকাশের সঙ্গিরূপে তাঁহার কাছে প্রশ্রয় লাভ করিতেছি, তখন এক-একদিন মধ্যাহ্নে সেই ছাদে আসিয়া উপস্থিত হইতাম। তখন বাড়িতে সকলের আহার শেষ হইয়া গিয়াছে; গৃহকর্মে ছেদ পড়িয়াছে; অন্তঃপুর বিশ্রামে নিমগ্ন; স্নানসিক্ত শাড়িগুলি ছাদের কার্নিসের উপর হইতে ঝুলিতেছে; উঠানের কোণে যে উচ্ছিষ্ট ভাত পড়িয়াছে তাহারই উপর কাকের দলের সভা বসিয়া গেছে। সেই নির্জন অবকাশে প্রাচীরের রন্ধ্রের ভিতর হইতে এই খাঁচার পাখির সঙ্গে ওই বনের পাখির চঞ্চুতে চঞ্চুতে পরিচয় চলিত। দাঁড়াইয়া চাহিয়া থাকিতাম—চোখে পড়িত আমাদের বাড়ি-ভিতরের বাগান-প্রান্তের নারিকেলশ্রেণী; তাহারই ফাঁক দিয়া দেখা যাইত 'সিঙ্গির বাগান', পল্লীর একটা পুকুর, এবং সেই পুকুরের ধারে যে তারা গয়লানী আমাদের দুধ দিত তাহারই গোয়ালঘর; আরো দূরে দেখা যাইত, তরুচূড়ার সঙ্গে মিশিয়া কলিকাতা শহরের নানা আকারের ও নানা আয়তনের উচ্চনীচ ছাদের শ্রেণী মধ্যাহ্নরৌদ্রে প্রখর শুভ্রতা বিচ্ছুরিত করিয়া পূর্বদিগন্তের পাণ্ডুবর্ণ নীলিমার মধ্যে উধাও হইয়া চলিয়া গিয়াছে। সেই-সকল অতিদূর বাড়ির ছাদে এক-একটা চিলেকোঠা উঁচু হইয়া থাকিত; মনে হইত, তাহারা যেন নিশ্চল তর্জনী তুলিয়া চোখ টিপিয়া আপনার ভিতরকার রহস্য আমার কাছে সংকেতে বলিবার চেষ্টা করিতেছে। ভিক্ষুক যেমন প্রাসাদের বাহিরে দাঁড়াইয়া রাজভাণ্ডারের রুদ্ধ সিন্ধুক-গুলার মধ্যে অসম্ভব রত্নমানিক কল্পনা করে, আমিও তেমনি ওই অজানা বাড়িগুলোকে কত খেলা ও কত স্বাধীনতায় আগাগোড়া বোঝাই করা মনে করিতাম তাহা বলিতে পারি না। মাথার উপরে আকাশব্যাপী খরদীপ্তি, তাহারই দূরতম প্রান্ত হইতে চিলের সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ ডাক আমার কানে আসিয়া পৌঁছিত এবং সিঙ্গির বাগানের পাশের গলিতে দিবাসুপ্ত নিস্তব্ধ বাড়িগুলার সম্মুখ দিয়া পসারি সুর করিয়া 'চাই, চুড়ি চাই, খেলোনা চাই' হাঁকিয়া যাইত—তাহাতে আমার সমস্ত মনটা উদাস করিয়া দিত।

পিতৃদেব প্রায়ই ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন, বাড়িতে থাকিতেন না। তাঁহার তেতলার ঘর বন্ধ থাকিত। খড়খড়ি খুলিয়া, হাত গলাইয়া ছিটকিনি টানিয়া, দরজা খুলিতাম এবং তাঁহার ঘরের দক্ষিণ প্রান্তে একটি সোফা ছিল—সেইটিতে চুপ করিয়া পড়িয়া আমার মধ্যাহ্ন কাটিত। একে তো অনেক দিনের বন্ধ-করা ঘর, নিষিদ্ধপ্রবেশ, সে-ঘরে যেন একটা রহস্যের ঘন গন্ধ ছিল। তাহার পরে সম্মুখের জনশূন্য খোলা ছাদের উপর রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিত, তাহাতেও মনটাকে উদাস করিয়া দিত। তার উপরে আরো একটা আকর্ষণ ছিল। তখন সবেমাত্র শহরে জলের কল হইয়াছে। তখন নূতন মহিমার ঔদার্যে বাঙালিপাড়াতেও তাহার কার্পণ্য শুরু হয় নাই। শহরের উত্তরে দক্ষিণে তাহার

[২] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী কাদম্বরী দেবী।

দাক্ষিণ্য সমান ছিল। সেই জলের কলের সত্যযুগে আমার পিতার স্নানের ঘরে তেতালাতেও জল পাওয়া যাইত। ঝাঁঝরি খুলিয়া দিয়া অকালে মনের সাধ মিটাইয়া স্নান করিতাম। সে-স্নান আরামের জন্য নহে, কেবলমাত্র ইচ্ছাটাকে লাগাম ছাড়িয়া দিবার জন্য। এক দিকে মুক্তি, আর, এক দিকে বন্ধনের আশঙ্কা, এই দুইয়ে মিলিয়া কোম্পানির কলের জলের ধারা আমার মনের মধ্যে পুলকশর বর্ষণ করিত।

বাহিরের সংস্রব আমার পক্ষে যতই দুর্লভ থাক্, বাহিরের আনন্দ আমার পক্ষে হয়তো সেই কারণেই সহজ ছিল। উপকরণ প্রচুর থাকিলে মনটা কুঁড়ে হইয়া পড়ে, সে কেবলই বাহিরের উপরেই সম্পূর্ণ বরাত দিয়া বসিয়া থাকে; ভুলিয়া যায়, আনন্দের ভোজে বাহিরের চেয়ে অন্তরের অনুষ্ঠানটাই গুরুতর। শিশুকালে মানুষের সর্বপ্রথম শিক্ষাটাই এই। তখন তাহার সম্বল অল্প এবং তুচ্ছ, কিন্তু আনন্দলাভের পক্ষে ইহার চেয়ে বেশি তাহার কিছুই প্রয়োজন নাই। সংসারে যে হতভাগ্য শিশু খেলার জিনিস অপর্যাপ্ত পাইয়া থাকে তাহার খেলা মাটি হইয়া যায়।

বাড়ির ভিতরে আমাদের যে-বাগান ছিল তাহাকে বাগান বলিলে অনেকটা বেশি বলা হয়। একটা বাতাবি লেবু, একটা কুলগাছ, একটা বিলাতি আমড়া ও এক সার নারিকেলগাছ তাহার প্রধান সম্পত্তি। মাঝখানে ছিল একটা গোলাকার বাঁধানো চাতাল। তাহার ফাটলের রেখায় রেখায় ঘাস ও নানাপ্রকার গুল্ম অনধিকার প্রবেশপূর্বক জবর-দখলের পতাকা রোপণ করিয়াছিল। যে-ফুলগাছগুলো অনাদরেও মরিতে চায় না তাহারাই মালীর নামে কোনো অভিযোগ না আনিয়া, নিরভিমানে যথাশক্তি আপন কর্তব্য পালন করিয়া যাইত। উত্তরকোণে একটা ঢেঁকিঘর ছিল, সেখানে গৃহস্থালির প্রয়োজনে মাঝে মাঝে অন্তঃপুরিকাদের সমাগম হইত। কলিকাতায় পল্লীজীবনের সম্পূর্ণ পরাভব স্বীকার করিয়া, এই ঢেঁকিশালাটি কোন্-একদিন নিঃশব্দে মুখ ঢাকিয়া অন্তর্ধান করিয়াছে। প্রথম-মানব আদমের স্বর্গোদ্যানটি যে আমাদের এই বাগানের চেয়ে বেশি সুসজ্জিত ছিল, আমার এরূপ বিশ্বাস নহে। কারণ, প্রথম-মানবের স্বর্গলোক আবরণহীন—আয়োজনের দ্বারা সে আপনাকে আচ্ছন্ন করে নাই। জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার পর হইতে, যে পর্যন্ত না সেই ফলটাকে সম্পূর্ণ হজম করিতে পারিতেছে, সে পর্যন্ত মানুষের সাজসজ্জার প্রয়োজন কেবলই বাড়িয়া উঠিতেছে। বাড়ির ভিতরের বাগান আমার সেই স্বর্গের বাগান ছিল—সেই আমার যথেষ্ট ছিল। বেশ মনে পড়ে, শরৎকালের ভোরবেলায় ঘুম ভাঙিলেই এই বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইতাম। একটি শিশিরমাখা ঘাসপাতার গন্ধ ছুটিয়া আসিত, এবং স্নিগ্ধ নবীন রৌদ্রটি লইয়া আমাদের পূর্বদিকের প্রাচীরের উপর নারিকেলপাতার কম্পমান ঝালরগুলির তলে প্রভাত আসিয়া মুখ বাড়াইয়া দিত।

আমাদের বাড়ির উত্তর-অংশে আর-এক খণ্ড ভূমি পড়িয়া আছে, আজ পর্যন্ত

ইহাকে আমরা গোলাবাড়ি বলিয়া থাকি। এই নামের দ্বারা প্রমাণ হয়, কোনো এক পুরাতন সময়ে ওখানে গোলা করিয়া সম্বৎসরের শস্য রাখা হইত—তখন শহর এবং পল্লী অল্পবয়সের ভাইভগিনীর মতো অনেকটা একরকম চেহারা লইয়া প্রকাশ পাইত. এখন দিদির সঙ্গে ভাইয়ের মিল খুঁজিয়া পাওয়াই শক্ত।

ছুটির দিনে সুযোগ পাইলে এই গোলাবাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইতাম। খেলিবার জন্য যাইতাম বলিলে ঠিক বলা হয় না। খেলাটার চেয়ে এই জায়গাটারই প্রতি আমার টান বেশি ছিল। তাহার কারণ কী বলা শক্ত। বোধ হয় বাড়ির কোণের একটা নিভৃত পোড়ো জায়গা বলিয়াই আমার কাছে তাহার কী একটা রহস্য ছিল। সে আমাদের বাসের স্থান নহে, ব্যবহারের ঘর নহে; সেটা কাজের জন্যও নহে; সেটা বাড়িঘরের বাহিরে, তাহাতে নিত্যপ্রয়োজনের কোনো ছাপ নাই, তাহা শোভাহীন অনাবশ্যক পতিত জমি, কেহ সেখানে ফুলের গাছও বসায় নাই; এইজন্য সেই উজাড় জায়গাটায় বালকের মন আপন ইচ্ছামত কল্পনায় কোনো বাধা পাইত না। রক্ষকদের শাসনের একটুমাত্র রন্ধ্র দিয়া যেদিন কোনোমতে এইখানে আসিতে পারিতাম সেদিন ছুটির দিন বলিয়াই বোধ হইত।

বাড়িতে আরো-একটা জায়গা ছিল, সেটা যে কোথায় তাহা আজ পর্যন্ত বাহির করিতে পারি নাই। আমার সমবয়স্কা খেলার সঙ্গিনী একটি বালিকা সেটাকে রাজার বাড়ি বলিত। কখনো কখনো তাহার কাছে শুনিতাম, "আজ সেখানে গিয়াছিলাম।" কিন্তু একদিনও এমন শুভযোগ হয় নাই যখন আমিও তাহার সঙ্গ ধরিতে পারি। সে একটা আশ্চর্য জায়গা, সেখানে খেলাও যেমন আশ্চর্য খেলার সামগ্রীও তেমনি অপরূপ। মনে হইত, সেটা অত্যন্ত কাছে; একতলায় বা দোতলায় কোনো-একটা জায়গায়; কিন্তু কোনোমতেই সেখানে যাওয়া ঘটিয়া উঠে না। কতবার বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, "রাজার বাড়ি কি আমাদের বাড়ির বাহিরে?" সে বলিয়াছে, "না, এই বাড়ির মধ্যেই।" আমি বিস্মিত হইয়া বসিয়া ভাবিতাম, বাড়ির সকল ঘরই তো আমি দেখিয়াছি কিন্তু সে-ঘর তবে কোথায়? রাজা যে কে সে-কথা কোনোদিন জিজ্ঞাসাও করি নাই, রাজত্ব যে কোথায় তাহা আজ পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে, কেবল এইটুকুমাত্র আভাস পাওয়া গিয়াছে যে, আমাদের বাড়িতেই সেই রাজার বাড়ি।

ছেলেবেলার দিকে যখন তাকানো যায় তখন সবচেয়ে এই কথাটা মনে পড়ে যে, তখন জগৎটা এবং জীবনটা রহস্যে পরিপূর্ণ। সর্বত্রই যে একটি অভাবনীয় আছে এবং কখন যে তাহার দেখা পাওয়া যাইবে তাহার ঠিকানা নাই, এই কথাটা প্রতিদিনই মনে জাগিত। প্রকৃতি যেন হাত মুঠা করিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিত, "কী আছে বলো দেখি।" কোন্‌টা থাকা যে অসম্ভব, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিতাম না।

বেশ মনে পড়ে, দক্ষিণের বারান্দার এক কোণে আতার বিচি পুঁতিয়া রোজ

জল দিতাম। সেই বিচি হইতে যে গাছ হইতেও পারে এ কথা মনে করিয়া ভারি বিস্ময় এবং ঔৎসুক্য জন্মিত। আতার বীজ হইতে আজও অংকুর বাহির হয়, কিন্তু মনের মধ্যে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আজ আর বিস্ময় অংকুরিত হইয়া উঠে না। সেটা আতার বীজের দোষ নয়, সেটা মনেরই দোষ। গুণদাদার° বাগানের ক্রীড়াশৈল হইতে পাথর চুরি করিয়া আনিয়া আমাদের পড়িবার ঘরের এক কোণে আমরা নকল পাহাড় তৈরি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম—তাহারই মাঝে মাঝে ফুলগাছের চারা পুঁতিয়া সেবার আতিশয্যে তাহাদের প্রতি এত উপদ্রব করিতাম যে, নিতান্তই গাছ বলিয়া তাহারা চুপ করিয়া থাকিত এবং মরিতে বিলম্ব করিত না। এই পাহাড়টার প্রতি আমাদের কী আনন্দ এবং কী বিস্ময় ছিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। মনে বিশ্বাস ছিল, আমাদের এই সৃষ্টি গুরুজনের পক্ষেও নিশ্চয় আশ্চর্যের সামগ্রী হইবে; সেই বিশ্বাসের যেদিন পরীক্ষা করিতে গেলাম সেইদিনই আমাদের গৃহকোণের পাহাড় তাহার গাছপালা-সমেত কোথায় অন্তর্ধান করিল। ইস্কুল-ঘরের কোণ যে পাহাড়-সৃষ্টির উপযুক্ত ভিত্তি নহে, এমন অকস্মাৎ এমন রূঢ়ভাবে সে শিক্ষালাভ করিয়া বড়োই দুঃখ বোধ করিয়াছিলাম। আমাদের লীলার সঙ্গে বড়োদের ইচ্ছার যে এত প্রভেদ তাহা স্মরণ করিয়া গৃহভিত্তির অপসারিত প্রস্তরভার আমাদের মনের মধ্যে আসিয়া চাপিয়া বসিল।

তখনকার দিনে এই পৃথিবী বস্তুটার রস কী নিবিড় ছিল, সেই কথাই মনে পড়ে। কী মাটি, কী জল, কী গাছপালা, কী আকাশ, সমস্তই তখন কথা কহিত—মনকে কোনোমতেই উদাসীন থাকিতে দেয় নাই। পৃথিবীকে কেবলমাত্র উপরের তলাতেই দেখিতেছি, তাহার ভিতরের তলাটা দেখিতে পাইতেছি না, ইহাতে কতদিন যে মনকে ধাক্কা দিয়াছে তাহা বলিতে পারি না। কী করিলে পৃথিবীর উপরকার এই মেটে রঙের মলাটটাকে খুলিয়া ফেলা যাইতে পারে, তাহার কতই প্ল্যান ঠাওরাইয়াছি। মনে ভাবিতাম, একটার পর আর-একটা বাঁশ যদি ঠুকিয়া ঠুকিয়া পোঁতা যায়, এমনি করিয়া অনেক বাঁশ পোঁতা হইয়া গেলে পৃথিবীর খুব গভীরতম তলাটাকে হয়তো একরকম করিয়া নাগাল পাওয়া যাইতে পারে। মাঘোৎসব উপলক্ষে আমাদের উঠানের চারি ধারে সারি সারি করিয়া কাঠের থাম পুঁতিয়া তাহাতে ঝাড় টাঙানো হইত। পয়লা মাঘ হইতেই এজন্য উঠানে মাটি-কাটা আরম্ভ হইত। সর্বত্রই উৎসবের উদ্যোগের আরম্ভটা ছেলেদের কাছে অত্যন্ত ঔৎসুক্যজনক। কিন্তু, আমার কাছে বিশেষভাবে এই মাটি-কাটা ব্যাপারের একটা টান ছিল। যদিচ প্রত্যেক বৎসরই মাটি কাটিতে দেখিয়াছি—দেখিয়াছি, গর্ত বড়ো হইতে হইতে একটু একটু করিয়া সমস্ত মানুষটাই গহ্বরের নীচে তলাইয়া গিয়াছে, অথচ তাহার মধ্যে কোনোবারই এমন-কিছু দেখা দেয়

° গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর : দেবেন্দ্রনাথের ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র।

নাই যাহা কোনো রাজপুত্র বা পাত্রের পুত্রের পাতালপুর-যাত্রা সফল করিতে পারে, তবুও প্রত্যেক বারেই আমার মনে হইত, একটা রহস্যসিন্ধুকের ডালা খোলা হইতেছে। মনে হইত, যেন আর-একটু খুঁড়িলেই হয়; কিন্তু, বৎসরের পর বৎসর গেল, সেই আর-একটুকু কোনোবারেই খোঁড়া হইল না। পর্দায় একটুখানি টান দেওয়াই হইল। কিন্তু তোলা হইল না। মনে হইত, বড়োরা তো ইচ্ছা করিলেই সব করাইতে পারেন তবে তাঁহারা কেন এমন অগভীরের মধ্যে থামিয়া বসিয়া আছেন—আমাদের মতো শিশুর আজ্ঞা যদি খাটিত, তাহা হইলে পৃথিবীর গূঢ়তম সংবাদটি এমন উদাসীনভাবে মাটিচাপা পড়িয়া থাকিত না। আর, যেখানে আকাশের নীলিমা তাহারই পশ্চাতে আকাশের সমস্ত রহস্য, সে-চিন্তাও মনকে ঠেলা দিত। যেদিন বোধোদয় পড়াইবার উপলক্ষে পণ্ডিতমহাশয় বলিলেন, আকাশের ওই নীল গোলকটি কোনো-একটা বাধামাত্রই নহে, তখন সেটা কী অসম্ভব আশ্চর্যই মনে হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, "সিঁড়ির উপর সিঁড়ি লাগাইয়া উপরে উঠিয়া যাও-না, কোথাও মাথা ঠেকিবে না।" আমি ভাবিলাম, সিঁড়ি সম্বন্ধে বুঝি তিনি অনাবশ্যক কার্পণ্য করিতেছেন। আমি কেবলই সুর চড়াইয়া বলিতে লাগিলাম, "আরো সিঁড়ি, আরো সিঁড়ি, আরো সিঁড়ি"—শেষকালে যখন বুঝা গেল সিঁড়ির সংখ্যা বাড়াইয়া কোনো লাভ নাই তখন স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম এবং মনে করিলাম, এটা এমন একটা আশ্চর্য খবর যে পৃথিবীতে যাঁহারা মাস্টারমশায় তাঁহারাই কেবল এটা জানেন, আর কেহ নয়।

ভানুসিংহের পত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রুকসাইড
শিলং

কাল এসে পৌঁচেছি শিলং-পর্বতে, পথে কত যে বিঘ্ন ঘটল তার ঠিক নেই। মনে আছে—বোলপুর থেকে আসবার সময় মা-গঙ্গা আমাকে জল-কাদার মধ্যে হিঁচড়ে এনে সাবধান করে দিয়েছিলেন। কিন্তু মানলুম না, বৃহস্পতিবারের বারবেলায় কৃষ্ণ-প্রতিপদ তিথিতে রেলে চড়ে বসলুম। দু দিন আগে রথী[১] আমাদের একখানা

[১] রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্রনাথের পুত্র।

মোটরগাড়ি গৌহাটি-স্টেশনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, ইচ্ছা ছিল—সেই গাড়িতে করে পাহাড়ে চড়ব। সঙ্গে আমাদের আছেন দিনুবাবু এবং কমলবোঠান, এবং আছেন সাধুচরণ, এবং আছে বাক্স তোরঙ্গ নানা আকার ও আয়তনের এবং সঙ্গে সঙ্গে চলেছেন আমাদের ভাগ্যদেবতা; তাঁকে টিকিট কিনতে হয় নি। সান্তাহার স্টেশনে আসাম মেলে চড়লুম, এমনি কসে ঝাঁকানি দিতে লাগল যে, দেহের রস-রক্ত যদি হত দই, তা হলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই প্রাণটা তার থেকে মাখন হয়ে ছেড়ে বেরিয়ে আসত। অর্ধেক রাত্রে বজ্রনাদ সহকারে মুষলধারে বৃষ্টি হতে লাগল। গৌহাটির নিকটবর্তী স্টেশনে যখন খেয়া-জাহাজে ব্রহ্মপুত্রে ওঠা গেল তখন আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন কিন্তু বৃষ্টি নেই। ওপারে গিয়েই মোটরগাড়িতে চড়ব বলে খেয়ে-দেয়ে সেজে-গুজে গুছিয়ে-গাছিয়ে বসে আছি—গিয়ে শুনি, ব্রহ্মপুত্রে বন্যা এসেছে বলে এখনো ঘাটে মোটর নামাতে পারে নি। এ দিকে বলে, দুটোর পরে মোটর ছাড়তে দেয় না। অনেক বকাবকি দাপাদাপি ছুটোছুটি হাঁকডাক করে বেলা আড়াইটের সময় গাড়ি এল। কিন্তু সময় গেল। তীরের কাছে একটা শূন্য জাহাজ বাঁধা ছিল, সেইটেতে উঠে মুটের সাহায্যে কয়েক বালতি ব্রহ্মপুত্রের জল তুলিয়ে আনা গেল—স্নান করবার ইচ্ছা। ভূগোলে পড়া গেছে—পৃথিবীর তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থল, কিন্তু বন্যার ব্রহ্মপুত্রের ঘোলা স্রোতে সেদিন তিনভাগ স্থল একভাগ জল। তাতে দেহ স্নিগ্ধ হল বটে কিন্তু নির্মল হল বলতে পারি নে। বোলপুর থেকে রাত্রি এগারোটার সময় হাওড়ার তীরে কাদার মধ্যে পড়ে যেমন গঙ্গাস্নান হয়েছিল, সেদিন ব্রহ্মপুত্রের জলে স্নানটাও তেমনি পঙ্কিল। তা হোক, এবার আমার ভাগ্য আমাকে ঘাড়ে ধরে পুণ্যতীর্থে দিকে স্নান করিয়ে দিলেন। কোথায় রাত্রি যাপন করতে হবে তারই সন্ধানে আমাদের মোটরে চড়ে গৌহাটি শহরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়া গেল। কিছু দূরে গিয়ে দেখি, আমাদের গাড়িটা হঠাৎ ন যযৌ ন তস্থৌ। বোঝা গেল, আমাদের ভাগ্যদেবতা বিনা অনুমতিতে আমাদের এ গাড়িতেও চড়ে বসেছেন, তিনিই আমাদের কলের প্রতি কটাক্ষ-পাত করতেই সে বিকল হয়েছে। অনেক যত্নে যখন তাকে একটা মোটরগাড়ির কারখানায় নিয়ে যাওয়া গেল তখন সূর্যদেব অস্তমিত। কারখানার লোকেরা বললে, 'আজ কিছু করা অসম্ভব, কাল চেষ্টা দেখা যাবে।' আমরা জিজ্ঞাসা করলুম, 'রাত্রে আশ্রয় পাই কোথায়।' তারা বললে, 'ডাকবাংলায়।'

ডাকবাংলায় গিয়ে দেখি, সেখানে লোকের ভিড়—একটিমাত্র ছোটো ঘর খালি, তাতে আমাদের পাঁচজনকে পুরলে পঞ্চত্ব সুনিশ্চিত। সেখান থেকে সন্ধান করে অবশেষে গোয়ালন্দগামী স্টীমার-ঘাটে একটা জাহাজে আশ্রয় নেওয়া গেল। সেখানে প্রায় সমস্ত রাত বৌমা এবং কমলের ঘোরতর কাশি আর হাঁপানি। রাতটা এইরকম দুঃখে কাটল। পরদিনে প্রভাতে আকাশে ঘন মেঘ করে বৃষ্টি হতে লাগল। কথা আছে সকাল সাড়ে

সাতটার সময় মোটর-কোম্পানীর একটি মোটরগাড়ি এসে আমাদের বহন করে পাহাড়ে নিয়ে যাবে; সে-গাড়িখানা আর-এক জন আর-এক জায়গায় নিয়ে যাবে বলে ঠিক করে রেখেছিল। সেখানা না পেলে দুঃখ আরো নিবিড়তর হবে—তাই রথী গিয়ে নানা লোকের কাছে নানা কাকুতি মিনতি করে সেটা ঠিক করে এসেছেন। ভাড়া লাগবে একশো পঁচিশ টাকা—আমাদের সেই (হাতি কেনার চেয়ে বেশি।) যা হোক, পৌনে আটটার সময় গাড়ি এল—তখন বৃষ্টি থেমেছে। গাড়ি তো বায়ুবেগে চলল, কিছুদূরে গিয়ে দেখি, একখানা বড়ো মোটরের মালগাড়ি ভগ্ন অবস্থায় পথপার্শ্বে নিশ্চল হয়ে আছে। পূর্বদিনে আমাদের জিনিসপত্র এবং সাধুচরণকে নিয়ে এই গাড়ি রওনা হয়েছিল; এই পর্যন্ত এসে তিনি স্তব্ধ হয়েছেন। জিনিস তার মধ্যেই আছে, সাধু ভাগ্যক্রমে একটা প্যাসেঞ্জার গাড়ি পেয়ে চলে গেছে। (জিনিস রইল পড়ে, আমরা এগিয়ে চললুম।) বিদেশে, বিশেষত শীতের দেশে, জিনিসে-মানুষে বিচ্ছেদ সুখকর নয়। সইতে হল। যা হোক, শিলং-পাহাড়ে এসে দেখি, পাহাড়টা ঠিক আছে; আমাদের গ্রহ-বৈগুণ্যে বাঁকে নি, চোরে নি, নড়ে যায় নি; আমাদের জিওগ্রাফিতে তার যেখানে স্থান ঠিক সেই জায়গাটিতে সে স্থির দাঁড়িয়ে আছে। (দেখে আশ্চর্য বোধ হল, এখনো পাহাড়টা ঠিক আছে; তাই তোমাকে চিঠি লিখছি) কিন্তু আর বেশি লিখলে ডাক পাওয়া যাবে না। অতএব ইতি—

আশ্রমের রূপ ও বিকাশ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিলাইদহে পদ্মাতীরে সাহিত্যচর্চা নিয়ে নিভৃতে বাস করতুম। একটা সৃষ্টির সংকল্প নিয়ে সেখান থেকে এলেম শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে।

তখন আশ্রমের পরিধি ছিল ছোটো। তার দক্ষিণ সীমানায় দীর্ঘ সার-বাঁধা শালগাছ। মাধবীলতা-বিতানে প্রবেশের দ্বার। পিছনে পূব দিকে আমবাগান, পশ্চিম দিকে কোথাও-বা তাল, কোথাও-বা জাম, কোথাও-বা ঝাউ, ইতস্তত গুটিকয়েক নারকেল। উত্তরপশ্চিম প্রান্তে প্রাচীন দুটি ছাতিমের তলায় মার্বেল পাথরে বাঁধানো একটি নিরলংকৃত বেদী। তার সামনে গাছের আড়াল নেই, দিগন্ত পর্যন্ত অবারিত মাঠ, সে মাঠে তখনো চাষ পড়ে নি। উত্তর দিকে আমলকীবনের মধ্যে অতিথিদের জন্যে

দোতলা কোঠা আর তারই সংলগ্ন রান্নাবাড়ি প্রাচীন কদমগাছের ছায়ায়। আর একটি মাত্র পাকা বাড়ি ছিল একতলা, তারই মধ্যে ছিল পুরানো আমলের বাঁধানো তত্ত্ব-বোধিনী এবং আরো কিছু বইয়ের সংগ্রহ। এই বাড়িটিকেই পরে প্রশস্ত করে এবং এর উপরে আর একতলা চড়িয়ে বর্তমান গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। আশ্রমের বাইরে দক্ষিণের দিকে বাঁধ তখন ছিল বিস্তৃত এবং জলে ভরা। তার উত্তরের উঁচু পাড়িতে বহুকালের দীর্ঘ তালশ্রেণী। আশ্রম থেকে দেখা যেত বিনা বাধায়। আশ্রমের পূর্ব সীমানায় বোলপুরের দিকে ছায়াশূন্য রাঙামাটির রাস্তা গেছে চলে। সে রাস্তায় লোকচলাচল ছিল সামান্য। কেননা শহরে তখনো ভিড় জমে নি, বাড়ি ঘর সেখানে অল্পই। ধানের কল তখনো আকাশে মলিনতা ও আহার্যে রোগ বিস্তার করতে আরম্ভ করে নি। চারি দিকে বিরাজ করত বিপুল অবকাশ নীরব নিস্তব্ধ।

আশ্রমের রক্ষী ছিল বৃদ্ধ দ্বারী সর্দার, ঋজু দীর্ঘ প্রাণসার তার দেহ। হাতে তার লম্বা পাকাবাঁশের লাঠি, প্রথম বয়সের দস্যুবৃত্তির শেষ নিদর্শন। মালী ছিল হরিশ, দ্বারীর ছেলে। অতিথিভবনের একতলায় থাকতেন দ্বীপেন্দ্রনাথ তাঁর কয়েকজন অনুচর-পরিচর নিয়ে। আমি সস্ত্রীক আশ্রয় নিয়েছিলুম দোতলার ঘরে।

এই শান্ত জনবিরল শালগাবানে অল্প কয়েকটি ছেলে নিয়ে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সহায়তায় বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ করেছিলুম। আমার পড়াবার জায়গা ছিল প্রাচীন জামগাছের তলায়।

ছেলেদের কাছে বেতন নেওয়া হত না, তাদের যা-কিছু প্রয়োজন সমস্ত আমিই জুগিয়েছি। একটা কথা ভুলেছিলুম যে সেকালে রাজস্বের ষষ্ঠ ভাগের বরাদ্দ ছিল তপোবনে, আর আধুনিক চতুষ্পাঠীর অবলম্বন সামাজিক ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষে নিত্য-প্রবাহিত দানদক্ষিণা। অর্থাৎ এগুলি সমাজেরই অঙ্গ, এদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে কোনো ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র চেষ্টার প্রয়োজন ছিল না। অথচ আমার আশ্রম ছিল একমাত্র আমারই ক্ষীণ শক্তির উপরে নির্ভর করে। গুরুশিষ্যের মধ্যে আর্থিক দেনা-পাওনার সম্বন্ধ থাকা উচিত নয় এই মত একদা সত্য হয়েছিল যে সহজ উপায়ে, বর্তমান সমাজে সেটা প্রচলিত না থাকা সত্ত্বেও মতটাকে রক্ষা করবার চেষ্টা করতে গেলে কর্মকর্তার আত্মরক্ষা অসাধ্য হয়ে ওঠে, এই কথাটা অনেকদিন পর্যন্ত বহু দুঃখে আমার দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছে। আমার সুযোগ হয়েছিল এই যে, ব্রহ্মবান্ধব এবং তাঁর খৃষ্টান শিষ্য রেবাচাঁদ ছিলেন সন্ন্যাসী। এই কারণে অধ্যাপনার আর্থিক ও কর্ম-ভার লঘু হয়েছিল তাঁদের দ্বারা। এই প্রসঙ্গে আর-এক জনের কথা সর্বাপেক্ষা আমার মনে জাগছে, তাঁর কথা কোনোদিন ভুলতে পারি নে। গোড়া থেকে বলা যাক।

এই সময়ে দুটি তরুণ যুবক, তাঁদের বালক বললেই হয়, এসে পড়লেন আমার কাছে। অজিতকুমার চক্রবর্তী তাঁর বন্ধু কবি সতীশচন্দ্র রায়কে নিয়ে এলেন আমাদের

জোড়াসাঁকো বাড়িতে, আমার একতলার বসবার ঘরে। সতীশের বয়স তখন উনিশ, বি.এ. পরীক্ষা তাঁর আসন্ন। তার পূর্বে তাঁর একটি কবিতার খাতা অজিত আমাকে পড়বার জন্যে দিয়েছিলেন। পাতায় পাতায় খোলসা করেই জানাতে হয়েছে আমার মত। সব কথা অনুকূল ছিল না। আর কেউ হলে এমন বিস্তারিত বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হতুম না। সতীশের লেখা পড়ে বুঝেছিলুম তাঁর অল্প বয়সের রচনায় অসামান্যতা অনুজ্জ্বলভাবে প্রচ্ছন্ন। যাঁর ক্ষমতা নিঃসন্দিগ্ধ, দুটো একটা মিষ্ট কথায় তাঁকে বিদায় করা তাঁর অসম্মাননা। আমার মতের যে অংশ ছিল অপ্রিয় অজিত তাতে অসহিষ্ণু হয়েছিলেন, কিন্তু সৌম্যমূর্তি সতীশ স্বীকার করে নিয়েছিলেন প্রসন্নভাবে।

আমার মনের মধ্যে তখন আশ্রমের সংকল্পটা সব সময়েই ছিল মুখর হয়ে। কথা-প্রসঙ্গে তার একটা ভবিষ্যৎ ছবি আমি এঁদের সামনে উৎসাহের সঙ্গে উজ্জ্বল করে ধরেছিলুম। দীপ্তি দেখা দিল সতীশের মুখে। আমি তাঁকে আহ্বান করি নি আমার কাজে। আমি জানতুম তাঁর সামনে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরের দুই বড়ো ধাপ বাকি। তার শেষভাগে ছিল জীবিকার আশ্বাসবাণী আইন পরীক্ষায়।

একদিন সতীশ এসে বললেন, যদি আমাকে গ্রহণ করেন আমি যোগ দিতে চাই আপনার কাজে। আমি বললুম, পরীক্ষা দিয়ে পরে চিন্তা কোরো। সতীশ বললেন, দেব না পরীক্ষা। কারণ, পরীক্ষা দিলেই আত্মীয়স্বজনের ধাক্কায় সংসারযাত্রার ঢালু পথে আমাকে গড়িয়ে নিয়ে চলবে।

কিছুতে তাঁকে নিরস্ত করতে পারলে না। দারিদ্র্যের ভার অবহেলায় মাথায় করে নিয়ে যোগ দিলেন আশ্রমের কাজে। বেতন অস্বীকার করলেন। আমি তাঁর অগোচরে তাঁর পিতার কাছে যথাসাধ্য মাসিক বৃত্তি পাঠিয়ে দিতুম। তাঁর পরনে ছিল না জামা, একটা চাদর ছিল গায়ে, তার পরিধেয়তা জীর্ণ। যে ভাবরাজ্যে তিনি সঞ্চরণ করতেন সেখানে তাঁর জীবন পূর্ণ হত প্রতিক্ষণে প্রকৃতির রসভাণ্ডার থেকে। আত্মভোলা মানুষ, যখন তখন ঘুরে বেড়াতেন যেখানে সেখানে। প্রায় তার সঙ্গে থাকত ছেলেরা, চলতে চলতে তাঁর সাহিত্য-সম্ভোগের আস্বাদন পেত তারাও। সেই অল্প বয়সে ইংরেজি সাহিত্যে সুগভীর অভিনিবেশ তাঁর মতো আর কারও মধ্যে পাই নি। যে-সব ছাত্রকে পড়াবার ভার ছিল তাঁর 'পরে তারা ছিল নিতান্তই অর্বাচীন। ইংরেজি ভাষার সোপান-শ্রেণীর সব নীচেকার পইঠা পার করে দেওয়াই ছিল তাঁর কাজ, কিন্তু কেজো সীমার মধ্যে বদ্ধ সংকীর্ণ নৈপুণ্য ছিল না তাঁর মাস্টারিতে। সাহিত্যের তিনি রসজ্ঞ সাধক ছিলেন, সেইজন্যে তিনি যা পাঠ দিতেন তা জমা করবার নয়, তা হজম করবার, তা হয়ে উঠত ছেলেদের মনের খাদ্য। তিনি দিতেন তাদের মনকে অবগাহন-স্নান, তার গভীরতা অত্যাবশ্যকের চেয়ে অনেক বেশি। ভাষাশিক্ষার মধ্যে একটা অনিবার্য শাসন থাকে, সেই শাসনকে অতিক্রম করে দিতে পারতেন সাহিত্যের উদার মুক্তি, এক বৎসরের

মধ্যে হল তাঁর মৃত্যু। তার বেদনা আজও রয়ে গেছে আমার মনে। আশ্রমে যারা শিক্ষক হবে তারা মুখ্যত হবে সাধক, আমার এই কল্পনাটি সম্পূর্ণ সত্য করেছিলেন সতীশ।

তার পরের পর্বে এসেছিলেন জগদানন্দ। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল সাধনা পত্রে তাঁর প্রেরিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পড়ে। এই-সকল প্রবন্ধের প্রাঞ্জল ভাষা ও সহজ বক্তব্যপ্রণালী দেখে তাঁর প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হয়েছিল। তাঁর সাংসারিক অভাব মোচনের জন্য আমি তাঁকে প্রথমে আমাদের জমিদারির কাজে নিযুক্ত করেছিলাম। তার প্রধান কারণ জমিদারি-দপ্তরে বেতনের কৃপণতা ছিল না। কিন্তু তাঁকে এই অযোগ্য আসনে বন্দী করে রাখতে আমার মনে বেদনা দিতে লাগল। আমি তাঁকে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনার কাজে আমন্ত্রণ করলুম। যদিও এই কার্যে আয়ের পরিমাণ অল্প ছিল তবুও আনন্দের পরিমাণ তাঁর পক্ষে ছিল প্রচুর। তার কারণ শিক্ষাদানে তাঁর স্বভাবের ছিল অকৃত্রিম তৃপ্তি। ছাত্রদের কাজে সর্বতোভাবে আত্মদানে তাঁর একটুও কৃপণতা ছিল না। সুগভীর করুণা ছিল বালকদের প্রতি। শাস্তি উপলক্ষেও তাদের প্রতি লেশমাত্র নির্মমতা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। একজন ছাত্রকে কোনো শিক্ষক তার একবেলার আহার বন্ধ করে দণ্ডবিধান করেছিলেন। এই শাসনবিধির নিষ্ঠুরতায় তাঁকে অশ্রু বর্ষণ করতে দেখেছি। তাঁর বিজ্ঞানের ভাণ্ডার খোলা ছিল ছাত্রদের সম্মুখে যদিও তা তাদের পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্গত ছিল না। এই আত্মদানের অকার্পণ্য যথার্থ শিক্ষকের যথার্থ পরিচয়। তিনি আপনার আসনকে কখনো ছাত্রদের কাছ থেকে দূরে রাখেন নি। আত্মমর্যাদার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টায় তিনি ছাত্রদের সেবায় কখনো লাইন টেনে চলতেন না। তাঁর অধ্যাপকের উচ্চ অধিকার তাঁর সদয় ব্যবহারের আবরণে কখনো অতিপ্রত্যক্ষ ছিল না। বস্তুত সকল বিষয়েই তিনি ছেলেদের সখা ছিলেন। তাঁর ক্লাসে গণিতশিক্ষায় কোনো ছাত্র কিছুমাত্র পিছিয়ে পড়ে পরীক্ষায় যদি অকৃতার্থ হত সে তাঁকে অত্যন্ত আঘাত করত। শিক্ষার উচ্চ আদর্শ রক্ষার জন্য তাঁর অক্লান্ত চেষ্টা ছিল। অমনোযোগী বালকদের প্রতি তাঁর তর্জন গর্জন শুনতে অতিশয় ভয়জনক ছিল কিন্তু তাঁর স্নেহ তাঁর ভর্ৎসনাকে ভিতরে ভিতরে প্রতিবাদ করে চলত, ছাত্ররা তা প্রত্যহ অনুভব করেছে। যে শিক্ষকেরা আশ্রমের সৃষ্টিকার্যে আপনাকে সর্বতোভাবে উৎসর্গ করেছিলেন, জগদানন্দ তার মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁর অভাব ও বেদনা আশ্রম কদাচ ভুলতে পারবে না।

সতীশের বন্ধু অজিতকুমার যথার্থ শিক্ষকের পদে উচ্চ স্থান অধিকার করে-ছিলেন। তাঁর বিদ্যা ছিল ইংরেজি সাহিত্যে ও দর্শনে বহুব্যাপ্ত। এই জ্ঞানের রাজ্যে তিনি ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের ছাত্র। তিনিও নির্বিচারে ছাত্রদের কাছে তাঁর জ্ঞানের সঞ্চয় উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তাঁর ছাত্রেরা সর্বদাই তাঁর শিক্ষকতা থেকে উচ্চ অঙ্গের সাহিত্যরস আস্বাদনের অবকাশ পেয়েছিল। যদিও তাদের বয়স অল্প ও যোগ্যতার

সীমা সংকীর্ণ তবুও তিনি কখনো তাদের কাছ থেকে নিজের পদের অভিমানে নির্লিপ্ত ছিলেন না। সতীশের মতো দারিদ্র্যে তাঁর ঔদাসীন্য ছিল না তবুও তিনি তা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আমাদের আশ্রম-নির্মাণ-কার্যে ইনি একজন নিপুণ স্থপতি ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

মাঝখানে অতি অল্প সময়ের জন্য এসেছিলেন আমার এক আত্মোৎসর্গপরায়ণ বন্ধু মোহিতচন্দ্র সেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সেখানকার খ্যাতি-প্রতিপত্তি সমস্ত ত্যাগ করে যোগ দিয়েছিলেন শিক্ষার এমন নিম্ন স্তরে লোকখ্যাতির দিক থেকে যা তাঁর যোগ্য ছিল না। কিন্তু তাতেই তিনি প্রভূত আনন্দ পেয়েছিলেন। কারণ শিক্ষকতা ছিল তাঁর স্বভাবসংগত। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়ে শিক্ষাব্রত অকালে সমাপ্ত হয়ে গেল। তাঁর অকৃপণতা ছিল আর্থিক দিকে এবং পারমার্থিক দিকে। প্রথম যেদিন আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল সেদিন তিনি আশ্রমের আদর্শের সম্বন্ধে যে সম্মান প্রকাশ করেছিলেন আমার আনন্দের পক্ষে তাই যথেষ্ট ছিল। অবশেষে বিদায় নেবার সময়ে তিনি বললেন, যদি আমি আপনার এখানকার কাজে যোগদান করতে পারতুম তবে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করতুম। কিন্তু সম্প্রতি তা সম্ভব না হওয়াতে কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধার অঞ্জলি দান করে গেলুম। এই বলে আমার হাতে একটি কাগজের মোড়ক দিয়ে গেলেন। পরে খুলে দেখলেম হাজার টাকার একখানি নোট। পরীক্ষকরূপে যা পেয়েছিলেন সমস্তই তিনি তাঁর শ্রদ্ধার নিদর্শনরূপে দান করে গেলেন। কিন্তু কেবল সেই একদিনের দান নয়, তার পর থেকে প্রতিদিন তিনি নিবেদন করেছেন তাঁর শ্রদ্ধার অর্ঘ্য একান্ত অনুপযুক্ত বেতন রূপে।

এঁদের অনেক পরে আশ্রমের সাধনাক্ষেত্রে দেখা দিলেন নন্দলাল। ছোটো বড়ো সমস্ত ছাত্রের সঙ্গে এই প্রতিভাসম্পন্ন আর্টিস্টের একাত্মতা অতি আশ্চর্য। তাঁর আত্মদান কেবলমাত্র শিক্ষকতায় নয়, সর্বপ্রকার বদান্যতায়। ছাত্রদের রোগে, শোকে, অভাবে তিনি তাদের অকৃত্রিম বন্ধু। তাঁকে যারা শিল্পশিক্ষা উপলক্ষে কাছে পেয়েছে তারা ধন্য হয়েছে।

তার পর থেকে নানা কর্মী, নানা বন্ধু আশ্রমের সাধনাক্ষেত্রে সমবেত হয়েছেন এবং আপন আপন শক্তি ও স্বভাবের বিশিষ্টতা অনুসারে আশ্রমের গঠনকার্যে ক্রমশ বিচিত্র উপকরণ যুগিয়ে এসেছেন। সৃষ্টিকার্যে এই বৈচিত্র্যের প্রয়োজন আছে। নতুন নতুন কালের প্রেরণায় নতুন নতুন রূপ আপনাকে ব্যক্ত করতে থাকে এবং এই উপায়েই কালের সামঞ্জস্য রক্ষা করে তবে সে আপনার শক্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। সেই পরিবর্তমান আদর্শের অনুবৃত্তির দ্বারা পুরাতন কালের ভিত্তির উপরেই নতুন কালের সৃষ্টি সম্পূর্ণতা লাভ করে। এই নিয়ে কোনো আক্ষেপ করা বৃথা। বস্তুত প্রাচীন কালের ছন্দে নতুনকাল তাল ভঙ্গ করলে সৃষ্টির সংগতি রক্ষা হয় না।

বলাই

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মানুষের জীবনটা পৃথিবীর নানা জীবের ইতিহাসের নানা পরিচ্ছেদের উপসংহারে, এমন একটা কথা আছে। লোকালয়ে মানুষের মধ্যে আমরা নানা জীবজন্তুর প্রচ্ছন্ন পরিচয় পেয়ে থাকি, সে কথা জানা। বস্তুত আমরা মানুষ বলি সেই পদার্থকে যেটা আমাদের ভিতরকার সব জীবজন্তুকে মিলিয়ে এক ক'রে নিয়েছে—আমাদের বাঘ-গোরুকে এক খোঁয়াড়ে দিয়েছে পুরে, অহি-নকুলকে এক খাঁচায় ধ'রে রেখেছে। যেমন, রাগিণী বলি তাকেই যা আপনার ভিতরকার সমুদয় সা-রে-গা-মা-গুলোকে সংগীত ক'রে তোলে—তার পর থেকে তাদের আর গোলমাল করবার সাধ্য থাকে না—কিন্তু, সংগীতের ভিতরে এক-একটি সুর অন্য-সকল সুরকে ছাড়িয়ে বিশেষ হয়ে ওঠে, কোনোটাতে মধ্যম, কোনোটাতে কোমলগান্ধার, কোনোটাতে পঞ্চম।

আমার ভাইপো বলাই—তার প্রকৃতিতে কেমন করে গাছপালার মূল সুরগুলোই হয়েছে প্রবল। ছেলেবেলা থেকে চুপচাপ চেয়ে চেয়ে দেখাই তার অভ্যাস, ন'ড়েচ'ড়ে বেড়ানো নয়। পূব দিকের আকাশে কালো মেঘ স্তরে স্তরে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ায়, ওর সমস্ত মনটাতে ভিজে হাওয়া যেন শ্রাবণ-অরণ্যের গন্ধ নিয়ে ঘনিয়ে ওঠে; ঝম্ ঝম্ ক'রে বৃষ্টি পড়ে, ওর সমস্ত গা যেন শুনতে পায় সেই বৃষ্টির শব্দ। ছাদের উপর বিকেলবেলাকার রোদ্দুর প'ড়ে আসে, গা খুলে বেড়ায়; সমস্ত আকাশ থেকে যেন কী-একটা সংগ্রহ ক'রে নেয়। মাঘের শেষে আমের বোল ধরে, তার একটা নিবিড় আনন্দ জেগে ওঠে ওর রক্তের মধ্যে, একটা কিসের অব্যক্ত স্মৃতিতে; ফাল্গুনে পুষ্পিত শালবনের মতোই ওর অন্তর-প্রকৃতিটা চার দিকে বিস্তৃত হয়ে ওঠে, ভ'রে ওঠে। তাতে একটা ঘন রঙ লাগে। তখন ওর একলা ব'সে ব'সে আপন মনে কথা কইতে ইচ্ছা করে, যা-কিছু গল্প শুনেছে সব নিয়ে জোড়াতাড়া দিয়ে; অতি পুরানো বটের কোটরে বাসা বেঁধে আছে যে এক-জোড়া অতি পুরানো পাখি, বেঙ্গমা-বেঙ্গমী, তাদের গল্প। ঐ ড্যাবা-ড্যাবা-চোখ-মেলে-সর্বদা-তাকিয়ে-থাকা ছেলেটা বেশি কথা কইতে পারে না। তাই ওকে মনে মনে অনেক বেশি ভাবতে হয়। ওকে একবার পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছিলুম। আমাদের বাড়ির সামনে ঘন সবুজ ঘাস পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নীচে পর্যন্ত নেবে গিয়েছে, সেইটে দেখে আর ওর মন ভারি খুশি হয়ে ওঠে। ঘাসের আস্তরণটা একটা স্থির পদার্থ তা ওর মনে হয় না; ওর বোধ হয়, যেন, ঐ ঘাসের পুঞ্জ একটা গড়িয়েচলা খেলা, কেবলই গড়াচ্ছে। প্রায়ই তারই সেই ঢালু বেয়ে ও নিজেও গড়াত—সমস্ত দেহ দিয়ে ঘাস হয়ে উঠত—গড়াতে গড়াতে ঘাসের আগায় ওর ঘাড়ের

কাছে সুড়্‌সুড়ি লাগত আর ও খিল্‌ খিল্‌ ক'রে হেসে উঠত।

রাত্রে বৃষ্টির পরে প্রথম সকালে সামনের পাহাড়ের শিখর দিয়ে কাঁচা সোনারঙের রোদ্দুর দেবদারুবনের উপরে এসে পড়ে—ও কাউকে না বলে আস্তে আস্তে গিয়ে সেই দেবদারুবনের নিস্তব্ধ ছায়াতলে একলা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, গা ছম্‌ছম্‌ করে—এই-সব প্রকাণ্ড গাছের ভিতরকার মানুষকে ও যেন দেখতে পায়; তারা কথা কয় না, কিন্তু সমস্তই যেন জানে। তারা-সব যেন অনেক কালের দাদামশায়, 'এক যে ছিল রাজা'দের আমলের।

ওর ভাবে-ভোলা চোখটা কেবল যে উপরের দিকেই তা নয়, অনেক সময় দেখেছি, ও আমার বাগানে বেড়াচ্ছে মাটির দিকে কী খুঁজে খুঁজে। নতুন অঙ্কুরগুলো তাদের কোঁক্‌ড়ানো মাথাটুকু নিয়ে আলোতে ফুটে উঠছে এই দেখতে তার ঔৎসুক্যের সীমা নেই। প্রতিদিন ঝুঁকে প'ড়ে প'ড়ে তাদেরকে যেন জিজ্ঞাসা করে, 'তার পরে? তার পরে? তার পরে?' তারা ওর চির-অসমাপ্ত গল্প। সদ্য-গজিয়ে-ওঠা কচি কচি পাতা, তাদের সঙ্গে ওর কী-যে একটা বয়স্যভাব তা ও কেমন ক'রে প্রকাশ করবে। তারাও ওকে কী-একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার জন্য আঁকুপাঁকু করে। হয়তো বলে 'তোমার নাম কী', হয়তো বলে 'তোমার মা কোথায় গেল'। বলাই মনে মনে উত্তর করে, 'আমার মা তো নেই'।

কেউ গাছের ফুল তোলে এইটে ওর বড়ো বাজে। আর-কারও কাছে ওর এই সংকোচের কোনো মানে নেই, এটাও সে বুঝেছে। এইজন্যে ব্যথাটা লুকোতে চেষ্টা করে। ওর বয়সের ছেলেগুলো গাছে ঢিল মেরে মেরে আমলকী পাড়ে; ও কিছু বলতে পারে না, সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে চ'লে যায়। ওর সঙ্গীরা ওকে খ্যাপাবার জন্যে বাগানের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে ছড়ি দিয়ে দু পাশের গাছগুলোকে মারতে মারতে চলে, ফস্‌ ক'রে বকুলগাছের একটা ডাল ভেঙে নেয়—ওর কাঁদতে লজ্জা করে, পাছে সেটাকে কেউ পাগলামি মনে করে। ওর সব চেয়ে বিপদের দিন, যেদিন ঘাসিয়াড়া ঘাস কাটতে আসে। কেন না, ঘাসের ভিতরে ভিতরে ও প্রত্যহ দেখে দেখে বেড়িয়েছে—এতটুকু-টুকু লতা, বেগনি হল্‌দে নামহারা ফুল, অতি ছোটো ছোটো; মাঝে মাঝে কন্টিকারি গাছ, তার নীল নীল ফুলের বুকের মাঝখানিটিতে ছোট্ট একটুখানি সোনার ফোঁটা; বেড়ার কাছে কাছে কোথাও বা কালমেঘের লতা, কোথাও বা অনন্তমূল; পাখিতে-খাওয়া নিম ফলের বিচি প'ড়ে ছোটো ছোটো চারা বেরিয়েছে, কী সুন্দর তার পাতা—সমস্তই নিষ্ঠুর নিড়ানি দিয়ে দিয়ে নিড়িয়ে ফেলা হয়। তারা বাগানের শৌখিন গাছ নয়, তাদের নালিশ শোনবার কেউ নেই।

এক-একদিন ওর কাকির কোলে এসে ব'সে তার গলা জড়িয়ে বলে, "ঐ ঘাসিয়াড়াকে বলো-না, আমার গাছগুলো যেন না কাটে।"

কাকি বলে, "বলাই, কী যে পাগলের মতো বকিস। ও যে সব জঙ্গল, সাফ না করলে চলবে কেন?"

বলাই অনেক দিন থেকে বুঝতে পেরেছিল, কতকগুলো ব্যথা আছে যা সম্পূর্ণ ওর একলারই—ওর চারি দিকের লোকের মধ্যে তার কোনো সাড়া নেই।

এই ছেলের আসল বয়স সেই কোটি বৎসর আগেকার দিনে যেদিন সমুদ্রের গর্ভ থেকে নতুন-জাগা পঙ্কস্তরের মধ্যে পৃথিবীর ভাবী অরণ্য আপনার জন্মের প্রথম ক্রন্দন উঠিয়েছে—সেদিন পশু নেই, পাখি নেই, জীবনের কলরব নেই, চারি দিকে পাথর আর পাঁক আর জল। কালের পথে সমস্ত জীবের অগ্রগামী গাছ, সূর্যের দিকে জোড় হাত তুলে বলেছে, 'আমি থাকব, আমি বাঁচব, আমি চিরপথিক, মৃত্যুর পর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অন্তহীন প্রাণের বিকাশতীর্থে যাত্রা করব রৌদ্রে-বাদলে—দিনে-রাত্রে।' গাছের সেই রব আজও উঠছে বনে বনে পর্বতে প্রান্তরে; তাদেরই শাখায় পত্রে ধরণীর প্রাণ ব'লে ব'লে উঠছে, 'আমি থাকব, আমি থাকব।' বিশ্বপ্রাণের মূক ধাত্রী এই গাছ নিরবচ্ছিন্ন কাল ধ'রে দ্যুলোককে দোহন ক'রে পৃথিবীর অমৃত-ভাণ্ডারের জন্যে প্রাণের তেজ, প্রাণের রস, প্রাণের লাবণ্য সঞ্চয় করে; আর উৎকণ্ঠিত প্রাণের বাণীকে অহর্নিশি আকাশে উচ্ছ্বসিত ক'রে তোলে, 'আমি থাকব।' সেই বিশ্বপ্রাণের বাণী কেমন-এক-রকম ক'রে আপনার রক্তের মধ্যে শুনতে পেয়েছিল ঐ বলাই। আমরা তাই নিয়ে খুব হেসেছিলুম।

একদিন সকালে একমনে খবরের কাগজ পড়ছি, বলাই আমাকে ব্যস্ত ক'রে ধ'রে নিয়ে গেল বাগানে। এক জায়গায় একটা চারা দেখিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, "কাকা, এ গাছটা কী?"

দেখলুম একটা শিমুলগাছের চারা বাগানের খোওয়া-দেওয়া রাস্তায় মাঝখানেই উঠেছে।

হায় রে, বলাই ভুল করেছিল আমাকে ডেকে নিয়ে এসে। এতটুকু যখন এর অঙ্কুর বেরিয়েছিল, শিশুর প্রথম প্রলাপটুকুর মতো, তখনই এটা বলাইয়ের চোখে পড়েছে। তার পর থেকে বলাই প্রতিদিন নিজের হাতে একটু একটু জল দিয়েছে, সকালে বিকেলে ক্রমাগতই ব্যগ্র হয়ে দেখেছে কতটুকু বাড়ল। শিমুলগাছ বাড়েও দ্রুত, কিন্তু বলাইয়ের আগ্রহের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। যখন হাত-দুয়েক উঁচু হয়েছে, তখন ওর পত্রসমৃদ্ধি দেখে ভাবলে এ একটা আশ্চর্য গাছ, শিশুর প্রথম বুদ্ধির আভাস দেখবা মাত্র মা যেমন মনে করে—আশ্চর্য শিশু। বলাই ভাবলে, আমাকেও চমৎকৃত ক'রে দেবে।

আমি বললুম, "মালীকে বলতে হবে, এটা উপড়ে ফেলে দেবে।"

বলাই চমকে উঠল। এ কী দারুণ কথা! বললে, "না, কাকা, তোমার দুটি পায় পড়ি, উপড়ে ফেলো না।"

আমি বললুম, "কী যে বলিস তার ঠিক নেই। একেবারে রাস্তার মাঝখানে উঠেছে। বড়ো হলে চারি দিকে তুলো ছড়িয়ে অস্থির ক'রে দেবে।"

আমার সঙ্গে যখন পারলে না, এই মাতৃহীন শিশুটি গেল তার কাকির কাছে। কোলে ব'সে তার গলা জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে, "কাকি, তুমি কাকাকে বারণ ক'রে দাও, গাছটা যেন না কাটেন।"

উপায়টা ঠিক ঠাওরেছিল। ওর কাকি আমাকে ডেকে বললে, "ওগো, শুনছ! আহা, ওর গাছটা রেখে দাও।"

রেখে দিলুম। গোড়ায় বলাই না যদি দেখাত তবে হয়তো ওটা আমার লক্ষ্যই হত না। কিন্তু, এখন রোজই চোখে পড়ে। বছর-খানেকের মধ্যে গাছটা নির্লজ্জের মতো মস্ত বেড়ে উঠল। বলাইয়ের এমন হল, এই গাছটার 'পরেই তার সব চেয়ে স্নেহ।

গাছটাকে প্রতিদিনই দেখাচ্ছে নিতান্ত নির্বোধের মতো। একটা অজায়গায় এসে দাঁড়িয়ে কাউকে খাতির নেই, একেবারে খাড়া লম্বা হয়ে উঠছে। যে দেখে সেই ভাবে, এটা এখানে কী করতে। আরও দু-চারবার এর মৃত্যুদণ্ডের প্রস্তাব করা গেল। বলাইকে লোভ দেখালুম, এর বদলে খুব ভালো কতকগুলো গোলাপের চারা আনিয়ে দেব।

বললেম, "নিতান্তই শিমুলগাছই যদি তোমার পছন্দ, তবে আর-একটা চারা আনিয়ে বেড়ার ধারে পুঁতে দেব, সুন্দর দেখতে হবে।"

কিন্তু কাটবার কথা বললেই বলাই আঁৎকে ওঠে, আর ওর কাকি বলে, "আহা, এমনিই কী খারাপ দেখতে হয়েছে।"

আমার বৌদিদির মৃত্যু হয়েছে—যখন এই ছেলেটি তাঁর কোলে। বোধ করি সেই শোকে দাদার খেয়াল গেল, তিনি বিলেতে এঞ্জিনিয়ারিং শিখতে গেলেন। ছেলেটি আমার নিঃসন্তান ঘরে কাকির কোলেই মানুষ। বছর-দশেক পরে দাদা ফিরে এসে বলাইকে বিলাতি কায়দায় শিক্ষা দেবেন ব'লে প্রথমে নিয়ে গেলেন সিমলেয়—তার পরে বিলেত নিয়ে যাবার কথা।

কাঁদতে কাঁদতে কাকির কোল ছেড়ে বলাই চলে গেল, আমাদের ঘর হল শূন্য।

তার পরে দু বছর যায়। ইতিমধ্যে বলাইয়ের কাকি গোপনে চোখের জল মোছেন, আর বলাইয়ের শূন্য শোবার ঘরে গিয়ে তার ছেঁড়া এক-পাটি জুতো, তার রবারের ফাটা গোলা, আর জানোয়ারের গল্পওয়ালা ছবির বই নাড়েন-চাড়েন; এত দিনে এই-সব চিহ্নকে ছাড়িয়ে গিয়ে বলাই অনেক বড়ো হয়ে উঠেছে, এই কথা ব'সে ব'সে চিন্তা করেন।

কোনো-এক সময়ে দেখলুম, লক্ষ্মীছাড়া শিমুলগাছটার বড়ো বাড় বেড়েছে— এতদূর অসংগত হয়ে উঠেছে যে আর প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। এক সময়ে দিলুম তাকে কেটে।

এমন সময়ে সিমলে থেকে বলাই তার কাকিকে এক চিঠি পাঠালে, "কাকি, আমার সেই শিমুলগাছের একটা ফোটোগ্রাফ পাঠিয়ে দাও।"

বিলেত যাবার পূর্বে একবার আমাদের কাছে আসবার কথা ছিল, সে আর হল না। তাই বলাই তার বন্ধুর ছবি নিয়ে যেতে চাইলে।

তার কাকি আমাকে ডেকে বললেন, "ওগো, শুনছ, একজন ফোটোগ্রাফওয়ালা ডেকে আনো।"

জিজ্ঞাসা করলুম, "কেন!"

বলাইয়ের কাঁচা হাতের লেখা চিঠি আমাকে দেখতে দিলেন।

আমি বললেম, "সে গাছ তো কাটা হয়ে গেছে।"

বলাইয়ের কাকি দুদিন অন্ন গ্রহণ করলেন না, আর অনেক দিন পর্যন্ত আমার সঙ্গে একটি কথাও কন নি। বলাইয়ের বাবা ওকে তাঁর কোল থেকে নিয়ে গেল, সে যেন ও'র নাড়ী ছিঁড়ে; আর ওর কাকা তাঁর বলাইয়ের ভালোবাসার গাছটিকে চিরকালের মতো সরিয়ে দিলে, তাতেও ও'র যেন সমস্ত সংসারকে বাজল, তাঁর বুকের মধ্যে ক্ষত ক'রে দিলে।

ঐ গাছ যে ছিল তাঁর বলাইয়ের প্রতিরূপ, তারই প্রাণের দোসর।

গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল

স্বামী বিবেকানন্দ

বাণিজ্যযাত্রী জাহাজের গড়ন অন্য ঢঙের। যদিও কোনো কোনো বাণিজ্য-জাহাজ এমন ঢঙে তৈয়ার যে, লড়াইয়ের সময় অত্যল্প আয়াসেই দু-চারটা তোপ বসিয়ে অন্যান্য নিরস্ত্র পণ্যপোতকে তাড়াহুড়ো দিতে পারে এবং তজ্জন্য ভিন্ন ভিন্ন সরকার হতে সাহায্য পায়, তথাপি সাধারণতঃ সমস্তগুলিই যুদ্ধপোত হতে অনেক তফাত। এ-সকল জাহাজ প্রায়ই এমন বাষ্পপোত এবং প্রায় এত বৃহৎ ও এত দাম লাগে যে, কোম্পানি ভিন্ন একলার জাহাজ নাই বললেই হয়। আমাদের দেশের ও ইউরোপের বাণিজ্যে

পি. এন্ড. ও. কোম্পানি সকলের অপেক্ষা প্রাচীন ও ধনী; তার পর, পি. আই. এস. এন. কোম্পানি; আরও অনেক কোম্পানি আছে। ভিন্ন সরকারের মধ্যে মেসাজারি মারিতীম Messageries Maritimes) ফরাসী, অস্ট্রিয়ান লয়েড, জার্মান লয়েড এবং ইতালিয়ান রুবাটিনো কোম্পানি প্রসিদ্ধ। এতন্মধ্যে পি. এন্ড ও. কোম্পানি যাত্রী জাহাজ সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ও ক্ষিপ্রগামী—লোকের এই ধারণা। মেসাজারির ভক্ষ্য-ভোজ্যের বড়োই পারিপাট্য।

এবার আমরা যখন আসি, তখন ঐ দুই কোম্পানিই প্লেগের ভয়ে কালা আদমী নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। এবং আমাদের সরকারের একটা আইন আছে যে, যেন কোনো কালা আদমী এমিগ্রান্ট অফিসের সার্টিফিকেট ভিন্ন বাহিরে না যায়। অর্থাৎ আমি যে স্ব-ইচ্ছায় বিদেশে যাচ্ছি, কেউ আমায় ভুলিয়ে-ভালিয়ে কোথাও বেচবার জন্য বা কুলী করবার জন্য নিয়ে যাচ্ছে না, এইটি তিনি লিখে দিলে তবে জাহাজে আমায় নিলে। এই আইন এতদিন ভদ্রলোকের বিদেশে যাওয়ার পক্ষে নীরব ছিল, এক্ষণে প্লেগের ভয়ে জেগে উঠেছে; অর্থাৎ যে কেউ 'নেটিভ' বাহিরে যাচ্ছে, তা যেন সরকার টের পান। তবে আমরা দেশে শুনি, আমাদের ভেতর অমুক ভদ্র জাত, অমুক ছোটো জাত; সরকারের কাছে সব 'নেটিভ'। মহারাজা, রাজা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—সব এক জাত—'নেটিভ'। কুলীর আইন, কুলীর যে পরীক্ষা, তা সকল 'নেটিভে'র জন্য—ধন্য ইংরেজ সরকার! এক ক্ষণের জন্যও তোমার কৃপায় সব 'নেটিভে'র সঙ্গে সমত্ব বোধ করলেম। বিশেষ, কায়স্থকুলে এ শরীরের পয়দা হওয়ায়, আমি তো চোরের দায়ে ধরা পড়েছি।

এখন সকল জাতির মুখে শুনছি, তাঁরা নাকি পাকা আর্য! তবে পরস্পরের মধ্যে মতভেদ আছে,—কেউ চার পো আর্য, কেউ এক ছটাক কম, কেউ আধ কাঁচ্চা! তবে সকলেই আমাদের পোড়া জাতের চেয়ে বড়ো, এতে একবাক্য! আর শুনি, ওঁরা আর ইংরেজরা নাকি এক জাত, মাসতুতো ভাই; ওঁরা কালা আদমী নন। এ দেশে দয়া করে এসেছেন, ইংরেজের মতো। আর বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, মূর্তিপূজা, সতীদাহ, জেনানা পরদা ইত্যাদি ইত্যাদি ও-সব ওঁদের ধর্মে আদৌ নাই। ও-সব ঐ কায়েত-ফায়েতের বাপ-দাদা করেছে। আর ওঁদের ধর্মটা ঠিক ইংরেজদের ধর্মের মতো। ওঁদের বাপ-দাদা ঠিক ইংরেজদের মতো ছিল; কেবল রোদ্দুরে বেড়িয়ে বেড়িয়ে কালো হয়ে গেল! এখন এসো-না এগিয়ে? 'সব নেটিভ' সরকার বলছেন। ও কালোর মধ্যে আবার এক-পোঁচ কম-বেশি বোঝা যায় না; সরকার বলছেন, সব নেটিভ। সেজেগুজে বসে থাকলে কি হবে বল? ও টুপি-টাপা মাথায় দিয়ে আর কি হবে বল? যত দোষ হিঁদুর ঘাড়ে ফেলে সাহেবের গা ঘেঁষে দাঁড়াতে গেলে, লাথি-ঝাঁটার চোটটা বেশি বই কম পড়বে না। ধন্য ইংরেজরাজ। তোমার ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ তো হয়েছেই, আরও হোক, আরও

হোক। কপনি, ধুতির টুকরো পরে বাঁচি। তোমার কৃপায় শুধু-পায়ে শুধু-মাথায় হিল্লি-দিল্লি যাই; তোমার দয়ার হাত চুবড়ে সপাসপ দাল-ভাত খাই। দিশি সাহেবিত্ব লুভিয়েছিল আর কি, ভোগা দিয়েছিল আর কি। দিশি কাপড় ছাড়লেই, দিশি ধর্ম ছাড়লেই, দিশি চাল-চলন ছাড়লেই ইংরেজ রাজা মাথায় করে নাকি নাচবে শুনেছিলুম, করতেও যাই আর কি, এমন সময় গোরা পায়ের সবুট লাথির হুড়োহুড়ি, চাবুকের সপাসপ! পালা পালা, সাহেবিতে কাজ নেই, নেটিভ কব্‌লা। 'সাধ করে শিখেছিনু সাহেবানি কত, গোরার বুটের তলে সব হৈল হত।' ধন্য ইংরেজ সরকার! তোমার 'তখ্‌ৎ তাজ অচল রাজধানী' হউক।

আর যা-কিছু সাহেব হবার সাধ ছিল, মিটিয়ে দিলে মার্কিন ঠাকুর। দাড়ির জ্বালায় অস্থির, কিন্তু নাপিতের দোকানে ঢোকবামাত্রই বললে, 'ও চেহারা এখানে চলবে না! মনে করলুম, বুঝি পাগড়ি-মাথায় গেরুয়া রঙের বিচিত্র ধোকড়া-মন্ত্র গায়, অপরূপ দেখে নাপিতের পছন্দ হল না; তা একটা ইংরেজি কোট আর টোপা কিনে আনি। আনি আর কি—ভাগ্যিস একটি ভদ্র মার্কিনের সঙ্গে দেখা; সে বুঝিয়ে দিলে যে বরং ধোকড়া আছে ভালো, ভদ্রলোকে কিছু বলবে না, কিন্তু ইউরোপী পোশাক পরলেই মুশকিল, সকলেই তাড়া দেবে। আরও দু-একটি নাপিত ঐ প্রকার রাস্তা দেখিয়ে দিলে। তখন নিজের হাতে কামাতে ধরলুম। খিদেয় পেট জ্বলে যায়, খাবার দোকানে গেলুম, 'অমুক জিনিসটা দাও;' বললে 'নেই!' 'ঐ যে রয়েছে।' 'ওহে বাপু, সাদা ভাষা হচ্ছে, তোমার এখানে বসে খাবার জায়গা নেই।' 'কেন হে বাপু?' 'তোমার সঙ্গে যে খাবে, তার জাত যাবে।' তখন অনেকটা মার্কিন মুলুককে দেশের মতো ভালো লাগতে লাগল। যাক পাপ কালা আর ধলা, আর এই নেটিভের মধ্যে উনি পাঁচ পো আর্য রক্ত, উনি চার পো, উনি দেড় ছটাক কম, ইনি আধ ছটাক, আধ কাঁচ্চা বেশি ইত্যাদি—বলে 'ছুঁচোর গোলাম চামচিকে, তার মাইনে চোদ্দ সিকে'। একটা ডোম বলত, 'আমাদের চেয়ে বড়ো জাত কি আর দুনিয়ায় আছে? আমরা হচ্ছি ডম্‌ম্‌ম্‌ম্‌।' কিন্তু মজাটি দেখেছ? জাতের বেশি বিটলেমিগুলো—যেখানে গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল, সেইখানে!

রণক্ষেত্রে ভ্রাতৃমিলন

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

[স্থান—হল্‌দিঘাট সমরাঙ্গণ। কাল—অপরাহ্ণ,
অশ্বারূঢ় সশস্ত্র প্রতাপ ও সর্দ্দারগণ]

[উন্মুক্ত তরবারি হস্তে সেলিম প্রবেশ করিলেন—]

সেলিম। তুমি প্রতাপসিংহ?

প্রতাপ। আমি প্রতাপসিংহ।

সেলিম। আমি সেলিম! —যুদ্ধ কর।

প্রতাপ। তুমি সাহসী বটে সেলিম! যুদ্ধ কর!

[উভয়ে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন—সেলিম হঠিয়া যাইতে লাগিলেন। এই সময়ে মহাবৎ পিছন হইতে আসিয়া সসৈন্যে প্রতাপকে আক্রমণ করিলেন ও সেলিম যুদ্ধাঙ্গন হইতে অপসৃত হইলেন।]

"কে কুলাঙ্গার মহাবৎ?"

[এই বলিয়া প্রতাপ চক্ষু ঢাকিলেন]

"হাঁ প্রতাপ!"

[এই বলিয়া মহাবৎ প্রতাপকে সসৈন্যে আক্রমণ করিলেন। ইত্যবসরে আর একদল সৈন্য আসিয়া পিছন দিক হইতে প্রতাপকে আক্রমণ করিল! প্রতাপ ক্ষত-বিক্ষত হইলেন এমন সময় মানা প্রতাপকে রক্ষা করিতে গিয়া অস্ত্রাহত হইয়া ভূপতিত হইলেন।]

মানা। রাণা, আমি সাংঘাতিক আহত।

প্রতাপ। মানা ভূপতিত?

মানা। আমি মরি ক্ষতি নাই! আপনি যান রাণা। শত্রু এখানে দলে দলে আসছে. আর রক্ষা নাই।

প্রতাপ। তুমি মরতে জানো, মানা, আমি মরতে জানি না? আসুক শত্রু।

[মহাবতের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে প্রতাপসিংহ সহসা স্খলিতপদে এক মৃতদেহের উপর পড়িয়া গেলেন। মহাবৎ খাঁ প্রতাপসিংহের মুণ্ডচ্ছেদ করিতে উদ্যত, এমন সময় সসৈন্যে গোবিন্দসিংহ প্রবেশ করিলেন।]

মানা। গোবিন্দ সিংহ! রাণাকে রক্ষা কর।

[গোবিন্দসিংহ মহাবৎকে আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধ করিতে করিতে উভয় সৈন্য সে স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।]

মানা। রাণা! আর আশা নাই. আমাদের সৈন্য প্রায় নির্মূল. ফিরে যান!

প্রতাপ। কখন না। যুদ্ধ করব। যতক্ষণ প্রাণ আছে, পলায়ন করব না।—[উঠিয়া কহিলেন] "দাও তরবারি।"

মানা। এখনো যান। বিপক্ষ শত্রুর বিরাট তরঙ্গ আসছে।

প্রতাপ। আসুক! তরবারি কৈ—[পরে প্রতাপ তরবারি গ্রহণ করিয়া] "অশ্ব কৈ?"

[এই বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন।]

মানা। হায় রাণা, কার সাধ্য এ মোগল-সেনানী-বন্যার গতিরোধ করে! রাণার মৃত্যু সুনিশ্চিত। মা কালী, তোমার মনে এই ছিল।

[স্থান—শক্তসিংহের শিবির। কাল—সন্ধ্যা। একাকী শক্ত।]

শক্ত। যুদ্ধ বেধেছে! বিপুল—বিরাট যুদ্ধ! ঘন ঘন কামানের গর্জন।—উন্মত্ত সৈন্য-দের প্রলয় চীৎকার! অশ্বের হ্রেষা, হস্তীর বৃংহিত, যুদ্ধডঙ্কার উচ্চ নিনাদ, মরণোন্মুখের আর্ত ধ্বনি! যুদ্ধ বেধেছে! এক দিকে অগণ্য মোগল সেনানী আর এক দিকে বিংশতি সহস্র রাজপুত, এক দিকে কামান, আর এক দিকে শুদ্ধ ভল্ল আর তরবারি। কি অসমসাহসিক প্রতাপ! ধন্য প্রতাপ! আজ আমি স্বচক্ষে তোমার অদ্ভুত বীরত্ব দেখেছি! আমার ভাই বটে। আজ স্নেহাশ্রুজলে আমার চক্ষু ভরে আস্ছে। আজ তোমার পদতলে ভক্তিতে ও গর্বে লুণ্ঠিত হতে ইচ্ছা হচ্ছে—প্রতাপ! প্রতাপ! আজ প্রতি মোগল সৈন্যাধ্যক্ষের মুখে তোমার বীরত্বকাহিনী শুন্ছি, আর গর্বে আমার বক্ষ স্ফীত হচ্ছে! সে প্রতাপ রাজপুত; সে প্রতাপ আমার ভাই। আজ এই সুন্দর মেবার রাজ্য মোগল সৈন্য দ্বারা প্লাবিত, দলিত, বিধ্বস্ত দেখছি, আর ধিক্কারে আমার মাথা নুয়ে পড়ছে। আমি এই মোগল-বাহিনী এই চিরপরিচিত সুন্দর রাজ্যে টেনে এনেছি।

[এই সময়ে শিবিরে মহাবৎ খাঁ প্রবেশ করিলেন।]

শক্ত। কি মহাবৎ খাঁ! যুদ্ধক্ষেত্রের সংবাদ কি?

মহাবৎ। এ উত্তম প্রশ্ন শক্তসিংহ। এ যুদ্ধের সময় যখন প্রত্যেক সেনানী যুদ্ধক্ষেত্রে, তখন তুমি নির্ব্বিবাদে কুশলে নিজের শিবিরে বসে? এই তোমার ক্ষত্রিয়-বীরত্ব?

শক্ত। মহাবৎ! আমার কার্যের জন্য তোমার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নহি। আমি স্বেচ্ছায় যুদ্ধে এসেছি। কারো ভৃত্য নহি।

মহাবৎ। ভৃত্য নহ। এতদিন তবে মোগলের সভায় চাটুকার সভাসদ্ মাত্র ছিলে?

শক্ত। মহাবৎ খাঁ! সাবধানে কথা কহ।

মহাবৎ। কি জন্য শক্তসিংহ?

শক্ত। আমার মানসিক অবস্থা বড় শান্ত নয়। নহিলে যুদ্ধের সময় শক্তসিংহ শিবিরে বসে' থাকত না।

মহাবৎ। আর আস্ফালনে কাজ নাই! তুমি বীর যা, তা বোঝা গেছে।

শক্ত। আমি বীর কিনা একবার স্বহস্তে পরীক্ষা কর্ব্বে বিধর্ম্মী?

[এই বলিয়া শক্তসিংহ তরবারি নিষ্কাসন করিলেন।]

মহাবৎ। প্রস্তুত আছি কাফের।

[বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে তরবারি নিষ্কাসন করিলেন ঠিক
এই সময়ে নেপথ্য হইতে শ্রুত হইল।]

প্রতাপসিংহের পশ্চাদ্ধাবন কর! তা'র মুণ্ড চাই।

শক্ত। এ কি! সেলিমের গলা নয়। প্রতাপসিংহ পলায়িত। তার বধের জন্য মোগল তার পিছে ছুটছে। আমি এক্ষণেই আসছি মহাবৎ। আমার অশ্ব?—

[এই বলিয়া শক্তসিংহ দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন।]

মহাবৎ। অদ্ভুত আচরণ! শক্তসিংহ নিশ্চয়ই প্রতাপসিংহের রক্ত নিতে ছুটেছে! কি বিধিনির্ব্বন্ধ! প্রতাপসিংহ আপন ভ্রাতুষ্পুত্রেরই তরবারির আঘাতে ভূপতিত! আর প্রতাপসিংহের আপন ভাই-ই ছুটেছে প্রতাপের শেষ রক্তে নিজের তরবারি রঞ্জিত কর্ত্তে!

[এই বলিয়া মহাবৎ খাঁ চিন্তিতভাবে সে শিবির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।]

স্থান—হলদিঘাট, নির্ঝরতীর। কাল—সন্ধ্যা।
মৃত ঘোটকোপরি মস্তক রাখিয়া প্রতাপ ভূশায়িত।

প্রতাপ। সব শেষ। তিন দিনের মধ্যে সব শেষ। আমার পনর হাজার সৈন্য ধরাশায়ী। আমার প্রিয় ঘোটক চৈতক নিহত। আর আমি নদীর তীরে শোণিতক্ষরণে দুর্বল, ভূপতিত। আমাকে এখানে কে নিয়ে এসেছে। আমার চিরসংগী বিশ্বাসী অশ্ব চৈতক। আমার বিপদ দেখে সে পালিয়েছে, আমার সংযত-রশ্মি সত্ত্বেও বাধা, বিপত্তি, নিষেধ, না মেনে পালিয়ে এসেছে। নিজের প্রাণ রক্ষার্থে নয়—সে ত নিজে প্রাণ দিয়েছে;—আমার প্রাণ রক্ষার্থে। পিছনে পিছনে কে যেন পরিচিত স্বরে ডাকলে "হো নীল ঘোড়েকা সওয়ার! খাড়া হো!" ভেবেছে আমি পালাচ্ছি! চৈতক! প্রভুভক্ত চৈতক! কেন তুমি পালিয়ে এলে! যুদ্ধক্ষেত্রে না হয় দুজনেই একত্রে মর্ত্তাম! শত্রুরা হাসছে, বল্‌ছে, প্রতাপসিংহ যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে পালিয়েছে। চৈতক! মর্ব্বার পূর্ব্বে জীবনে একবার কেন তুই এমন অবাধ্য হলি। লজ্জায় আমি ম'রে যাচ্ছি। আমার মাথা ঘুর্চ্ছে।

[এই সময়ে সশস্ত্র খোরাসান ও মুলতানপতি প্রবেশ করিল।]

খোরাসান। এই যে এখানে প্রতাপ।

মুলতান। ম'রে গিয়েছে।

[প্রতাপ উঠিয়া কহিলেন—মরি নি এখনও! যুদ্ধ এখনও
শেষ হয় নি। অসি বা'র কর।]

মুলতান। আলবৎ।

খোরাসান। আলবৎ, যুদ্ধ কর।

[প্রতাপসিংহ খোরাসানের ও মুলতানের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।
নিকটে কাহার স্বর নেপথ্যে শ্রুত হইল]
"হো নীল ঘোড়েকা সওয়ার! খাড়া হো"

প্রতাপ। আরো আস্‌ছে। আর আশা নাই।

মুলতান। আত্মসমর্পণ কর। তলওয়ার দাও।

প্রতাপ। পারো ত কেড়ে নেও।

[পুনরায় যুদ্ধ হইল ও প্রতাপ মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন।
এমন সময়ে যুদ্ধাঙ্গনে শক্তসিংহ প্রবেশ করিলেন]

শক্ত। ক্ষান্ত হও।

খোরাসান। আর এক কাফের

মুলতান। মারো একে।

["তবে মর" এই বলিয়া শক্তসিংহ প্রচন্ড বেগে খোরাসান ও মুলতানপতিকে
আক্রমণ করিলেন ও উভয়কে ভূপাতিত করিলেন।]

শক্ত। আর ভয় নাই! এখন প্রতাপসিংহ এক রকম নিরাপদ—দাদা! দাদা! অসাড়! —ঝর্ণার জল নিয়ে আসি।

[এই বলিয়া শক্ত জল লইয়া আসিয়া প্রতাপসিংহের মস্তকে
সিঞ্চন করিয়া পুনরায় ডাকিলেন]

"দাদা! দাদা! দাদা!"

প্রতাপ। কে? শক্ত!

শক্ত। মেবার-সূর্য্য অস্ত যায় নাই!—দাদা!

প্রতাপ। শক্ত! আমি তবে তোমার হস্তে বন্দী! আমায় শৃঙ্খল দিয়ে মোগল-সভায় বেঁধে নিয়ে যেও না, শক্ত! আমাকে মেরে ফেলে তারপরে আমার ছিন্ন-মুন্ড নিয়ে গিয়ে তোমার মনিব আকবরকে উপহার দিও! শুদ্ধ জীবিতাবস্থায় বেঁধে নিয়ে যেও না। আমার বড় ইচ্ছা ছিল, যে, সমরক্ষেত্রে যুদ্ধ কর্ত্তে কর্ত্তে প্রাণত্যাগ কর্ব্ব কিন্তু ঠিক সেই সময়ে আমার অশ্ব চৈতক রশ্মি-সংযম না মেনে যুদ্ধক্ষেত্র হতে পালিয়ে এসেছে তাকে কোনরূপেই ফেরাতে পার্লাম না। যদি সমরে মর্ব্বার গৌরব হ'তে বঞ্চিত হয়েছি, আমাকে বন্দী করে সে লজ্জা আরও বাড়িও না। আমাকে বধ কর। শক্ত! ভাই—না, ভাই ব'লে ডেকে তোমার করুণা জাগাতে চাই নে। আজ তুমি জয়ী, আমি বিজিত। তুমি চক্রের উপরে, আমি নীচে। তুমি দাঁড়িয়ে, আমি তোমার পায়ের তলে পড়ে। আমি হঠেছি। আর কিছুই চাই না,

আমাকে বেঁধে নিয়ে যেও না! আমাকে বধ কর। যদি কখন তোমার কোন উপকার ক'রে থাকি, বিনিময়ে আমার এ মিনতি, সামান্য ভিক্ষা, এ শেষ অনুরোধ রাখো। বেঁধে নিয়ে যেয়ো না,—বধ কর। এই প্রসারিত-বক্ষে তোমার তরবারি হান।

[শক্ত তরবারি ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—

—"তোমার ঐ প্রসারিত-বক্ষে আমাকে স্থান দাও, দাদা!"

প্রতাপ। তবে তুমিই কি শক্ত এখন এই মোগল-সৈনিকদ্বয়ের হাত থেকে আমার প্রাণ রক্ষা করেছো?

শক্ত। বীরের আদর্শ, স্বদেশের রক্ষক, রাজপুতকুলের গৌরব প্রতাপকে ঘাতকের হস্তে মর্ত্তে দিতে পারি না। তুমি কত বড়, এতদিন তা বুঝিনি। একদিন ভেবেছিলাম, তোমার চেয়ে আমি শ্রেষ্ঠ। তাই পরীক্ষা কর্ব্বার জন্য সেদিন দ্বন্দ্বযুদ্ধ করি, মনে আছে? কিন্তু আজ এই যুদ্ধে বুঝেছি যে, তুমি মহৎ, আমি ক্ষুদ্র; তুমি বীর আর আমি কাপুরুষ। নীচ প্রতিশোধ নিতে গিয়ে জন্মভূমির সর্বনাশ করেছি! কিন্তু যখন তোমাকে রক্ষা কর্ত্তে পেরেছি, তখন এখনও মেবারের আশা আছে। রাজপুতকুলপ্রদীপ! বীরকেশরী! পুরুষোত্তম! আমাকে ক্ষমা কর।

প্রতাপ। ভাই, ভাই! (ভ্রাতৃদ্বয় আলিঙ্গনাবদ্ধ হইলেন।)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

অণুবীক্ষণ নামে একরকম যন্ত্র আছে, যাহাতে ছোটো জিনিসকে বড়ো করিয়া দেখায়; বড়ো জিনিসকে ছোটো দেখাইবার নিমিত্ত উপায় পদার্থ বিদ্যাশাস্ত্রে নির্দিষ্ট থাকিলেও ঐ উদ্দেশ্যে নির্মিত কোনো যন্ত্র আমাদের মধ্যে সর্বদা ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত, বড়ো জিনিসকে ছোটো দেখাইবার জন্য নির্মিত যন্ত্রস্বরূপ। আমাদের দেশের মধ্যে যাঁহারা খুব বড়ো বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত ঐ গ্রন্থ একখানি সম্মুখে ধরিবামাত্র তাঁহারা সহসা অতিমাত্র ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন এবং এই যে বাঙালিত্ব লইয়া আমরা অহোরাত্র আস্ফালন করিয়া থাকি তাহাও অতি ক্ষুদ্র

ও শীর্ণ কলেবর ধারণ করে। এই চতুপার্শ্বস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ধবলগিরির ন্যায় শীর্ষ তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে; কাহারও সাধ্য নাই যে, সেই উচ্চ চূড়া অতিক্রম করে বা স্পর্শ করে।

বিদ্যাসাগরের উন্নত সুদৃঢ় চরিত্রে যাহা মেরুদণ্ড, সাধারণ বাঙালির চরিত্রে তাহার একান্তই অসদ্ভাব। প্রাণিতত্ত্ববিদেরা মেরুদণ্ড দেখিয়া সমগ্র প্রাণিসমষ্টিকে উন্নত ও অনুন্নত দুই প্রধান পর্যায়ে ভাগ করেন। মেরুদণ্ডের অস্তিত্ব প্রাণীর পক্ষে সামর্থ্যের ও আত্মনির্ভরশক্তির প্রধান পরিচয়। বিদ্যাসাগর যে সামর্থ্য ও আত্মনির্ভরশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সাধারণ বাঙালি-চরিত্রে তাহার তুলনা মিলে না।

এই দেশে এই জাতির মধ্যে সহসা বিদ্যাসাগরের মতো একটি কঠোর-কঙ্কাল-বিশিষ্ট মনুষ্যের কিরূপে উৎপত্তি হইল তাহা বিষম সমস্যার কথা। সেই দুর্দম প্রকৃতি যাহা ভাঙিতে পারিত, কেহ কখনও নোওয়াইতে পারে নাই, সেই উগ্র পুরুষকার যাহা সহস্র বিঘ্ন ঠেলিয়া ফেলিয়া আপনাকে অব্যাহত করিয়াছে, সেই উন্নত মস্তক যাহা কখনও ক্ষমতার নিকট ও ঐশ্বর্যের নিকট অবনত হয় নাই, সেই উৎকটবেগবতী ইচ্ছা যাহা সর্ববিধ কপটাচার হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়াছিল, তাহার বঙ্গদেশে আবির্ভাব একটা অদ্ভুত ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গণ্য হইবে সন্দেহ নাই। এই উগ্রতা, এই কঠোরতা, এই দুর্দমতা ও অনম্যতা, এই দুর্ধর্ষ বেগবত্তার উদাহরণ, যাহারা কঠোর জীবনদ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকিয়া দুই ঘা দিতে জানে ও দুই ঘা খাইতে জানে তাহাদের মধ্যে পাওয়া যায়; আমাদের মতো দুর্বল লোকদের মধ্যে এই উদাহরণ কিরূপে মিলিল, তাহা গভীর আলোচনার বিষয়।

অনেকে বিদ্যাসাগরের চরিত্রে পাশ্চাত্ত্যজাতি-সুলভ বিবিধ গুণের বিকাশ দেখেন। ইউরোপীয়দের আমরা যতই নিন্দা করি-না, অনেক বিষয়ে তাঁহারা খাঁটি মানুষ; আমাদের মনুষ্যত্ব তাঁহাদের নিকট নিষ্প্রভ ও মলিন।

যে পুরুষকারে পুরুষের পৌরুষ, সাধারণ ইউরোপীয়ের চরিত্রে যাহা বর্তমান, সাধারণ বাঙালির চরিত্রে যাহার অভাব, বিদ্যাসাগরের চরিত্রে তাহা প্রচুর পরিমাণে বর্তমান ছিল; বিদ্যাসাগরের বাল্যজীবনটা দুঃখের সহিত সংগ্রাম করিতে অতিবাহিত হইয়াছিল। শুধু বাল্যজীবন কেন, তাঁহার সমগ্র জীবনকেই, নিজের জন্য না হউক, পরের জন্য সংগ্রাম বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। এই সংগ্রাম তাঁহার চরিত্রগঠনে অনেকটা আনুকূল্য করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু পিতাপিতামহ হইতে তাঁহার ধাতুতে মজ্জাতে ও শোণিতে এমন একটা পদার্থ তিনি পাইয়াছিলেন যাহাতে সমুদয় বিপত্তি ভিন্ন করিয়া তিনি বীরের মতো সেই রণক্ষেত্রে দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দুঃখ অনেকেরই ভাগ্যে ঘটে, জীবনের বন্ধুর পথ অনেকের পক্ষেই কন্টকসমাবেশে আরও দুর্গম। কিন্তু এইরূপে সেই কাঁটাগুলোকে ছাঁটিয়া, দলিয়া, চলিয়া যাইতে অল্প

লোককেই দেখা যায়। বাঙালির মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত প্রকৃতই বিরল।

অথচ আশ্চর্য এই, এত প্রভেদ সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর খাঁটি বাঙালি ছিলেন। তিনি খাঁটি বাঙালির ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার বাল্যজীবনে ইউরোপীয় প্রভাব তিনি কিছুই অনুভব করেন নাই। তিনি যে স্থানে যাঁহাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন সে স্থানে তাঁহাদের মধ্যে পাশ্চাত্য ভাবের প্রভাব তখন পর্যন্ত একেবারেই প্রবেশ লাভ করে নাই। পরজীবনে তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য দীক্ষা অনেকটা পাইয়াছিলেন, অনেক পাশ্চাত্য মানুষের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য চরিত্রে অনুকরণের যোগ্য অনেক পদার্থের সমাবেশ দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা যে তাঁহার চরিত্রকে কোনোরূপ পরিবর্তিত করিয়াছিল তাহা বোধ হয় না। তাঁহার চরিত্র তৎপূর্বেই সম্যক্‌ভাবে সম্পূর্ণরূপে গঠিত হইয়াছিল, আর নূতন মাল-মসলা সংগ্রহের প্রয়োজন হয় নাই।...তিনি ঠিক যেমন বাঙালিটি হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, শেষ দিন পর্যন্ত তেমনি বাঙালিটিই ছিলেন। তাঁহার নিজত্ব এত প্রবল ছিল যে, অনুকরণ-দ্বারা পরত্ব-গ্রহণের তাঁহার কখনও প্রয়োজন হয় নাই। এমন-কি, তাঁহার এই নিজত্ব সময়ে সময়ে এমন উগ্রমূর্তি ধারণ করিত যে, তিনি বলপূর্বক এই পরত্বকে সম্মুখ হইতে দূরে ফেলিতেন। পাশ্চাত্য চরিত্রের সহিত তাঁহার চরিত্রের যে-কিছু সাদৃশ্য দেখা যায় সে-সমস্তই তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি, অথবা তাঁহার পুরুষানুক্রমে-আগত পৈতৃক সম্পত্তি। ইহার জন্য তাঁহাকে কখনও ঋণস্বীকার করিতে হয় নাই।

চটিজুতার প্রতি তাঁহার একটা আত্যন্তিক আসক্তি ছিল বলিয়াই তিনি যে চটিজুতা ভিন্ন অন্য জুতা পায়ে দিতেন না, এমন নহে। আমরা যে স্বদেশের প্রাচীন চটি ত্যাগ করিয়া বুট ধরিয়াছি, ঠিক তাহা দেখিয়াই যেন বিদ্যাসাগরের চটির প্রতি অনুরাগ বাড়িয়া গিয়াছিল। বাস্তবিকই এই চটিজুতাকে উপলক্ষমাত্র করিয়া একটা অভিমান, একটা দর্প তাঁহার অভ্যন্তর হইতে প্রকাশ পাইত। যে অভিমান ও দর্পের অনুরোধে নিত্যন্ত অনাবশ্যক হইলেও মুটের মাথা হইতে বোঝা কাড়িয়া নিজের মাথায় তুলিয়া পথ চলিতেন, এই দর্প ঠিক সেই দর্প।

আচার-বিষয়ে অন্যের অনুকরণ দূরের কথা, বিদ্যাসাগরের চরিত্রে এমন দুই-একটা পদার্থ ছিল যাহাতে পাশ্চাত্য মানব হইতে তাঁহাকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল; এই প্রকৃতিগত পার্থক্য দেখিয়াই আমরা বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব অনুভব করি।

বিদ্যাসাগরের লোকহিতৈষিকতা সম্পূর্ণ প্রাচ্য ব্যাপার। ইহা কোনোরূপ নীতি-শাস্ত্রের, ধর্মশাস্ত্রের, অর্থশাস্ত্রের বা সমাজশাস্ত্রের অপেক্ষা করিত না। এমন-কি, তিনি হিতৈষণাবশে যে-সকল কাজ করিয়াছেন তাহার অনেকই আধুনিক সমাজতত্ত্ব মঞ্জুর করিবে না। কোনো স্থানে দুঃখ দেখিলেই যেমন করিয়াই হউক তাহার প্রতিকার করিতে হইবে, এ কালের সমাজতত্ত্ব সর্বদা তাহা স্বীকার করিতে চাহে না। কিন্তু দুঃখের

অস্তিত্ব দেখিলেই বিদ্যাসাগর তাহার কারণানুসন্ধানের অবসর পাইতেন না। লোকটা অভাবে পড়িয়াছে জানিবামাত্রেই বিদ্যাসাগর সেই অভাব মোচন না করিয়া পারিতেন না। লোকটার কুলশীলের পরিচয় লওয়ার অবসর ঘটিত না। তাহার অভাবের উৎপত্তি কোথায়, তাহার অভাব পূরণ করিলে প্রকৃতপক্ষে তাহার উপকার হইবে কি অপকার হইবে ও গৌণ সম্বন্ধে সমাজের ইষ্ট হইবে কি অনিষ্ট হইবে, নীতিতত্ত্বঘটিত ও সমাজতত্ত্বঘটিত এই-সকল প্রশ্নের মীমাংসা তিনি করিতেন না। অপিচ, দুঃখের সম্মুখে আসিবামাত্র তাঁহার ব্যক্তিত্ব একেবারে অভিভূত হইয়া যাইত। তিনি আপনাকে একেবারে ভুলিয়া যাইতেন; পরের মধ্যে তাঁহার নিজত্ব একেবারে মগ্ন ও লীন হইয়া যাইত।

রামায়ণ এবং উত্তরচরিত অবলম্বন করিয়া বিদ্যাসাগর 'সীতার বনবাস' রচনা করিয়াছিলেন। রামায়ণ ও উত্তরচরিতের নায়কের একটা অপবাদ জনসমাজে প্রসিদ্ধ আছে। কোনো একটা-কিছু ছল পাইলেই রামচন্দ্র কাঁদিয়া পৃথিবী ভাসাইয়া ফেলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত-গ্রন্থের প্রায় প্রতি পাতাতেই দেখিতে পাওয়া যায়, বিদ্যাসাগর কাঁদিতেছেন। বিদ্যাসাগরের এই রোদনপ্রবণতা তাঁহার চরিত্রের একটা বিশেষ লক্ষণ। কোনো দীন দুঃখী আসিয়া দুঃখের কথা আরম্ভ করিতেই বিদ্যাসাগর কাঁদিয়া আকুল; কোনো বালিকা বিধবার মলিন মুখ দর্শনমাত্রেই বিদ্যাসাগরের বক্ষঃস্থলে গঙ্গা বহমানা; ভ্রাতার অথবা মাতার মৃত্যু-সংবাদ পাইবামাত্র বিদ্যাসাগর বালকের মতো উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে থাকেন।

বিদ্যাসাগরের বাহিরটাই বজ্রের মতো কঠিন, ভিতরটা পুষ্পের অপেক্ষাও কোমল। রোদন-ব্যাপার বড়োই গর্হিত কর্ম, বিজ্ঞের নিকট ও বিরাগীর নিকট অতীব নিন্দিত। কিন্তু এইখানেই বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব; এইখানেই তাঁহার প্রাচ্যত্ব। প্রতীচ্য দেশের কথা বলিতে পারি না; কিন্তু প্রাচ্যদেশের রোদনপ্রবণতা মনুষ্যচরিত্রের যেন একটা প্রধান অঙ্গ। বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব এই যে, তিনি আপনার সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে তৃণের অপেক্ষাও তুচ্ছ গণনা করিতেন, কিন্তু পরের জন্য রোদন না করিয়া তিনি থাকিতে পারিতেন না। দরিদ্রের দুঃখ-দর্শনে তাঁহার হৃদয় টলিত, বান্ধবের মরণশোকে তাঁহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিত। জ্ঞানের উপদেশ ও বৈরাগ্যের উপদেশ তাঁহার নিকট এ সময়ে ঘেঁষিতে পারিত না।

বিদ্যাসাগর একজন সমাজসংস্কারক ছিলেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, বিধবা-বিবাহে পথ প্রদর্শন তাঁহার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। বস্তুতই এই বিধবাবিবাহ-ব্যাপারে আমরা ঈশ্বরচন্দ্রের সমগ্র মূর্তিটি দেখিতে পাই। কোমলতা ও কঠোরতা উভয় গুণের আধাররূপে তিনি লোকসমক্ষে প্রতীয়মান হয়েন। প্রকৃতির নিষ্ঠুর হস্তে মানব-নির্যাতন তাঁর কোমল প্রাণকে দিবানিশি ব্যথিত রাখিত; দুর্বল মানুষের প্রতি নিষ্করুণ প্রকৃতির অত্যাচার তাঁহার হৃদয়ের মর্মস্থলে ব্যথা দিত; তাহার উপর মনুষ্য-

বিহিত সমাজবিহিত অত্যাচার তাঁহার পক্ষে নিতান্তই অসহ্য হইয়াছিল। বিধাতার কৃপায় মানুষের দুঃখের তো আর অভাব নাই, তবে কেন মানুষ আবার সাধ করিয়া আপন দুঃখের বোঝায় ভার চাপায়! ইহা তিনি বুঝিতেন না, এবং ইহা তিনি সহিতেনও না। বালবিধবার দুঃখ-দর্শনে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইল; এবং সেই বিগলিত হৃদয়ের প্রস্রবণ হইতে করুণামন্দাকিনীর ধারা বহিল। সুরনদী যখন ভূমিপৃষ্ঠে অবতরণ করে, তখন কার সাধ্য যে, সে প্রবাহ রোধ করে! বিদ্যাসাগরের করুণার প্রবাহ যখন ছুটিয়াছিল তখন কাহারও সাধ্য হয় নাই যে, সে গতির পথে দাঁড়াইতে পারে। দেশাচারের দারুণ বাঁধ তাহা রোধ করিতে পারে নাই। সমাজের ভ্রূকুটি-ভঙ্গিতে তাহার স্রোত বিপরীত মুখে ফিরে নাই। এইখানে বিদ্যাসাগরের কঠোরতার পরিচয়। সরল, উন্নত, জীবন্ত মনুষ্যত্ব লইয়া তিনি শেষ পর্যন্ত স্থিরভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন; কাহারও সাধ্য হয় নাই যে, সেই মেরুদণ্ড নমিত করে।

বঙ্গদেশের মধ্যে ছোটো-বড়ো এমন ব্যক্তি অল্পই আছেন, যিনি কোনো-না-কোনো প্রকারে বিদ্যাসাগরের নিকট ঋণগ্রস্ত নহেন। দূর মফস্বলের পল্লীগ্রামের মধ্যেও তাঁহার প্রভাব কতদূর বিস্তারলাভ করিয়াছিল, তাহা চিন্তার অগোচর।

মন্ত্রশক্তি

প্রমথ চৌধুরী

মন্ত্রশক্তিতে তোমরা বিশ্বাস কর না, কারণ আজকাল কেউ করে না; কিন্তু আমি করি। এ বিশ্বাস আমার জন্মেছে, শাস্ত্র পড়ে নয়, মন্ত্রের শক্তি চোখে দেখে।

চোখে কি দেখেছি, বলছি।

দাঁড়িয়ে ছিলুম চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায়। জন দশ-বারো লেঠেল জমায়েত হয়েছিল পূব দিকে, ভোগের দালানের ভগ্নাবশেষের সুমুখে; পশ্চিমে শিবের মন্দির, যার পাশে বেলগাছে একটি ব্রহ্মদৈত্য বাস করতেন, যাঁর সাক্ষাৎ বাড়ির দাসী-চাকরানীরা কখনো কখনো রাত-দুপুরে পেত—ধোঁয়ার মতো যাঁর ধড় আর কুয়াসার মতো যাঁর জটা। আর দক্ষিণে পুজোর আঙিনা—যে আঙিনায় লক্ষ বলি হয়েছিল ব'লে একটি কবন্ধ জন্মেছিল। এ'কে কেউ দেখেন নি, কিন্তু সকলেই ভয় করতেন।

লেঠেলদের খেলা দেখবার জন্য লোক জুটেছিল কম নয়। মনিরুদ্দি সর্দার, তার

সৈন্যসামন্ত কে কোথায় দাঁড়াবে, তারই ব্যবস্থা করছিল। কি চেহারা তার। গৌরবর্ণ, মাথায় ছ-ফুটের উপর লম্বা, গালে লম্বা পাকা দাড়ি, গোঁফ ছাঁটা। সে ছিল ওদিকের সব-সেরা লকড়িওয়ালা।

এমন সময় নায়েববাবু আমাকে কানে কানে বললেন, "ঈশ্বর পাটনিকে এক-হাত খেলা দেখাতে হুকুম করুন-না। ঈশ্বর লেঠেল নয়, কিন্তু শুনেছি, কি লাঠি, কি লকড়ি, কি সড়কি—ও হাতে নিলে কোনো লেঠেলই ওর সুমুখে দাঁড়াতে পারে না। আপনি হুকুম করলে ও 'না' বলতে পারবে না, কারণ ও আপনাদের বিশেষ অনুগত প্রজা।"

এর পর নায়েববাবু ঈশ্বরকে ডাকলেন। ভিড়ের ভিতর থেকে একটি লম্বা ছিপ-ছিপে লোক বেরিয়ে এল। তার শরীরে আছে শুধু হাড় আর মাস, চর্বি একবিন্দুও নেই। রঙ তার কালো, অথচ দেখতে সুপুরুষ।

আমি তাকে বললুম, "আজ তোমাকে এক-হাত খেলা দেখাতে হবে।"

লোকটা অতি ধীরভাবে উত্তর করলে, "হুজুর, লেঠেলি আমার জাতব্যবসা নয়। বাপ-ঠাকুরদার মতো আমিও খেয়ার নৌকো পারাপার করেই দু-পয়সা কামাই। আমার কাজ লাঠিখেলা নয়, লগিঠেলা। তাই বলছি হুজুর, এ আদেশ আমাকে করবেন না।"

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "তা হলে তুমি লাঠি খেলতে জান না?"

সে উত্তর করলে, "হুজুর, জানতুম ছোকরা-বয়সে। তার পর আজ বিশ-পঁচিশ বছর লাঠিও ধরি নি, লকড়িও ধরি নি, সড়কিও ধরি নি; তা ছাড়া আর-একটা কথা আছে। এদের কাছে আমি ঠাকুরের সুমুখে দিব্যি করেছি যে, আমি আর লাঠি-সড়কি ছোঁব না। সে কথা ভাঙি কি করে? হুজুরের হুকুম হলে আমি 'না' বলতে পারি নে, কিন্তু—হুজুর যদি আমার কথাটা শোনেন তবে হুজুর আমাকে আর এ আদেশ করবেন না।"

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "কেন এ রকম দিব্যি করেছিলে?"

ঈশ্বর বললে, "ছেলেবেলায় এরা-সব খেলা শিখত। আমিও খেলার লোভে এদের দলে জুটে গিয়েছিলুম। আমার বয়স যখন বছর-কুড়িক, তখন কি লাঠি, কি লকড়ি, কি সড়কিতে—আমিই হয়ে উঠলুম সকলের সেরা। এরা ভাবলে, যে, আমি কোনো মন্তর-তন্তর শিখেছি—তারই গুণে আমি সকলকে হটিয়ে দিই। হুজুর, মন্তর-তন্তর কিছুই জানি নে, তবে আমার যা ছিল তা এদের কারও ছিল না। সে জিনিস হচ্ছে চোখ। আমি অন্যের চোখের ঘোরাফেরা দেখেই বুঝতুম যে, তার হাতের লাঠি-সড়কির মার কোন্ দিক থেকে আসবে। কিন্তু আমার চোখ দেখে এরা কিছুই বুঝতে পারত না, আর শুধু মার খেত। শেষটা এরা সকলে মিলে যুক্তি করলে যে, আমাকে কালীবাড়ি নিয়ে গিয়ে হাড়কাঠে ফেলে বলি দেবে। তার পর, একদিন এরা রাত-

দুপুরে আমার বাড়ি চড়াও হয়ে, আমাকে বিছানা থেকে তুলে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে, কালীবাড়ি নিয়ে গিয়ে হাড়কাঠে ফেলে আমাকে বলি দেবার উদ্‌যোগ করলে। খাঁড়া ছিল ঐ গুলিখোর মিছু সর্দারের হাতে। আমি প্রাণভয়ে অনেক কান্নাকাটি করবার পর এরা বললে, 'তুমি ঠাকুরের সুমুখে দিব্যি করো যে, আর কখনো লাঠি ছোঁবে না, তা হলে তোমাকে ছেড়ে দেব।' হুজুর, নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে এই দিব্যি করেছি; আর তার পর থেকে একদিনও লাঠি-সড়কি ছুঁই নি। কথা সত্যি কি মিথ্যে—ঐ গুলিখোর মিছুকে জিজ্ঞেস করলেই টের পাবেন।"

মিছু আমাদের বাড়ির লেঠেলদের সর্দার।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম, "ঈশ্বরের কথা সত্যি না মিথ্যে।"

সে 'হাঁ' 'না' কিছুই উত্তর করলে না।

ঈশ্বর এর পর বলে উঠল, "হুজুর, আমি মিথ্যে কথা জীবনে বলি নি—আর কখনো বলবও না।"

তার পর, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম, "মিছু যদি গুলিখোর হয় তো এমন পাকা লেঠেল হল কি করে?"

ঈশ্বর বললে, "হুজুর, নেশায় শরীরের শক্তি যায়, কিন্তু গুরুর কাছে শেখা বিদ্যে তো যায় না। বিদ্যে হচ্ছে আসল শক্তি। সেদিন দেখলেন না?—ঠাকুরদাস কামার অত বড়ো মোষটার মাথা এক কোপে বেমালুম কাটলে, আর ঠাকুরদাস দিনে-দুপুরে গুলি খায়। আমি নেশা করি নে বটে, কিন্তু বয়সে আমার শরীরে জোর এখন তো কমে এসেছে—যেমন সকলেরই হয়। যদি এরা অনুমতি দেয় তা হলে দেখতে পাবেন যে, বুড়ো হাড়েও বিদ্যে সমান আছে।"

এর পর আমি লেঠেলদের জিজ্ঞেস করলুম, তারা ঈশ্বরকে খেলবার অনুমতি দেবে কি না।

তারা পরস্পর পরামর্শ করে বললে, "আমরা ওকে হুজুরের কথায় আজকের দিনের মতো অনুমতি দিচ্ছি। দেখা যাক, ও কি ছেলেখেলা করে।"

লেঠেলদের অনুমতি পাবার পর ঈশ্বর কোমরের কাপড় তুলে বুকে বাঁধলে; আর তার ঝাঁকড়া চুল একমুঠো ধুলো দিয়ে ঘষে ফুলিয়ে তুললে; তার পর মাটিতে জোড়াসন হয়ে বসে পাঁচ মিনিট ধরে বিড় বিড় করে কি বকতে লাগল। অমনি লেঠেলরা সব চীৎকার করে উঠল, "দেখছেন, বেটা মন্তর আওড়াচ্ছে—আমাদের নজর-বন্দী করবার জন্যে।"

ঈশ্বর এ-সব চেঁচামেচিতে কর্ণপাতও করলে না। তার পর, যখন সে উঠে দাঁড়াল, তখন দেখি, সে আলাদা মানুষ। তার চোখে আগুন জ্বলছে আর শরীরটে হয়েছে ইস্পাতের মতো।

ঈশ্বর বললে, "প্রথম এক-হাত লকড়ি নিয়েই ছেলেখেলা করা যাক। এদের ভিতর কে বাপের বেটা আছে, লকড়ি ধরুক।"

মনিরুদ্দি সর্দার বললে, "আমার ছেলে কামালের সঙ্গেই এক-হাত খেলে তাকে যদি হারাতে পার, তা হলে আমি তোমাকে লকড়ি খেলা কাকে বলে, তা দেখাব।"

তার পর একটি বছর-কুড়িকের ছোকরা এগিয়ে এল। সে তার বাপের মতোই সুপুরুষ, গৌরবর্ণ ও দীর্ঘাকৃতি; বাঁ হাতে তার ছোট্ট একটি বেতের ঢাল, আর ডান হাতে পাকা বাঁশের লাল টুকটুকে একখানি লকড়ি।

খেলা শুরু হল। এক মিনিটের মধ্যেই দেখি কামালের লকড়ি ঈশ্বরের বাঁ হাতে, আর কামাল নিরস্ত্র হয়ে বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছে। তখন ঈশ্বর বললে, "যে লকড়ি হাতে ধরে রাখতে পারে না, সে আবার খেলবে কি?"

এ কথা শুনে মনিরুদ্দি রেগে আগুন হয়ে লকড়ি-হাতে এগিয়ে এল। ঈশ্বর বললে, "তোমার হাতের লকড়ি কেড়ে নেব না, কিন্তু তোমার গায়ে আমার লকড়ির দাগ বসিয়ে দেব।"

এর পরে পাঁচ মিনিট ধরে দুজনের লকড়ি বিদ্যুৎবেগে চলাফেরা করতে লাগল। শেষটা মনিরুদ্দির লকড়ি উড়ে শিবের মন্দিরের গায়ে গিয়ে পড়ল। আর দেখি, মুনিরুদ্দির সর্বাঙ্গে লাল লাল দাগ, যেন কেউ সিঁদুর দিয়ে তার গায়ে ডোরা কেটে দিয়েছে।

মনিরুদ্দি মার খেয়েছে দেখে হেদাৎউল্লা লাফিয়ে উঠে বললে, "ধর্ বেটা সড়কি।"

ঈশ্বর বললে, "ধরছি। কিন্তু সড়কি যেন আমার পেটে বসিয়ে দিয়ো না। জানি, তুমি খুনে। কিন্তু এ তো কাজিয়া নয়—আপসে খেলা। আর এই কথা মনে রেখো, রক্ত যেমন আমার গায়ে আছে, তোমার গায়েও আছে।"

এর পর সড়কি খেলা শুরু হল। সড়কির সাপের জিভের মতো ছোটো ছোটো ইস্পাতের ফলাগুলো অতি ধীরে ধীরে একবার এগোয় আবার পিছোয়। এ খেলা দেখতে গা কি রকম করে, কারণ সড়কির ফলা তো সাপের জিভ নয়, দাঁত। সে যাই হোক, হেদাৎউল্লা হঠাৎ 'বাপ রে' বলে চীৎকার করে উঠল।

তখন তাকিয়ে দেখি, তার কব্জি থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটছে, আর তার সড়কিখানি রয়েছে মাটিতে পড়ে।

ঈশ্বর বললে, "হুজুর, নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ওর কব্জি জখম করেছি, নইলে ও আমার পেটের নাড়ীভুঁড়ি বার করে দিত। আমি যদি সড়কি ওর হাত থেকে খসিয়ে না দিতুম, তা হলে তা আমার পেটে ঠিক ঢুকে যেত। এ খেলার আইন-কানুন ও বেটা মানে না, ও চায়—হয় জখম করতে, নয় খুন করতে।"

হেদাৎউল্লার রক্ত দেখে লেঠেলদের মাথায় খুন চড়ে গেল, আর সমস্বরে 'মার বেটাকে' বলে চীৎকার করে তারা বড়ো বড়ো লাঠি নিয়ে ঈশ্বরকে আক্রমণ করলে। ঈশ্বর একখানা বড়ো লাঠি দু হাতে ধরে আত্মরক্ষা করতে লাগল। তখন আমি ও নায়েববাবু দুজনে গিয়ে লেঠেলদের থামাতে চেষ্টা করতে লাগলুম। হুজুরের হুকুমে তারা সব তাদের রাগ সামলে নিলে। তা ছাড়া লাঠির ঘায়ে অনেকেই কাবু হয়েছিল। কারো মাথাও ফেটে গিয়েছিল শুধু ঈশ্বর এদের মধ্যে থেকে অক্ষত শরীরে বেরিয়ে এসে আমাকে বললে, "আমি শুধু এদের মার ঠেকিয়েছি। কাউকেও এক ঘা মারি নি। ওদের গায়ে-মাথায় যে দাগ দেখছেন—সে-সব ওদেরই লাঠির দাগ। এলোমেলো লাঠি চালাতে গিয়ে এর লাঠি ওর মাথায় গিয়ে পড়েছে, ওর লাঠি এর মাথায়। আমি যে এদের লাঠিবৃষ্টির মধ্যে থেকে মাথা বাঁচিয়ে এসেছি, সে শুধু হুজুরের—ব্রাহ্মণের—আশীর্বাদে।"

মিছু সর্দার বললে, "হুজুর, আগেই বলেছিলুম, ও বেটা জাদু জানে, এখন তো দেখলেন যে, আমাদের কথা ঠিক। মন্তরের সঙ্গে কে লড়তে পারবে?"

ঈশ্বর হাত জোড় করে বললে, "হুজুর, আমি মন্তর-তন্তর কিছুই জানি নে। তবে সড়কি-লাঠি ধরবামাত্র আমার শরীরে কি যেন ভর করে। শক্তি আমার কিছুই নেই, যিনি আমার উপর ভর করেন সব শক্তি তাঁরই।"

আমি বুঝলুম, লেঠেলদের কথা ঠিক। ঈশ্বরের গায়ে যিনি ভর করেন তাঁরই নাম মন্ত্রশক্তি অর্থাৎ দেবতা। শুধু লাঠিখেলাতে নয়, পৃথিবীর সব খেলাতেই—যথা সাহিত্যের খেলাতে, পলিটিক্সের খেলাতে, তিনিই দিগ্বিজয়ী হন যাঁর শরীরে এই দৈবশক্তি ভর করে। এ শক্তি যে কি, যাঁদের শরীরে তা নেই তাঁরা তা জানেন না, আর যাঁদের শরীরে আছে তাঁরাও জানেন না।

বাপ্পাদিত্য

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তুষের আগুন যেমন প্রথমে ধিকি-ধিকি, শেষে হঠাৎ ধূ-ধূ করে জ্বলে ওঠে, তেমনি গোহের পর থেকে রাজপুতদের উপর ভিলদের রাগ ক্রমে-ক্রমে অল্পে-অল্পে বাড়তে-

বাড়তে একদিন দাউ-দাউ করে পাহাড়ে-পাহাড়ে, বনে-বনে দাবানলের মতো জ্বলে উঠল।

গোহের সুন্দর মুখ, অসীম দয়া, অটল সাহসের কথা মনে রেখে ভিলেরা আট-পুরুষ পর্যন্ত রাজপুত রাজাদের সমস্ত অত্যাচার সহ্য করেছিল। যদি কোনো রাজপুত রাজা শিকারে যেতে পথের ধারে কোনো ভিলের কালো গায়ে বল্লমের খোঁচায় রক্তপাত করে চলে যেতেন, তবে তার মনে পড়ত—রাজা গোহ একদিন তাদেরই বংশের একজনকে বাঘের মুখ থেকে বাঁচিয়ে এনে নিজের হাতে তার বুকের রক্ত মুছে দিয়েছিলেন। যখন কোনা রাজকুমার, কোনো-একদিন শখ করে গ্রামকে-গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে তামাশা দেখতেন তখন তাদের মনে পড়ত—এক বছর—দুর্ভিক্ষের দিনে রাজা গোহ তাঁর প্রকান্ড রাজবাড়ি, পরিপূর্ণ ধানের গোলা, আশ্রয়হীন দীনদুঃখী ভিল-প্রজাদের জন্য সারা-বৎসর খুলে রেখেছিলেন। ভাগ্য-দোষে যুদ্ধে জয় না হলে যেদিন কোনো কাপুরুষ যুবরাজ বিশ্বাসঘাতক বলে সেনাপতিদের মাথা একটির পর একটি হাতির পায়ের তলায় চূর্ণ করে ফেলতেন, সেদিন সমস্ত ভিল বাহিনী চক্ষের জল মুছে ভাবত—হায় রে হায়, মহারাজ গোহ ছিলেন, যিনি যুদ্ধের সময় ভায়ের মতো তাদের যত্ন করতেন, মায়ের মতো তাদের রক্ষা করতেন, বীরের মতো সকলের আগে চলতেন।

এত অত্যাচার, এত অপমান, তবু সেই বিশ্বাসী ভিল-প্রজাদের সরল প্রাণ আট-পুরুষ পর্যন্ত বিশ্বাসে রাজভক্তিতে পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু যখন বাপ্পাদিত্যের পিতা নাগাদিত্য রাজসিংহাসনে বসে ঘোর অত্যাচার আরম্ভ করলেন; যখন গরিব প্রজাদের গ্রাম জ্বালিয়ে, খেত উজাড় করে তার মন সন্তুষ্ট হল না; তিনি যখন হাজার হাজার ভিলের মেয়ে দাসীর মতো রাজপুতের ঘরে-ঘরে বিলেয়ে দিতে লাগলেন; যখন প্রতিদিন নতুন-নতুন অত্যাচার না হলে তাঁর ঘুম হত না; শেষে সমস্ত ভিলের প্রাণের চেয়ে প্রিয় তাদের একমাত্র আমোদ—বনে-বনে পশু শিকার—যেদিন নাগাদিত্য নতুন আইন করে একেবারে বন্ধ করলেন, সেদিন তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ল।

নাগাদিত্য ভিল-প্রজাদের উপর এই নতুন আইন জারি করে সমস্ত রাত্রি সুখের স্বপ্নে কাটিয়ে সকালে উঠে দেখলেন, দিনটা বেশ মেঘলা-মেঘলা, ঠান্ডা হাওয়া ছেড়েছে, কোনো দিকে ধুলো নেই, শিকারের বেশ সুবিধা। নাগাদিত্য তৎক্ষণাৎ হাতি সাজিয়ে দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। সেদিন রাজার সঙ্গে কেবল রাজপুত! দলের পর দল, বড়ো-বড়ো ঘোড়ায় চড়ে রাজপুত! সামান্য ভিলের একটি ছোটো ছেলের পর্যন্ত যাবার হুকুম নেই! শিকার দেখলে খাঁচার ভিতর চিতাবাঘ যেমন ছটফট করে, আজ এমন শিকারের দিনে ঘরের ভিতর বসে থেকে ভিলদের প্রাণ তেমনই ছটফট করছে—এই কথা ভেবে নিষ্ঠুর নাগাদিত্যের মন আনন্দে নৃত্য করতে লাগল।

মহারাজ নাগাদিত্য দলবল নিয়ে ভেরি বাজিয়ে হৈ-হৈ শব্দে পর্বতের শিখরে

চড়লেন; বজ্রের মতো ভয়ংকর সেই ভেরির আওয়াজ শুনে অন্যদিন মহিষের পাল জল ছেড়ে উঠে পালাত, বনের পাখি বাসা ছেড়ে আকাশে উঠত, হাজার-হাজার হরিণ প্রাণ-ভয়ে পথ ভুলে ছুটতে-ছুটতে যেখানে শিকারী সেইখানে এসে উপস্থিত হত, ঘুমন্ত সিংহ জেগে উঠত, বাঘ হাঁকার দিত—শিকারীরা কেউ বল্লম-হাতে মহিষের পিছনে, কেউ খাঁড়া-হাতে সিংহের সন্ধানে ছুটে চলত; কিন্তু নাগাদিত্য আজ বারবার ভেরি বাজালেন, বারবার শিকারীর দল চীৎকার করে উঠল, তবু সেই প্রকাণ্ড বনে একটিও বাঘের গর্জন, একটিও পাখির ঝটাপট কিম্বা হরিণের খুরের খুটখাট শোনা গেল না—মনে হল, সমস্ত পাহাড় যেন ঘুমিয়ে আছে। রাগে নাগাদিত্যের দুই চক্ষু লাল হয়ে উঠল। তিনি দলবলের দিকে ফিরে বললেন, "ঘোড়া ফেরাও। অসন্তুষ্ট ভিল-প্রজা এ বনের সমস্ত পশু অন্য পাহাড়ে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে। চলো, আজ গ্রামে-গ্রামে, নগরে-নগরে পশুর সমান ভিলের দল শিকার করি গে।"

মহারাজার রাজহস্তী শুঁড় দুলিয়ে কান কাঁপিয়ে পাহাড়ের উপর ইদরপুরের দিকে ফিরে দাঁড়াল—তার পিঠের উপর সোনার হাওদা, জরির বিছানা হীরের মতো জ্বলে উঠল, তার চারি দিকে ঘোড়ায়-চড়া রাজপুতের দুশো বল্লম সকালের আলোয় ঝকমক করতে লাগল। নাগাদিত্য হুকুম দিলেন—"চালাও!" তখন কোথা থেকে গভীর গর্জনে, সমস্ত পাহাড় যেন ফাটিয়ে দিয়ে প্রকাণ্ড একটা কালো বাঘ, যেন একজন ভিল সেনাপতির মতো সেই অত্যাচারী রাজার পথ আগলে পাহাড়ের সুঁড়ি পথে রাজহস্তীর সম্মুখে এসে দাঁড়াল। নাগাদিত্য মহা আনন্দে ডান হাতে বল্লম নিয়ে হাতির পিঠে ঝুঁকে বসলেন। কিন্তু তাঁর হাতের বল্লম হাতেই রইল—বনের অন্ধকার থেকে কালো চামরে সাজানো প্রকাণ্ড একটা তীর তাঁর বুকের একদিক থেকে আর-একদিক ফাটিয়ে দিয়ে শনশন শব্দে বেরিয়ে গেল। অত্যাচারী নাগাদিত্য ভিলদের হাতে প্রাণ হারালেন। তার পর চারি দিক থেকে হাজার-হাজার কালো বাঘের মতো কালো-কালো ভিল ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে রাজপুতের রক্তে পাহাড়ের গা রাঙা করে তুললে; একজনও রাজপুত বেঁচে রইল না; কেবল সোনার সাজপরা মহারাজ নাগাদিত্যের কালো পাহাড়ী ঘোড়া অন্ধকার সমুদ্রের সমান ভিল-সৈন্যের মাঝ দিয়ে ঝড়ের মতো রাজবাড়ির দিকে বেরিয়ে গেল।

রাজমহিষী তখন ইদরপুরে কেল্লার ছাদে রাজকুমার বাপ্পাকে কোলে নিয়ে সন্ধ্যার হাওয়ায় বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিলেন, আর এক-একবার যে-পাহাড়ে মহারাজ শিকারে গিয়েছেন, সেইদিকে চেয়ে দেখছিলেন। এক সময়ে হঠাৎ পাহাড়ের দিকে একটা গোলমাল উঠল; তার পর রানী দেখলেন, সেই পাহাড়ে-রাস্তায়, বনের অন্ধকার থেকে মহারাজার কালো ঘোড়াটি তীরের মতো ছুটে বেরিয়ে আসতে লাগল—পিছনে তার শত-শত ভিল—কারো হাতে বল্লম, কারো হাতে বা তীর-ধনুক! মহারানী দেখলেন, কালো ঘোড়ার মুখ

থেকে শাদা ফেনা চারি দিকে মুক্তোর মতো ঝরে পড়ছে, তার বুকের মাঝ থেকে রক্তের ধারা রাস্তার ধুলোয় ছড়িয়ে যাচ্ছে; তার পর দেখলেন, আগুনের মতো একটি তীর তার কালো-চুলের ভিতর দিয়ে ধনুকের মতো তার সুন্দর বাঁকা ঘাড় সজোরে বিঁধে ঘোড়াটাকে মাটির সঙ্গে গেঁথে ফেললে; রাজার ঘোড়া কেল্লার দিকে মুখ ফিরিয়ে ধুলোর উপর ধড়ফড় করতে লাগল। ঠিক সেই সময় মহারানীর মাথার উপর দিয়ে একটা বল্লম শনশন শব্দে কেল্লার ছাদের উপর এসে পড়ল। রাজমহিষী ঘুমন্ত বাপ্পাকে ওড়নার আড়ালে ঢেকে তাড়াতাড়ি উপর থেকে নেমে এলেন। চারি দিকে অস্ত্রের ঝনঝনি আর যুদ্ধের চীৎকার উঠল—সূর্যদেব মালিয়া-পাহাড়ের পশ্চিমে অস্ত গেলেন।

সে রাত্রি কী ভয়ানক রাত্রি! সেই মালিয়া-পাহাড়ের উপর অসংখ্য ভিল, তার মাঝে গুটিকতক রাজপুত প্রাণপণে যুদ্ধ করতে লাগলেন; আর অন্ধকার রাজপুরে নাগাদিত্যের বিধবা মহিষী পাঁচ বৎসরের রাজকুমার বাপ্পাকে বুকে নিয়ে নির্জন ঘরে বসে রইলেন; তিনি কতবার কত দাসীর নাম ধরে ডাকলেন—কারো সাড়া-শব্দ নেই। মহারাজের খবর জানবার জন্যে তিনি কতবার কত প্রহরীকে চীৎকার করে ডাকলেন, কিন্তু তারা সকলেই যুদ্ধে ব্যস্ত, মহারানীর ঘরের ভিতর দিয়ে ছুটে গেল, তবু তাঁর কথায় কর্ণপাতও করলে না। রানী তখন আকুল হৃদয়ে কোলের বাপ্পাকে ছোটো একখানি উটের কম্বলে ঢেকে নিয়ে অন্দর-মহলের চন্দনকাঠের প্রকাণ্ড দরজা সোনার চাবি দিয়ে খুলে বাইরে উঁকি মেরে দেখলেন—রাত্রি অন্ধকার, রাজপুরী অন্ধকার; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের খিলান, তার মাঝে গজদন্তের কাজ-করা বড়ো-বড়ো দরজা খোলা—হাঁ হাঁ করছে; অত-বড়ো রাজপুরীতে যেন জনমানব নেই।

মহারানী অবাক হয়ে এক-হাতে বাপ্পাকে বুকে ধরে আর-হাতে সোনার চাবির গোছা নিয়ে খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন। হঠাৎ সেই অন্ধকারে কার পায়ের শব্দ শোনা গেল; চামড়ার জুতো-পরা রাজপুত-বীরের মচমচ পায়ের শব্দ নয়, রুপোর বাঁকি-পরা রাজদাসীর ঝিনিঝিনি পায়ের শব্দ নয়, কাঠের খড়ম-পরা পঁচাত্তর বৎসরের বুড়ো রাজপুরোহিতের খটাখট পায়ের শব্দ নয়—এ যেন চোরের মতো, সাপের মতো খুসখাস, খিটখাট পায়ের শব্দ! মহারানী ভয় পেলেন। দেখতে-দেখতে অসুরের মতো একজন ভিল-সর্দার তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হল। মহারানী জিজ্ঞাসা করলেন, "কে তুই? কি চাস?" ভিল-সর্দার বাঘের মতো গর্জন করে বললে, "জানিস নে আমি কে? আমি সেই দুঃখী ভিল, যার মেয়েকে তোর মহারাজা দাসীর মতো চিতোরের রাজাকে দিয়ে দিয়েছে। আজ কী সুখের দিন! এই হাতে নাগাদিত্যের বুকে বল্লম বসিয়েচি, আজ এই হাতে তার ছেলে সুদ্ধ মহারানীকে দাসীর মতো বেঁধে নিয়ে যাব।" মহারানীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে উঠল। "ভগবান রক্ষা করো!" বলে তিনি

সেই নিরেট সোনার বড়ো-বড়ো চাবির গোছা সজোরে ভিল-সর্দারের কপালে ছুঁড়ে মারলেন। দুরন্ত ভিল "মা রে!" বলে চীৎকার করে ঘুরে পড়ল; মহারানী কচি বাপ্পাকে বুকে ধরে রাজপুরী থেকে বেরিয়ে পড়লেন—তাঁর প্রাণের আধখানা মহারাজ নাগাদিত্যের জন্য হাহাকার করতে লাগল, আর আধখানা এই মহাবিপদে প্রাণের বাপ্পাকে রক্ষা করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল।

রানী পথ চলতে লাগলেন—পাথরে পা কেটে গেল, শীতে হাত জমে গেল, অন্ধকারে বারবার পথ ভুল হতে লাগল—তবু রানী পথ চললেন। কত দূর! কত দূর!—পাহাড়ের পথ কত দূর? কোথায় চলে গেছে, তার যেন শেষ নেই! রানী কত পথ চললেন, তবু সে পথের শেষ নেই! ক্রমে ভোর হয়ে গেল, রাস্তার আশেপাশে বীরনগরের দু-একটি ব্রাহ্মণের বাড়ি দেখা দিতে লাগল। পাহাড়ী হাওয়া বরফের মতো ঠাণ্ডা, পাখিরাও তখন জাগে নি, এমন সময় নাগাদিত্যের মহিষী রাজপুত্র বাপ্পাকে কোলে নিয়ে সেই বীরনগরের ব্রাহ্মণী কমলাবতীর বাড়ির দরজায় ঘা দিলেন। আটপুরুষ আগে, একদিন শিলাদিত্যের মহিষী পুষ্পবতী প্রাণের কুমার গোহকে এই বীরনগরের কমলাবতীর হাতে সঁপে গিয়েছিলেন; আর আজ আবার কতকাল পরে সেই কমলাবতীর নাতির নাতি বৃদ্ধ রাজ-পুরোহিতের হাতে গোহর বংশের গিহেলোট-রাজকুমার বাপ্পাকে সঁপে দিয়ে নাগাদিত্যের মহিষী চিতার আগুনে ঝাঁপ দিলেন।

সকালে বৃদ্ধ পুরোহিত রাজপুত্রকে আশ্রয় দিলেন, আর সেই দিন সন্ধ্যার সময় একটি ভিলের মেয়ে ছোটো-ছোটো দুটি ছেলে কোলে তাঁরই ঘরে আশ্রয় নিলে। এদেরই পূর্বপুরুষ সর্ব-প্রথমে নিজের আঙুল কেটে রাজপুত গোহের কপালে রক্তের রাজ-তিলক টেনে দিয়েছিল—আজ রাজপুত রাজার সঙ্গে তাদেরও সর্বনাশ হয়ে গেল; বিদ্রোহী ভিলেরা তাদের ঘর-দুয়োর জ্বালিয়ে দিয়ে তাদের তিনটিকে পাহাড়ের উপর থেকে দূর করে দিলে। রাজপুরোহিত সেই তিনটি ভিল আর রাজকুমার বাপ্পাকে নিয়ে বীরনগর ছেড়ে ভাণ্ডীরের কেল্লায় যদুবংশের আর-এক ভিলের রাজত্বে কিছুদিন কাটালেন। কিন্তু সেখানেও ভিল রাজা; সেখানেও ভয় ছিল—কোনো দিন কোনো ভিল মা-হারা বাপ্পাকে খুন করে! ব্রাহ্মণ যে মহারাণীর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন, বিপদে-সম্পদে অনাথ বাপ্পাকে রক্ষা করবেন। তিনি একেবারে ভিল রাজত্ব ছেড়ে তাদের কটিকে নিয়ে নগেন্দ্রনগরে চলে গেলেন। এক দিকে সমুদ্রের তিনটে ঢেউয়ের মতো ত্রিকূট পাহাড়, আর-এক দিকে মেঘের মতো অন্ধকার পরাশর-অরণ্য, মাঝখানে নগেন্দ্রনগর, কাছাকাছি শোলাঙ্কি-বংশের একজন রাজপুত রাজার রাজবাড়ি। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেই নগেন্দ্রনগরে ব্রাহ্মণ-পাড়ার গা ঘেঁষে ঘর বাঁধলেন। সেই ভিলের মেয়ে তাঁর ঘরের সমস্ত কাজ করতে লাগল, আর রাজপুত্র বাপ্পা সেই দুটি ভাই—ভিল বালিয় আর দেবকে নিয়ে মাঠে-মাঠে বনে-বনে গোরু চরিয়ে রাখাল-

বালকদের সঙ্গে রাখালের মতো খেলে বেড়াতে লাগলেন। রাজপুরোহিত কারো কাছে প্রকাশ করলেন না যে বাপ্পা রাজার ছেলে; কেবল একটি তামার কবচে আগাগোড়া সমস্ত পরিচয় নিজের হাতে লিখে বাপ্পার গলায় বেঁধে দিলেন—তাঁর মনে বড়ো ভয় ছিল, পাছে কোনো ভিল বাপ্পার সন্ধান পায়।

ক্রমে বাপ্পা যখন বড়ো হয়ে উঠলেন; যখন মাঠে-মাঠে খোলা হাওয়ায় ছুটোছুটি করে, পাহাড়ে-পাহাড়ে ওঠা-নামাতে রাজপুত্র বাপ্পার সুন্দর শরীর দিন-দিন লোহার মতো শক্ত হয়ে উঠল; যখন তিনি ক্ষেপা মোষ এক-হাতে ঠেকিয়ে রাখতে পারতেন; সমস্ত রাখাল-বালক যখন রাজপুত্র বলে না জেনেও রাজার মতো বাপ্পাকে ভয় ভক্তি সেবা করতে লাগল, তখন ব্রাহ্মণ অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন। তিনি তখন বাপ্পার শরীরের সঙ্গে মনকেও গড়ে তুলতে লাগলেন। তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় একলা ঘরে বাপ্পার কাছে বসে সেই মালিয়া-পাহাড়ের গল্প, সেই ভিল-বিদ্রোহের গল্প, সেই রানী পুষ্পবতী, মহারাজ শিলাদিত্য, রাজকুমার গোহ, তাঁর প্রিয় বন্ধু মাণ্ড-লিকের কথা একে-একে বলতে লাগলেন। শুনতে-শুনতে কখনো বাপ্পার চোখে জল আসত, কখনো বা রাগে মুখ লাল হয়ে উঠত, কখনো ভয়ে প্রাণ কাঁপত। বাপ্পা সারারাত্রি কখনো সূর্যের রথ, কখনো পাহাড়ের ভিলের যুদ্ধ, স্বপ্নে দেখে জেগে উঠতেন; মনে ভাবতেন—আমিও কবে হয়তো রাজা হব, লড়াই করব।

এমনি ভাবে দিন কাটছিল। সেই সময় একদিন শ্রাবণ মাসে নতুন-নতুন ঘাসের উপর গোরুগুলি চরতে দিয়ে বনের পথে বাপ্পাদিত্য একা-একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। সেদিন ঝুলন-পর্ব, রাজপুতদের বড়ো আনন্দের দিন; সকাল না হতে দলে-দলে রাখাল নতুন কাপড় পরে, কেউ ছোটো ভাই-বোনকে কোলে করে, কেউ বা দৈয়ের ভার কাঁধে নিয়ে, একজন তামাশা দেখতে, অন্য জন বা পয়সা করতে নগেন্দ্রনগরের রাজপুতরাজার বাড়ির দিকে মেলা দেখতে ছুটল। বাপ্পা প্রকাণ্ড বনে একলা রইলেন; তাঁর প্রাণের বন্ধু, দুটি ভাই—ভিল বালিয় আর দেব, দিদির হাত ধরে এই আনন্দের দিনে বাপ্পাকে কতবার ডাকলে,—"ভাই, তুই কি রাজবাড়ি যাবি?" বাপ্পা শুধু ঘাড় নাড়লেন—"না, যাব না।" হয়তো তাঁর মনে হয়েছিল—আমার ভাই নেই, বোন নেই, মা নেই, আমি কার হাত ধরে কাকে নিয়ে আজ কিসের আনন্দের মেলা দেখতে যাব? কিন্তু যখন বালিয় আর দেব ভিল্‌নীদিদির সঙ্গে-সঙ্গে হাসতে-হাসতে চলে গেল, যখন সকালের রোদ মেঘের আড়ালে ঢেকে গেল, বাপ্পার একটিমাত্র গাই চরতে-চরতে যখন মাঠের পর মাঠ পার হয়ে বনের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল, যখন বনে আর সাড়া-শব্দ নেই, কেবল মাঝে-মাঝে ঝিঁঝির ঝিনিঝিনি, পাতার ঝুরুঝুরু, সেই সময় বাপ্পার বড়োই একা-একা ঠেকতে লাগল। তিনি উদাস প্রাণে ভিল্‌নীদিদির মুখে-শোনা ভিল-রাজত্বের একটি পাহাড়ি গান, ছোটো একটি বাঁশের বাঁশিতে বাজাতে

লাগলেন। সেই গানের কথা বোঝা গেল না, কেবল ঘুমপাড়ানি গানের মতো তার বুনো সুরটা মেঘলা দিনে বাদলা হওয়ায় মিশে স্বপ্নের মতো বাপ্পার চারি দিকে ভেসে বেড়াতে লাগল। আজ যেন তাঁর মনে পড়তে লাগল—ঐ পশ্চিম দিকে, যেখানে মেঘের কোলে সূর্যের আলো ঝিকিমিকি জ্বলছে, যেখানে কালো-কালো মেঘ পাথরের মতো জমাট বেঁধে রয়েছে, সেইখানে, সেই অন্ধকার আকাশের নীচে, তাঁদের যেন বাড়ি ছিল; সেই বাড়ির ছাদে চাঁদের আলোয় তিনি মায়ের হাত ধরে বেড়িয়ে বেড়াতেন; সে বাড়ি কী সুন্দর! সে চাঁদের কী চমৎকার আলো! মায়ের কেমন হাসিমুখ! সেখানে সবুজ ঘাসে হরিণছানা চরে বেড়াত; গাছের উপরে টিয়ে পাখি উড়ে বসত; পাহাড়ের গায়ে ফুলের গোছা ফুটে থাকত—তাদের কী সুন্দর রঙ, কী সুন্দর খেলা! বাপ্পা সজল নয়নে মেঘের দিকে চেয়ে চেয়ে বাঁশের বাঁশিতে ভিলের গান বাজাতে লাগলেন—বাঁশির করুণ সুর কেঁদে-কেঁদে, কেঁপে-কেঁপে বন থেকে বনে ঘুরে-ঘুরে বেড়াত লাগল।

সেই বনের একধারে আজ ঝুলন-পূর্ণিমায় আনন্দের দিনে, শোলাঙ্কিবংশের রাজার মেয়ে সখীদের নিয়ে খেলে বেড়াচ্ছিলেন, রাজকুমারী বললেন, "শুনেছিস ভাই, বনের ভিতর রাখাল-রাজা বাঁশি বাজাচ্ছে!" সখীরা বললে, "আয় ভাই, সকলে মিলে চাঁপাগাছে দোলা খাটিয়ে ঝুল্‌নো-খেলা খেলি আয়!" কিন্তু দোলা খাটাবার দড়ি নেই যে! সেই বৃন্দাবনের মতো গহন বন, সেই বাদলা দিনের গুরুগর্জন, সেই দূরে বনে রাখাল-রাজের মধুর বাঁশি, সেই সখীদের মাঝে শ্রীরাধার সমান রূপবতী রাজ-নন্দিনী, সবই আজ যুগ-যুগান্তরের আগেকার বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-রাধার প্রথম ঝুলনের মতো! এমন দিন কি ঝুল্‌না বাঁধার একগাছি দড়ির অভাবে বৃথা যাবে? রাজনন্দিনী গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন। আবার সেই বাঁশি, পাখির গানের মতো, বনের এপার থেকে ওপার আনন্দের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে বেজে উঠল। রাজকুমারী তখন হীরে-জড়ানো হাতের বালা সখীর হাতে দিয়ে বললেন, "যা ভাই, এই বালার বদলে ঐ রাখালের কাছ থেকে একগাছা দড়ি নিয়ে আয়।"

রাজকুমারীর সখী সেই বালা-হাতে বাপ্পার কাছে এসে বললে, "এই বালার বদলে রাজকুমারীকে একগাছা দড়ি দিতে পার?"

হাসতে-হাসতে বাপ্পা বললেন, "পারি, যদি রাজকুমারী আমায় বিয়ে করেন।"

সেইদিন সেই নির্জন বনে, রাজকুমারীর হাতে সেই হীরের বালা পরিয়ে দিয়ে রাজকুমার বাপ্পা চাঁপাগাছে ঝুল্‌না বেধে নিয়ে রাজকন্যার হাত ধরে বসলেন। চারি দিকে যত সখী দোলার উপর বর-কনেকে ঘিরে-ঘিরে ঝুলনের গান গেয়ে ফিরতে লাগল—"আজ কী আনন্দ! আজ কী আনন্দ" খেলা শেষ হল, সন্ধ্যা হল; রাজকুমারী বনের রাখালকে বিয়ে করে রাজবাড়িতে ফিরে গেলেন; আর বাপ্পা ফুলে-ফুলে-প্রফুল্ল

চাঁপার তলায় বসে ঝুলন-পূর্ণিমার প্রকাণ্ড চাঁদের দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলেন—আজ কী আনন্দ! আজ কী আনন্দ!

হঠাৎ একটুখানি পুবের হাওয়া গাছের পাতা কাঁপিয়ে ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে হু-হু শব্দে পশ্চিমদিকে চলে গেল। সেই সঙ্গে বড়ো-বড়ো দুটি বৃষ্টির ফোঁটা টুপটাপ করে চাঁপাগাছের সবুজ পাতার উপর ঝরে পড়ল। বাপ্পা আকাশের দিকে চেয়ে দেখলেন—পশ্চিমদিক থেকে একখানা কালো মেঘ ক্রমশ পুবদিকে এগিয়ে চলেছে—মাঝে-মাঝে গুরুগুরু গর্জন আর ঝিকিমিকি বিদ্যুৎ হানছে। বাপ্পা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন; মনে পড়ল, ঘরে ফিরতে হবে। দুধের মতো সাদা তার ধবলী গাই বনের মাঝে ছাড়া আছে। তিনি চাঁপাগাছ থেকে ছাদন খুলে নিয়ে ধবলী গাইটির সন্ধানে চললেন। তখন চারি দিক অন্ধকার, মাঝে-মাঝে গাছে-গাছে রাশি-রাশি জোনাকি পোকা হীরের মতো ঝকঝক করছে, আর জায়গায়-জায়গায় ভিজে মাটির নরম গন্ধ বনস্থল পরিপূর্ণ করছে। বাপ্পা সেই অন্ধকার বনের পথে-পথে ধবলীর সন্ধানে ফিরতে লাগলেন। হঠাৎ এক জায়গায়, ঘন বেতের বনের আড়ালে বাপ্পা দেখলেন—এক তেজোময় ঋষি ধ্যানে বসে আছেন; ঠিক তাঁর সম্মুখে মহাদেবের নন্দীর মতো তাঁর ধবলী গাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর সেই সাদা গাইয়ের গাঢ় দুধ সুধার মতো একটি শ্বেতপাথরের শিবের মাথায় আপনা-আপনি ঝরে পড়ছে। বাপ্পা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ক্রমে ধ্যান ভঙ্গে মহর্ষির দুটি চোখ সকাল-বেলায় পদ্মের পাপড়ির মতো ধীরে-ধীরে খুলে গেল। মহর্ষি মহাদেবকে প্রণাম করে এক অঞ্জলি দুধের ধারা পান করলেন। তার পর বাপ্পার দিকে ফিরে বললেন, "শোনো বৎস, আমি মহর্ষি হারীত। তোমায় আশীর্বাদ করছি তুমি দীর্ঘজীবী হও, পৃথিবীর রাজা হও। তোমার ধবলীর দুধের ধারায় আজ আমি বড়োই তুষ্ট হয়েছি। আজ আমার মহাপ্রস্থানের দিন, এই শেষ দিনে তোমায় আর কি দেব? এই ভগবতী ভবানীর খাঁড়া, এই অক্ষয় ধনুঃশর—এই খাঁড়া পাহাড়ও বিদীর্ণ করে, এই ধনুঃশর পৃথিবী জয় করে দেয়—এই দুটি তুমি লও। আর বৎস, ভগবান্ একলিঙ্গের এই শ্বেতপাথরের মূর্তিটি সঙ্গে রেখো, সর্বদা এঁর পূজা করবে। আজ হতে তোমার নাম হল—একলিঙ্গকা দেওয়ান। তোমার বংশে যত রাজা, এই নামেই সিংহাসনে বসবে।" তার পর নিজের হাতে বাপ্পার গলায় চামড়ার পৈতে জড়িয়ে দিয়ে মহর্ষি সমাধিতে বসলেন। দেখতে-দেখতে তাঁর পবিত্র শরীর আগুনের মতো ধু-ধু করে জ্বলে গেল। বাপ্পা কোমরে খাঁড়া, হাতে ধনুঃশর, মাথায় একলিঙ্গের মূর্তি ধরে ধবলী গাইয়ের পিছনে-পিছনে ফিরে চললেন—মেঘের গুরুগুরু, দেবতার দুন্দুভির মতো, সমস্ত আকাশ জুড়ে বাজতে লাগল।

তখন ভোর হয়েছে, মেলা-শেষে মলিন মুখে যে যার ঘরে ফিরছে, বাপ্পা সেই

যাত্রীদের সঙ্গে ঘরে ফিরলেন।

কিছুদিন পরেই বাপ্পাকে নগেন্দ্রনগর ছেড়ে যেতে হল। ঝুলন-পূর্ণিমার খেলাচ্ছলে দুজনে বিয়ে হবার পর বিদেশ থেকে রাজকুমারীর বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে এক ব্রাহ্মণ রাজসভায় উপস্থিত হলেন। সেইদিন সন্ধ্যাবেলা নগেন্দ্রনগরে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে ব্রাহ্মণ রাজকন্যার হাত দেখে গুণে বলেছেন, আগেই নাকি কোনো বিদেশীর সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে হয়ে গেছে! আজ রাজার গুপ্তচর সেই বিদেশীর সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে—রাজা তার মাথা আনতে হুকুম দিয়েছেন। কথাটা শুনে বাপ্পার মন অস্থির হয়ে উঠল, ভাবনায়-ভাবনায় সমস্ত রাত্রি কাটিয়ে ভোরে উঠে তিনি দেশ ছেড়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। যাবার সময় বাপ্পা তাঁর পালক-পিতা পঁচাশি বৎসরের সেই রাজপুরোহিতের কাছে সমস্ত কথা প্রকাশ করে বললেন, "পিতা, আমায় বিদায় দাও। আমি তো এখন বড়ো হয়েছি, আমার জন্যে তোমরা কেন বিপদে পড়?" ব্রাহ্মণ বললেন, "বৎস, তুমি জানো না তুমি কে; তুমি রাজপুত্র, তোমার মা তোমাকে আমার হাতে সঁপে গেছেন; আমি আজ এই অল্প বয়েসে একা ভিখারীর মতো তোমাকে কেমন করে বিদায় করব?" বাপ্পা তখন ভগবতীর সেই খাঁড়া আর অক্ষয় ধনুঃশর দেখিয়ে বললেন, "পিতা, বিদেশে এরাই আমার সহায়, আর আছেন একলিংগজি।" ব্রাহ্মণ তখন আনন্দে দুই হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন—"যাও বৎস, তুমি রাজার ছেলে, রাজারই মতো ধনুঃশর হাতে পেয়েছ। আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আশীর্বাদ করছি—পৃথিবীর রাজা হও। যদি কেউ তোমার পরিচয় চায়, তবে গলার কবচ খুলে দেখিয়ে দিও কোন্ পবিত্র বংশে তোমার জন্ম, তোমার পূর্বপুরুষেরা কোন্ রাজসিংহাসন উজ্জ্বল করে গেছেন! যাও বৎস, সুখে থাক!"

ব্রাহ্মণের কাছে বিদায় হয়ে বাপ্পা ভিল্নীদিদির কাছে বিদায় হতে চললেন, কিন্তু সেখানে বিদায় নেওয়া ততটা সহজ হল না। অনেক কাঁদাকাটার পর ভিল্নী-দিদি বললেন, "বাপ্পা রে, যদি যাবি তবে তোর দুটি ভাই—বালিয় ও দেবকে সাথে নে। ওরে বাপ্পা, তোকে একা ছেড়ে দিতে প্রাণ আমার কেমন-কেমন করে যে!" তার পর তিন জনের হাতে তিন-তিনখানি পোড়া রুটি দিয়ে ভিল্নীদিদি তিনটি ভাইকে বিদায় করলেন। বালিয় ও দেবকে সঙ্গে নিয়ে বাপ্পা গহন বনে চলে গেলেন। সেখানে বড়ো-বড়ো পাথরের থামের মতো প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ি আকাশের দিকে ঠেলে উঠছে, কোথাও ময়ূর-ময়ূরী বন আলো করে উড়ে বেড়াচ্ছে; কোথাও আস্ত ছাগল গিলে প্রকাণ্ড একটা অজগর স্থির হয়ে পড়ে; কোথাও বাঘের গর্জন, কোথাও বা পাখির গান; এক-জায়গায় সবুজ ঘাসে সোনার রোদ, আর-জায়গায় কাজলের সমান নীল অন্ধকার। বালিয় ও দেবকে সঙ্গে নিয়ে বাপ্পা কখনো বনের মনোহর শোভা দেখতে-দেখতে, কখনো মহা-মহা বিপদের মাঝখান দিয়ে ভগবতী ভবানীর খাঁড়া-হাতে

নির্ভয়ে চললেন।

সেই প্রকাণ্ড পরাশর-অরণ্য পার হতে তাঁর তিন দিন তিন রাত কেটে গেল, রাজপুত্র বাপ্পা সেই তিন দিন, তিনখানি পোড়া রুটি খেয়ে কাটিয়ে দিলেন। তার পর গ্রামের পর গ্রাম, দেশের পর দেশ পার হয়ে, কত বর্ষা, কত শীত, পথে-পথে কাটিয়ে, বাপ্পা মেবারে মৌর্যবংশীয় রাজা মানের রাজধানী চিতোর নগরে উপস্থিত হলেন। সেখানে তখন মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধের মহা আয়োজন হচ্ছে। হাতির পিঠে, উটের উপরে গোলাগুলি, চাল-ডাল, তাম্বু-কানাত; গোরুর গাড়িতে অস্ত্র-শস্ত্র, খাবার-দাবার; বড়ো-বড়ো জালায় খাবার জল, রাঁধবার ঘি তোলা হচ্ছে। রাস্তায়-রাস্তায় রাজপুত সৈন্য মাথায় পাগড়ি, হাতে বল্লম ঘুরে বেড়াচ্ছে। চারি দিকে রাজার চর মুসলমানের সন্ধানে-সন্ধানে ফিরছে। মহারাজা মান নিজে সামন্ত-রাজাদের নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন দেখে বেড়াচ্ছেন—চারি দিকে হৈ-হৈ পড়ে গেছে।

এত গোলমাল, এত লোকজন, এমন প্রকাণ্ড নগর, এত বড়ো-বড়ো পাথরের বাড়ি বাপ্পা এ পর্যন্ত কখনো দেখেন নি। নগেন্দ্রনগরে বাড়ি ছিল বটে, কিন্তু তার মাটির দেয়াল। সেখানেও মন্দির ছিল, কিন্তু সে কত ছোটো! বাপ্পা আশ্চর্য হয়ে রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন, বালিয় আর দেব বড়ো-বড়ো হাতি দেখে অবাক হয়ে হাঁ করে রইল। সেই সময়ে রাজা মান ঘোড়ায় চড়ে সেই রাস্তায় উপস্থিত হলেন; সাদা ঘোড়ার সোনার সাজ মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে, মাথায় রাজচ্ছত্র ঝলমল করছে, দুই দিকে দুই জন ময়ুর-পাখার চামর ঢোলাচ্ছে! বাপ্পা ভাবলেন—রাজার সঙ্গে দেখা করবার এই ঠিক সময়। তিনি তৎক্ষণাৎ বালিয় ও দেবের হাত ধরে রাস্তার মাঝে উপস্থিত হয়ে ভগবতী ভবানীর খাঁড়া কপালে স্পর্শ করে মহারাজকে প্রণাম করলেন। রাজা মান জিজ্ঞাসা করলেন, "কে তুমি? কি চাও?" বাপ্পা বললেন, "আমি রাজপুত রাজার ছেলে, আপনার আশ্রয়ে রাজার মতো থাকতে চাই।" এই ভিখারী আবার রাজার ছেলে! চারি দিকে বড়ো-বড়ো সর্দার মুখ টিপে হাসতে লাগলেন, কিন্তু রাজা মান বাপ্পার প্রকাণ্ড শরীর, সুন্দর মুখ, অক্ষয় ধনুঃশর আর সেই ভবানীর খাঁড়া দেখেই বুঝেছিলেন—এ কোনো ভাগ্যবান; ভগবান কৃপা করে এই মুসলমান-যুদ্ধের সময় এই বীরপুরুষকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। মান-রাজা তৎক্ষণাৎ নিজের জরির শাল বাপ্পার গায়ে পরিয়ে দিয়ে একটা কালো ঘোড়া বাপ্পার জন্যে আনিয়ে দিলেন। বাপ্পা বললেন, "মহারাজ, আমার ভিল ভাইদের জন্যে ঘোড়া আনিয়ে দিন।" তার পর, বালিয় ও দেবকে ঘোড়ায় চড়িয়ে বাপ্পা সেই কালো ঘোড়ায় উঠে বসলেন—সমস্ত সৈন্য-সামন্ত ও সেনাপতি মাথার উপর বাপ্পার প্রকাণ্ড শরীর, সমুদ্রের মাঝে পাহাড়ের মতো, প্রায় আধখানা জেগে রইল; তখন রাস্তার লোক দেখে বলতে লাগল—"হ্যাঁ বীর বটে! যেমন চেহারা, তেমনি শরীর!" চারি দিকে ধন্য-ধন্য পড়ে গেল; কেবল

রাজার যত সেনাপতি মাথার উপরে রাজবেশ-মোড়া সেই ভিখারীকে দেখে মান-রাজার উপর মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেন। রাজা দিন-দিন বাপ্পাকে যতই সুনয়নে দেখতে লাগলেন, যতই তাকে আদর-অভ্যর্থনা করতে লাগলেন, ততই সেনাপতিদের মন হিংসার আগুনে পুড়তে লাগল।

ক্রমে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধের দিন উপস্থিত হল। সেইদিন রাজসভায় দেশ-বিদেশের যত সামন্ত-রাজা, যত বুড়ো-বুড়ো সেনাপতি একমত হয়ে মান-রাজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বললেন, "মহারাজ, আমরা অনেক সময় অনেক যুদ্ধে তোমার জন্য প্রাণ দিতে গিয়েছি সে কেবল তুমি আমাদের ভালোবাসতে বলে, আমাদের বিশ্বাস করতে বলে; যদি মহারাজ, আজ তুমি সেই ভালোবাসা ভুলে একজন পথের ভিখারীকে আমাদের সকলের উপরে বসালে, বাপ্পা আজ যদি তোমার প্রাণের চেয়ে প্রিয়, সকলের চেয়ে বিশ্বাসী হল— তবে আমাদের আর কাজ কী? বাপ্পাকেই এই মুসলমান-যুদ্ধে সেনাপতি করো; আমাদের বীরত্ব তো অনেকবার দেখা আছে এবার নতুন সেনাপতি কেমন করে যুদ্ধ করেন, দেখা যাক!" মহারাজ মান চিরবিশ্বাসী রাজভক্ত সর্দারের মুখে হঠাৎ এই নিষ্ঠুর কথা শুনে বজ্রাহতের মতো স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন, তাঁর আর কথা বলবার শক্তি থাকল না। তখন সেই প্রকাণ্ড রাজসভায় সেই বিদ্রোহী সর্দারদের মধ্যস্থলে পনেরো বৎসরের বীর বালক বাপ্পাদিত্য উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "শুনুন মহারাজ! আজ রাজস্থানের প্রধান-প্রধান সর্দারেরা রাজসভায় দাঁড়িয়ে বলছেন—এ ঘোর বিপদের সময় বাপ্পাই এবার সেনাপতি হয়ে যুদ্ধ চালান; তবে তাই হোক!" রাজা মান হতাশের মতো চারি দিকে চেয়ে দেখলেন; তার পর ধীরে ধীরে বললেন, "তবে তাই হোক।" তার পর একদিক দিয়ে মূর্ছিতপ্রায় মান-রাজা চাকরের কাঁধে ভর দিয়ে অন্তঃপুরে চলে গেলেন; আর-একদিক দিয়ে বাপ্পাদিত্য সৈন্য সাজাতে বাহির হলেন।

বিদ্রোহী সর্দারদের মাথা হেঁট হল। তাঁরা মনে ভেবেছিলেন যে, পনেরো বৎসরের বালক বাপ্পা যুদ্ধে যেতে কখনোই সাহস পাবে না—সভার মাঝে অপমান হবে; কিন্তু যখন সেই বীর বালক নির্ভয়ে হাসিমুখে এই ভয়ংকর যুদ্ধের ভার রাজার কাছে চেয়ে নিলে, তখন তাঁদের বিস্ময়ের সীমা রইল না। তাঁরা আরো আশ্চর্য হলেন, যখন সেই বাপ্পা—যাঁকে তাঁরা একদিন পথের ভিখারী বলে ঘৃণা করেছেন—পনেরো বৎসরের সেই বালক বাপ্পা—যুদ্ধ জয় করে কোটি-কোটি রাজপুত-প্রজার আশীর্বাদ, জয়জয়কারের মধ্যে একদিন শুভদিনে শুভক্ষণে, সমস্ত রাজস্থানে রাজমুকুটের সমান রাজপুতের রাজধানী চিতোর নগরে ফিরে এলেন। সেদিন সমস্ত রাজস্থান বেড়ে কী আনন্দ, কী উৎসাহ!

নতুন সেনাপতি বাপ্পা সমস্ত রাজস্থানকে ভয়ংকর মুসলমানের হাত থেকে রক্ষা

করে যেদিন চিতোর নগরে ফিরে এলেন, সেইদিন রাজা-মানের বুড়ো-বুড়ো সর্দারেরা ক্ষুণ্ণমনে রাজসভা ছেড়ে গেলেন। মহারাজ মান তাঁদের ফিরিয়ে আনতে কতবার চেষ্টা করলেন, কাকুতি-মিনতি, এমন-কি, শেষে রাজগুরুকে পর্যন্ত তাঁদের কাছে পাঠালেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না; সর্দারেরা দূতের মুখে বলে পাঠালেন—"আমরা মহারাজের নিমক খেয়েছি, এক বৎসর পর্যন্ত আমরা শত্রুতা করব না, বৎসর শেষ হলে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা হবে।"

সেই এক বৎসর কত ভীষণ ষড়যন্ত্র, কত ভয়ংকর পরামর্শে কেটে গেল! এক বৎসর পরে সেই বিদ্রোহী সর্দারদের দুষ্ট পরামর্শে রাজা-মানকে ভুল বুঝে বাপ্পা তাঁদের সকলের সেনাপতি হয়ে যুদ্ধে চললেন। রাজা-মান যখন শুনলেন, বাপ্পা তাঁর রাজসিংহাসন কেড়ে নিতে আসছেন; যখন শুনলেন যে-বাপ্পাকে তিনি পথের ধুলো থেকে একদিন রাজসিংহাসনের দিকে তুলে নিয়েছিলেন, যার দীনহীন বেশ একদিন তিনি রাজবেশ দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলেন, যাকে তিনি প্রাণের চেয়ে প্রিয় ভেবেছিলেন—হায় রে! সেই অনাথ আজ সমস্ত কৃতজ্ঞতা ভুলে তাঁরই রাজচ্ছত্র কেড়ে নিতে আসছে, তখন তাঁর দুই চক্ষে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল।

তিনি সেই বৃদ্ধ বয়সে একা একদল রাজভক্ত সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে গেলেন; সেই যুদ্ধই তাঁর শেষ যুদ্ধ; যুদ্ধক্ষেত্রে বাপ্পার হাতে মান-রাজা প্রাণ দিলেন।

ষোলো বৎসরের বাপ্পা দেববন্দরের রাজকন্যাকে বিয়ে করে হিন্দুমুকুট, হিন্দু-সূর্য, রাজগুরু, চাকুয়া উপাধি নিয়ে চিতোরের রাজসিংহাসনে বসলেন। বালিয় ও দেব, দুটি ভাই ভিল, বাপ্পার কপালে রাজতিলক টেনে দিয়ে দুখানা গ্রাম বখশিস পেলে। বাপ্পা সেদিন নিয়ম করে দিলেন যে তাঁর বংশের যত রাজা সকলকেই এই দুই ভিলের বংশাবলীর হাতে রাজটিকা নিয়ে সিংহাসনে বসতে হবে। আজও সেই নিয়ম চলে আসছে। এই নতুন নিয়ম বাপ্পা রাজস্থানে যখন প্রচলিত করলেন, তখন এই ভিলের হাতে রাজটিকা নেবার কথা যে শুনলে, সেই মনে ভাবলে নতুন রাজার এ একটা নতুন খেয়াল; কিন্তু মান-রাজার সভাপণ্ডিতেরা ভাবলেন, ইনি কি তবে গিহেলাট-রাজকুমার গোহের বংশীয়?—সূর্যবংশেই তো ভিলের হাতে রাজটিকা নেবার নিয়ম ছিল জানি! মহারাজ বাপ্পা নাগাদিত্যের মহিষী চিতোর-রাজকুমারীর ছেলে নয়তো? রাজা-মান, বাপ্পার মায়ের ভাই, মামা নয়তো? ছি! ছি! বাপ্পা কী অধর্ম করলেন—চোরের মতো মামার সিংহাসন আপনি নিলেন? এমন নিষ্ঠুর রাজার রাজত্বে থাকাও যে মহাপাপ! পণ্ডিতেরা আর রাজসভার মুখো হলেন না—একে-একে চিতোর ছেড়ে অন্য দেশে চলে গেলেন। হায়, তাঁরা যদি জানতেন বাপ্পা কত নির্দোষ; বাপ্পা স্বপ্নেও ভাবেন নি রাজা মান তাঁর মামা! তিনি তার পালক-পিতা, সেই বৃদ্ধ রাজপুরোহিতের কাছে ভিল-বিদ্রোহ, রাজা গোহ, গায়েব-গায়েবীর গল্প শুনতেন

বটে, কিন্তু তিনি জানতেন না যে, যার নিষ্ঠুর অত্যাচারে সরল ভিলেরা একদিন ক্ষেপে উঠেছিল, সেই মহারাজ নাগাদিত্য তাঁর পিতা; তিনি জানতেন না যে, তাঁরই পূর্বপুরুষ, রাজকুমার গোহ, যাঁকে রানী পুষ্পবতী ব্রাহ্মণী কমলাবতীর হাতে সঁপে দিয়ে চিতার আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। বাপ্পা ভাবতেন, তিনি কোনো সামান্য রাজ্যের রাজপুত্র।

রাজা হবার পর বাপ্পা যখন দেববন্দরের রাজকন্যাকে বিয়ে করে ফিরে আসেন, তখন বাণমাতা দেবীর সোনার মূর্তি সঙ্গে এনেছিলেন। চিতোরের রাজপ্রাসাদে শ্বেতপাথরের মন্দিরে সোনার সেই দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে প্রতিদিন দুই সন্ধ্যা পুজো করতেন।

অনেক দিন কেটে গেছে, বাপ্পা প্রায় বুড়ো হয়েছেন, সেই সময় একদিন ভক্তিভরে বাণমাতাকে প্রণাম করে উঠবার সময় বাপ্পার গলা থেকে ছেলেবেলার সেই তামার কবচ ছিঁড়ে পড়ল। বাপ্পা বড়ো হয়ে উঠেছিলেন কিন্তু সুতোয় বাঁধা তামার কবচটি তাঁর গলায় যেমন, তেমনই ছিল—অনেক দিনের অভ্যাসে মনেই পড়ত না যে, গলায় একটা-কিছু আছে। আজ যখন হীরামোতির কুড়িগাছা হারের নীচে থেকে সেই পুরানো কবচখানি পায়ের তলায় ছিঁড়ে পড়ল, তখন বাপ্পা চমকে উঠে ভাবলেন—এ কী! এতদিন আমার মনেই ছিল না যে এতে লেখা আছে আমি কে, কোথায় ছিলুম! আজ সব সন্ধান পাওয়া যাবে। বাপ্পা প্রফুল্ল মুখে সেই তামার কবচ মহারানীর হাতে এনে দিয়ে বললেন, "পড়ো তো শুনি।" বাপ্পা নিজে এক অক্ষরও পড়তে জানতেন না। মহারানী বাপ্পার পায়ের কাছে বসে পড়তে লাগলেন। কবচের এক পিঠে লেখা রয়েছে—বাসস্থান ত্রিকূটপর্বত নগেন্দ্রনগর, পরাশর-অরণ্য। বাপ্পা হাসিমুখে রানীর কাঁধে হাত রেখে বললেন, "এই আমার ছেলেবেলার দেশ, এইখানে কত খেলা খেলেছি! সেই ত্রিকূট পাহাড়, সেই আশি বৎসরের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের গম্ভীর মুখ, নগেন্দ্রনগরে ঝুলন-পূর্ণিমায় সেই জ্যোৎস্না-রাত্রি, সেই শোলাঙ্কি-রাজকুমারীর মধুর হাসি, স্বপ্নের মতো আমার এখনো মনে আসে। আমি কতবার কত লোককে জিজ্ঞাসা করেছি, কিন্তু পৃথিবীতে তিনটে-চুড়ো পাহাড় কত আছে, কে তার সন্ধান পাবে! আমি যদি বলতে পারতেম যে সেই মেঘের মতো তিনটে পাহাড়ের ঢেউকে 'ত্রিকূট' বলে, যদি বলতে পারতেম সেই ছোটো শহরের নাম নগেন্দ্রনগর, যদি জানতে পারতেম সে ঘন বন, যেখানে আমি রাখালদের সঙ্গে খেলে বেড়াতেম, যেখানে ঝুলন-পূর্ণিমায় শোলাঙ্কি-রাজকুমারীকে বিয়ে করেছিলেম, সেটি পরাশর-অরণ্য, তবে কোনো গোলই হত না: হায় হায়! জন্মাবধি লেখা-পড়া না শিখে এই ফল! এতকাল পরে কি আর সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, সেই শোলাঙ্কি-রাজনন্দিনীকে ফিরে পাব? পড়ো তো শুনি আর কি লেখা আছে।" রানী কবচের আর-এক পিঠ উলটে পড়তে লাগলেন—জন্মস্থান মালিয়া-

পাহাড়, পিতা নাগাদিত্য, মাতা চিতোরকুমারী, নাম বাপ্পা।

মহারানীর বড়ো-বড়ো চোখ মহাবিস্ময়ে আরো বড়ো হয়ে উঠল। তিনি তামার সেই কবচ-হাতে বাপ্পার পায়ের তলায়, ফুলের বিছানার মতো সুন্দর গালিচায় অবাক হয়ে বসে রইলেন; আর গজদন্তের পালঙ্কের উপর বাপ্পা ডান হাতের আঙুলে এক ফোঁটা রক্তের মতো বড়ো একখানা লালের আংটির দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলেন—হায়-হায়! কী পাপ করেছি! এই হাতে পিতৃহন্তা ভিলদের শাসন না করে, মামার প্রাণ-হন্তা হয়ে আমি সিংহাসনে বসেছি! "মহারানী! আমি মহাপাপী, আমি চিতোরের সিংহাসনে বসবার উপযুক্ত নই। এখন পিতৃহত্যার প্রতিশোধ আর আত্মীয়-বধের প্রায়শ্চিত্ত আমার জীবনের ব্রত হল।"

একলিঙ্গের দেওয়ান বাপ্পা সেইদিনই সকলের কাছে বিদায় হয়ে, দশ হাজার দেওয়ানী ফৌজ নিয়ে চিতোর থেকে বার হলেন। তাঁর সমস্ত রাগ মালিয়া-পাহাড়ে ভিল-রাজত্বের উপর গিয়ে পড়ল। বাপ্পা মালিয়া-পাহাড় জয় করে ভিল-রাজত্ব ছারখার করে চলে গেলেন। তার পর, দেশ-বিদেশ—কাশ্মীর, কাবুল, ইস্পাহান, কান্দাহার, ইরান, তুরান জয় করলেন। বাপ্পার সকল সাধ পূর্ণ হল; মালিয়া-পাহাড় জয় করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধের সাধ পূর্ণ হল; আধখানা পৃথিবী চিতোর সিংহাসনের অধীনে এনে আত্মীয়-বধের কষ্ট অনেকটা দূর হল; কিন্তু তবু মনের শান্তি, প্রাণের আরাম কোথায় পেলেন? বাপ্পা যখন সমস্ত দিন যুদ্ধের পর শ্রান্ত হয়ে নিজের শিবিরে বসে থাকতেন, যখন নিস্তব্ধ যুদ্ধক্ষেত্র কোনো দিন পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় আলোময় হয়ে যেত, তখন বাপ্পার সেই ঝুলন-পূর্ণিমার রাত্রে চাঁপাগাছের ঝুল্‌নায় শোলাঙ্কি-রাজ-কুমারীর হাসি-মুখ মনে পড়ত; যখন কোনো নতুন দেশ জয় করে বাপ্পা সেখানকার নতুন রাজপ্রাসাদে সোনার পালঙ্কে নহবতের মধুর সুর শুনতে-শুনতে ঘুমিয়ে পড়তেন, তখন সেই পূর্ণিমার রাতে চাঁপাগাছের চারি দিক ঘিরে-ঘিরে রাজকুমারীর সখীদের সেই ঝুলন-গান স্বপ্নের সঙ্গে বাপ্পার প্রাণে ভেসে আসত। শেষে যেদিন তিনি নগেন্দ্রনগরে গিয়ে দেখলেন তাঁদের পাতার কুটির, মাটির দেয়াল মাটির সঙ্গে মিশে গেছে, যখন দেখলেন শোলাঙ্কি-রাজার রাজবাড়ি জনশূন্য, নিস্তব্ধ, অন্ধকার হয়ে পড়ে আছে—সে রাজকুমারীও নেই, সে সখীও নেই, তখন বাপ্পার মন একেবারে ভেঙে গেল; তিনি শান্তিহারা পাগলের মতো সেই দিগ্বিজয়ী সৈন্য নিয়ে শান্তির আশায় এদেশ-ওদেশ ঘুরে বেড়াতে লাগলেন; চিতোরের প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ, শূন্য সিংহাসন আর অন্দরে একা মহারানীকে নিয়ে পড়ে রইল।

এই রকম দেশে-বিদেশে ঘুরতে-ঘুরতে বাপ্পা একদিন বল্লভীপুরে গায়নী-নগরে —যেখানে দুটি ভাই-বোন গায়েব-গায়েবী পৃথিবীর আলো প্রথম দেখেছিলেন, সেইখানে উপস্থিত হলেন। একদিন ষোলো বৎসর বয়সে, রাজা-মানের সেনাপতি হয়ে বাপ্পা

মুসলমান সুলতান সেলিমের সমস্ত সৈন্য এই গায়নী-নগর থেকে তাড়িয়ে দিয়ে চিতোর ফিরে গিয়েছিলেন; আজ কত বৎসর পরে যখন কালো চুলে পাক ধরেছে, যখন চোখের কোলে কালি পড়েছে, গায়ের মাংস লোল হয়েছে, পৃথিবী যখন তাঁর কাছে অনেকটা পুরানো হয়ে এসেছে, সেই সময় বাপ্পা আর-একবার সেই গায়নী-নগরে ফিরে এলেন। গায়নী-নগর দেখে বাপ্পার সেই দুটি ভাই-বোন গায়েব-গায়েবীর গল্প মনে পড়ল।

বাপ্পাদিত্য সেই সূর্যকুণ্ডের জলে সূর্যপূজা করে গায়নীর রাজপ্রাসাদে শ্বেত-পাথরের শয়নমন্দিরে বিশ্রাম করতে গেলেন। হঠাৎ অর্ধেক রাত্রে কার একটি মধুর গান শুনতে-শুনতে বাপ্পার ঘুম ভেঙে গেল। তিনি শয়নমন্দির থেকে পাথরের ছাদে বেরিয়ে দাঁড়ালেন। সম্মুখে মুসলমানদের প্রকাণ্ড মসজিদ জ্যোৎস্নার আলোয় ধপধপ করছে; আকাশে আধখানি চাঁদ; চারিদিক নিশুতি। বাপ্পা জ্যোৎস্নার আলোয় দাঁড়িয়ে গান শুনতে লাগলেন। তার মনে হল, এ গান যেন কোথায় শুনেছেন! হঠাৎ দক্ষিণের হাওয়ায় গানের কথা আরো স্পষ্ট হয়ে বাপ্পার কানের কাছে ভেসে এল; বাপ্পা চমকে উঠে শুনলেন—"আজ কী আনন্দ! ঝুলত ঝুলনে শ্যামর চন্দ!"—এ যে সেই গান! নগেন্দ্রনগরে রাজপুত-রাজকুমারীর ঝুলন-গান!

বাপ্পা ছাদের উপর ঝুঁকে দাঁড়ালেন; নীচে দেখলেন এক ভিখারিনী রাস্তায় দাঁড়িয়ে গাইছে—"আজ কী আনন্দ!"—বাপ্পা তৎক্ষণাৎ সেই ভিখারিনীকে ডেকে পাঠালেন। সেই চাঁদের আলোয় নির্জন শ্বেতপাথরের ছাদে, পথের ভিখারিনী, রাজ্যেশ্বর বাপ্পার সম্মুখে এসে দাঁড়াল। বাপ্পা জিজ্ঞাসা করলেন—"কে তুমি? তুমি কি নগেন্দ্রনগরের শোলাঙ্কি-রাজকুমারী? তুমি কি কখনো ঝুলন-পূর্ণিমায় এক রাখাল-বালককে বিয়ে করেছিলে?" ভিখারিনী অনেকক্ষণ একদৃষ্টে বাপ্পার মুখের দিকে চেয়ে রইল, তার পর একটুখানি হেসে বললে, "মহারাজ, অর্ধেক-রাত্রে ভিখারিনীকে ডেকে এ কী তামাশা!" বাপ্পা বললেন, "তবে কি তুমি রাজকুমারী নও?" ভিখারিণী নিঃশ্বাস ফেলে বললে, "আমি একদিন রাজকুমারী ছিলাম বটে আজ ভিখারিনী। মহারাজ, আমি মুসলমান-নবাব সেলিমের কন্যা! একদিন পনেরো বৎসর বয়সে, তুমি আমাদের রাজ্য কেড়ে নিয়েছিলে; সেদিন আমি এই রাজপ্রাসাদের এই ছাদের উপর থেকে তোমায় দেখেছিলেম—কী সুন্দর মুখ, কী প্রকাণ্ড শরীর! আর আজ তোমায় কী দেখছি! সে শরীর নেই, সে হাসি নেই! এমন দশা তোমার কে করলে? কোন্ রাজপুত-কুমারীর আশায় তুমি পাগলের মতো দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছ?" বাপ্পা বললেন, "সে কথা থাক; তুমি আবার সেই গান গাও।" ভিখারিনী গাইতে লাগল—"আজ কী আনন্দ! ঝুলত ঝুলনে শ্যামর চন্দ!" বাপ্পা সমস্ত দুঃখ ভুলে সেই ভিখারিনীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। গান শেষ হল; বাপ্পা বললেন, "নবাবজাদী, তোমায় কী দেব বলো?" ভিখারিনী বললে, "আমার যদি রাজ্য থাকত

তবে তোমায় বলতেম আমায় বিয়ে করে তোমার বেগম কর—কিন্তু সে আশা এখন নেই, এখন আমি ভিখারিনী যে! আমাকে তোমার বাঁদি করে কাছে-কাছে রাখো!" বাপ্পা বললেন, "তুমি বাঁদি হবার যোগ্য নও, আমি তোমায় বেগম করব, তুমি চিরদিন আমার কাছে বসে এই গান গাইবে।"

তার পরদিন, সেই মুসলমান-কন্যাকে বিয়ে করে বাপ্পা খোরাসান দেশে চলে গেলেন। সেখানে গুলবাগে খাসমহলে গোলাবের ফোয়ারার ধারে সিরাজির পেয়ালা হাতে বেগম-সাহেবার মুখে আরবী গজল আর সেই হিন্দুস্থানের ঝুলন-গান শুনতে শুনতে বাপ্পা প্রাণের আরাম, মনের শান্তি পেয়েছিলেন কি না কে জানে!

একশত বৎসর বয়সে বাপ্পার মৃত্যু হল। পূর্বদিকে হিন্দুস্থানে তাঁর হিন্দু মহিষী, হিন্দু প্রজারা; পশ্চিমে—ইরানীস্থানে তাঁর মুসলমানী বেগম আর পাঠানের দল। হিন্দুরা তাদের মহারাজকে চিতায় তুলে দিতে চাইলে, আর নৌসেরা পাঠানের দল তাঁকে মুসলমানের মতো কবর দিতে ব্যস্ত হল। শেষে যখন একদিকে সূর্যের স্তব আর-একদিকে আল্লার দোয়া-লেখা প্রকাণ্ড কিংখাবের চাদর বাপ্পার উপর থেকে খুলে নেওয়া হল, তখন সেখানে আর কিছুই দেখা গেল না—কেবল রাশি-রাশি পদ্মফুল আর গোলাপফুল। চিতোরের মহারানী সেই পদ্মফুল বাণমাতাজির মন্দিরে মানস-সরোবরের জলে রেখে দিলেন। ইরানী বেগম একটি গোলাপফুল শখের গুল-বাগে খাসমহলের মাঝে গোলাপজলের ফোয়ারার ধারে পুঁতে দিলেন; আর সেইদিন হিন্দুস্থান ও ইরানীস্থানের মধ্যস্থলে হিন্দুকুশ পর্বতের শিখরে হীরে-জহরতে মোড়া এক রাজার শরীর চিতার উপরে তুলে দিয়ে এক সন্ন্যাসিনী বললেন, "সখী, তোরা সেই গান গা।" চারি দিকে চার সন্ন্যাসিনী ঘিরে-ঘিরে গাইতে লাগল—"আজ কী আনন্দ!"

সন্ন্যাসিনী সেই শোলাঙ্কি-রাজকুমারী; আর সেই রাজদেহ বাপ্পার মৃতদেহ—দুজনে চিরদিন দুজনের সন্ধানে ফিরেছিলেন; কিন্তু ইহলোকে মিলন হয় নি।

মেজদা 1982

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সে দিনটা আমার খুব মনে পড়ে। সারা দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হইয়াও শেষ হয় নাই। শ্রাবণের সমস্ত আকাশটা ঘনমেঘে সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে, এবং সন্ধ্যা উত্তীর্ণ

হইতে না হইতেই চারি দিক গাঢ় অন্ধকারে ছাইয়া গিয়াছে। সকাল সকাল খাইয়া লইয়া আমরা কয়-ভাই নিত্য প্রথামত বাহিরে বৈঠকখানায় ঢালা বিছানার উপর রেড়ির তেলের শেজ জ্বালাইয়া বই খুলিয়া বসিয়া গিয়াছি। বাহিরের বারান্দায় একদিকে পিসেমশায় ক্যাম্বিশের খাটের উপর শুইয়া তাঁহার সন্ধ্যাতন্দ্রাটুকু উপভোগ করিতেছেন, এবং অন্যদিকে বসিয়া বৃদ্ধ রামকমল ভট্চায আফিং খাইয়া, অন্ধকারে চোখ বুজিয়া, থেলো হুঁকায় ধূমপান করিতেছেন। দেউড়িতে হিন্দুস্থানী পেয়াদাদের তুলসীদাসী সুর শোনা যাইতেছে; এবং ভিতরে আমরা তিন ভাই, মেজদার কঠোর তত্ত্বাবধানে নিঃশব্দে বিদ্যাভ্যাস করিতেছি। ছোড়দা, যতীনদা ও আমি তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি, এবং গম্ভীর-প্রকৃতি মেজদা বার-দুই এন্ট্রান্স ফেল করিবার পর গভীর মনো-যোগের সহিত তৃতীয়বারের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। তাঁহার প্রচণ্ড শাসনে একমুহূর্ত কাহারো সময় নষ্ট করিবার জো ছিল না। আমাদের পড়ার সময় ছিল সাড়ে সাতটা হইতে নয়টা। এই সময়টুকুর মধ্যে কথাবার্তা কহিয়া মেজদার 'পাসে'র পড়ার বিঘ্ন না করি, এই জন্য তিনি নিজে প্রত্যহ পড়িতে বসিয়াই কাঁচি দিয়া কাগজ কাটিয়া বিশ-ত্রিশখানি টিকিটের মতো করিতেন। তাহার কোনোটাতে লেখা থাকিত 'বাইরে', কোনোটাতে 'থুথুফেলা', কোনোটাতে 'নাকঝাড়া', কোনোটাতে 'তেষ্টা পাওয়া' ইত্যাদি। যতীনদা একটা 'নাকঝাড়া' টিকিট লইয়া মেজদার সুমুখে ধরিয়া দিলেন। মেজদা তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া দিলেন—হুঁ—আটটা তেত্রিশ মিনিট হইতে আটটা সাড়ে চৌত্রিশ মিনিট পর্যন্ত, অর্থাৎ এই সময়টুকুর জন্য সে নাক ঝাড়িতে যাইতে পারে। ছুটি পাইয়া যতীনদা টিকিট হাতে উঠিয়া যাইতেই ছোড়দা 'থুথুফেলা' টিকিট পেশ করিলেন। মেজদা 'না' লিখিয়া দিলেন। কাজেই ছোড়দা মুখ ভারী করিয়া মিনিট-দুই বসিয়া থাকিয়া 'তেষ্টা পাওয়া' আর্জি দাখিল করিয়া দিলেন। এবার মঞ্জুর হইল। মেজদা সই করিয়া লিখিলেন—হুঁ—আটটা একচল্লিশ মিনিট হইতে আটটা সাতচল্লিশ মিনিট পর্যন্ত। পরওয়ানা লইয়া ছোড়দা হাসিমুখে বাহির হইতেই যতীনদা ফিরিয়া হাতের টিকিট দাখিল করিলেন। মেজদা ঘড়ি দেখিয়া সময় মিলাইয়া একটা খাতা বাহির করিয়া সেই টিকিট গঁদ দিয়া আঁটিয়া রাখিলেন। সমস্ত সাজসরঞ্জাম তাঁহার হাতের কাছেই মজুত থাকিত। সপ্তাহ পরে এই-সব টিকিটের সময় ধরিয়া কৈফিয়ৎ তলব করা হইত।

এইরূপে মেজদার অত্যন্ত সতর্কতায় এবং সুশৃঙ্খলায় আমাদের এবং তাঁহার নিজের কাহারো এতটুকু সময় নষ্ট হইতে পাইত না। প্রত্যহ এই দেড়ঘণ্টা কাল অতিশয় বিদ্যাভ্যাস করিয়া রাত্রি নয়টার সময় আমরা যখন বাড়ির ভিতরে শুইতে আসিতাম, তখন মা-সরস্বতী নিশ্চয়ই ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত আমাদিগকে আগাইয়া দিয়া যাইতেন; এবং পরদিন ইস্কুলে ক্লাসের মধ্যে যে-সকল সম্মান-সৌভাগ্য লাভ

করিয়া ঘরে ফিরিতাম, সে তো আপনারা বুঝিতেই পারিতেছেন। কিন্তু মেজদার দুর্ভাগ্য, তাঁহার নির্বোধ পরীক্ষকগুলো তাঁহাকে কোনোদিন চিনিতেই পারিল না। নিজের এবং পরের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি এরূপ প্রবল অনুরাগ, সময়ের মূল্য সম্বন্ধে এমন সূক্ষ্ম দায়িত্ববোধ থাকা সত্ত্বেও, তাঁহাকে বারংবার ফেল করাইয়া দিতে লাগিল। ইহাই অদৃষ্টের অন্ধ বিচার! যাক—এখন আর সে দুঃখ জানিয়া কী হইবে?

সেই রাত্রেও ঘরের বাহিরে ওই জমাট অন্ধকার এবং বারান্দায় তন্দ্রাভিভূত সেই দুটো বুড়ো। ভিতরে মৃদু দীপালোকের সম্মুখে গভীর-অধ্যয়ন-রত আমরা চারিটি প্রাণী।

ছোড়দা ফিরিয়া আসায় তৃষ্ণায় আমার একেবারে বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল; কাজেই টিকিট পেশ করিয়া উন্মুখ হইয়া রহিলাম। মেজদা তাঁহার সেই টিকিট-আঁটা খাতার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন—তৃষ্ণা-পাওয়াটা আমার আইন-সঙ্গত কি না, অর্থাৎ কাল-পরশু কী পরিমাণে জল খাইয়াছিলাম।

অকস্মাৎ আমার ঠিক পিঠের কাছে একটা 'হুম্' শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে ছোড়দা ও যতীনদার সমবেত আর্তকণ্ঠের গগনভেদী রৈ-রৈ চীৎকার—"ওরে বাবা রে, খেয়ে ফেল্লে রে!" কিসে ইঁহাদিগকে খাইয়া ফেলিল, আমি ঘাড় ফিরাইয়া দেখিবার পূর্বেই মেজদা মুখ তুলিয়া একটা বিকট শব্দ করিয়া বিদ্যুৎবেগে তাঁহার দুই পা সম্মুখে ছড়াইয়া দিয়া শেজ উল্টাইয়া দিলেন। (তখন সেই অন্ধকারের মধ্যে যেন, দক্ষযজ্ঞ বাধিয়া গেল।) মেজদার ছিল ফিটের ব্যামো। তিনি সেই যে 'আঁ আঁ' করিয়া প্রদীপ উল্টাইয়া চিং হইয়া পড়িলেন, আর খাড়া হইলেন না।

ঠেলাঠেলি করিয়া বাহির হইতেই দেখি, পিসেমশাই তাঁর দুই ছেলেকে বগলে চাপিয়া ধরিয়া তাহাদের অপেক্ষাও তেজে চেঁচাইয়া বাড়ি ফাটাইয়া ফেলিতেছেন। এ যেন তিন বাপ-ব্যাটার কে কতখানি হাঁ করিতে পারে, তারই লড়াই চলিতেছে।

এই সুযোগে একটা চোর নাকি ছুটিয়া পলাইতেছিল, দেউড়ির সিপাহিরা তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে। পিসেমশাই প্রচণ্ড চীৎকারে হুকুম দিতেছেন—"আউর মারো—শালাকো মার ডালো"—ইত্যাদি।

মুহূর্তকাল মধ্যে আলোয়, চাকর-বাকরে ও পাশের লোকজনে উঠান পরিপূর্ণ হইয়া গেল। দরওয়ানরা চোরকে মারিতে মারিতে আধমরা করিয়া টানিয়া আলোর সম্মুখে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল। তখন চোরের মুখ দেখিয়া বাড়ি-সুদ্ধ লোকের মুখ শুকাইয়া গেল। আরে, এ ভট্চাযিমশাই!

তখন কেহ বা জল, কেহ বা পাখার বাতাস, কেহ বা তাঁহার চোখে মুখে হাত বুলাইয়া দেয়। ওদিকে ঘরের ভিতরে মেজদাকে লইয়া সেই ব্যাপার!

পাখার বাতাস ও জলের ঝাপ্টা খাইয়া রামকমল প্রকৃতিস্থ হইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সবাই প্রশ্ন করিতে লাগিল, "আপনি অমন করে ছুটেছিলেন কেন?" ভট্চায্যিমশাই কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "বাবা, বাঘ নয়, সে একটা মস্ত ভাল্লুক— লাফ মেরে বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে এলো।"

ছোড়দা ও যতীনদা বারংবার কহিতে লাগিল, "ভাল্লুক নয় বাবা, একটা নেকড়ে বাঘ। হুম্ করে ল্যাজ গুটিয়ে পা-পোষের উপর বসেছিল।"

মেজদার চৈতন্য হইলে তিনি নিমীলিতচক্ষে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সংক্ষেপে কহিলেন, "দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার।"

কিন্তু কোথা সে? মেজদার 'দি রয়েল বেঙ্গল'ই হোক, আর রামকমলের 'মস্ত ভালুক'ই হোক, সে আসিলই বা কিরূপে, গেলই বা কোথায়? এতগুলো লোক যখন দেখিয়াছে, তখন সে একটা-কিছু বটেই!

তখন কেহ বা বিশ্বাস করিল, কেহ বা করিল না। কিন্তু সবাই লণ্ঠন লইয়া ভয়চকিত নেত্রে চারি দিকে খুঁজিতে লাগিল।

অকস্মাৎ পালোয়ান কিশোরী সিং 'উহ বয়ঠা' বলিয়াই একলাফে একেবারে বারান্দার উপর। তার পর সেও এক ঠেলাঠেলি-কাণ্ড। এতগুলা লোক, সবাই এক সঙ্গে বারান্দায় উঠিতে চায়, কাহারো মুহূর্ত বিলম্ব সয় না। উঠানের এক-প্রান্তে একটা ডালিম গাছ ছিল, দেখা গেল তাহারই ঝোপের মধ্যে বসিয়া একটা বৃহৎ জানোয়ার। বাঘের মতোই বটে। চক্ষের পলকে বারান্দা খালি হইয়া বৈঠকখানা ভরিয়া গেল—জনপ্রাণী আর সেখানে নাই। সেই ঘরের ভিড়ের মধ্য হইতে পিসেমশায়ের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর আসিতে লাগিল—সড়কি লাও—বন্দুক লাও। আমাদের পাশের বাড়ির গগনবাবুদের একটা মুঙ্গেরি গাদা বন্দুক ছিল; লক্ষ্য সেই অস্ত্রটার উপর। 'লাও' তো বটে, কিন্তু আনে কে? ডালিম গাছটা যে দরজার কাছেই; এবং তাহারই মধ্যে যে বাঘ বসিয়া! হিন্দুস্থানীরা সাড়া দেয় না—তামাসা দেখিতে যাহারা বাড়ি ঢুকিয়াছিল তাহারাও নিস্তব্ধ।

এমনি বিপদের সময়ে হঠাৎ কোথা হইতে ইন্দ্র আসিয়া উপস্থিত। সে বোধ করি সুমুখের রাস্তা দিয়া চলিয়াছিল, হাঙ্গামা শুনিয়া বাড়ি ঢুকিয়াছে। নিমেষে শতকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল—"ওরে বাঘ! বাঘ! পালিয়ে আয় রে ছোঁড়া, পালিয়ে আয়!"

প্রথমটা সে থতমত খাইয়া ছুটিয়া আসিয়া ভিতরে ঢুকিল। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই ব্যাপারটা শুনিয়া লইয়া একা নির্ভয়ে উঠানে নামিয়া গিয়া লণ্ঠন তুলিয়া বাঘ দেখিতে লাগিল।

দোতলার জানালা হইতে মেয়েরা রুদ্ধনিশ্বাসে এই ডাকাত ছেলেটার পানে চাহিয়া দুর্গানাম জপিতে লাগিল। পিসিমা তো ভয়ে কাঁদিয়াই ফেলিলেন। নীচে ভিড়ের

মধ্যে গাদাগাদি দাঁড়াইয়া হিন্দুস্থানী-সিপাহিরা তাহাকে সাহস দিতে লাগিল, এবং এক-একটা অস্ত্র পাইলেই নামিয়া আসে, এমন আভাসও দিল।

বেশ করিয়া দেখিয়া ইন্দ্র কহিল, "দ্বারিকবাবু, এ বাঘ নয় বোধ হয়।" তাহার কথাটা শেষ হইতে না হইতেই সেই 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' দুই থাবা জোড় করিয়া মানুষের গলায় কাঁদিয়া উঠিল। পরিষ্কার বাঙ্গালা করিয়া কহিল, "না, বাবুমশাই, না। আমি বাঘ-ভালুক নই—ছিনাথ বউরূপী।"

ইন্দ্র হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ভট্‌চায্যিমশাই খড়ম হাতে সর্বাগ্রে ছুটিয়া আসিলেন—"হারামজাদা! তুমি ভয় দেখাবার জায়গা পাও না?"

পিসেমশাই মহাক্রোধে হুকুম দিলেন, "শালাকো কান পাকড়কে লাও।"

কিশোরী সিং তাহাকে সর্বাগ্রে দেখিয়াছিল, সুতরাং তাহারই দাবি সর্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া, সেই গিয়া তাহার কান ধরিয়া হিড়-হিড় করিয়া টানিয়া আনিল। ভট্‌চায্যিমশাই তাহার পিঠের উপর খড়মের এক ঘা বসাইয়া দিয়া রাগের মাথায় হিন্দি বলিতে লাগিলেন, "এই হারামজাদা বজ্জাতকে বাস্তে আমার গতর চূর্ণ হো গিয়া। খোট্টা শালার ব্যাটারা আমাকে যেন কিলায়কে কাঁটাল পাকায় দিয়া—"

ছিনাথের বাড়ি বারাসতে। সে প্রতি বৎসর এই সময়টায় একবার করিয়া রোজগার করিতে আসে। কালও এ বাড়িতে সে নারদ সাজিয়া গান শুনাইয়া গিয়াছিল।

সে একবার ভট্‌চায্যিমশায়ের, একবার পিসেমশায়ের পায়ে পড়িতে লাগিল। কহিল, ছেলেরা অমন করিয়া ভয় পাইয়া প্রদীপ উল্টাইয়া মহামারী কাণ্ড বাধাইয়া তোলায় সে নিজেও ভয় পাইয়া গাছের আড়ালে গিয়া লুকাইয়াছিল। ভাবিয়াছিল, একটু ঠাণ্ডা হইলেই বাহির হইয়া তাহার সাজ দেখাইয়া যাইবে। কিন্তু ব্যাপার উত্তরোত্তর এমন হইয়া উঠিল যে, তাহার আর সাহসে কুলাইল না।

ছিনাথ কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিল; কিন্তু পিসেমশায়ের আর রাগ পড়ে না। পিসিমা নিজে উপর হইতে কহিলেন, "তোমাদের ভাগ্যি ভালো যে, সত্যিকারের বাঘ-ভালুক বার হয় নি। যে বীরপুরুষ তোমরা, আর তোমার দারওয়ানরা! ছেড়ে দাও বেচারিকে, আর দূর করে দাও দেউড়ির ঐ খোট্টাগুলোকে। একটা ছোটোছেলের যা সাহস, একবাড়ি লোকের তা নেই।" পিসেমশাই কোনো কথাই শুনিলেন না, বরং পিসিমার এই অভিযোগে চোখ পাকাইয়া এমন একটা ভাব ধারণ করিলেন যে, ইচ্ছা করিলেই তিনি এই-সকল কথার যথেষ্ট সদুত্তর দিতে পারেন, কিন্তু স্ত্রীলোকের কথার উত্তর দিতে যাওয়াই পুরুষ মানুষের পক্ষে অপমানকর; তাই, আরও গরম হইয়া হুকুম দিলেন, "উহার ল্যাজ কাটিয়া দাও।" তখন, তাহার সেই রঙিন-কাপড়-জড়ানো সুদীর্ঘ খড়ের ল্যাজ কাটিয়া লইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইল। পিসিমা উপর হইতে রাগ করিয়া বলিলেন, "রেখে দাও। তোমার ওটা অনেক কাজে লাগবে।"

পাখার বাতাস ও জলের ঝাপ্‌টা খাইয়া রামকমল প্রকৃতিস্থ হইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সবাই প্রশ্ন করিতে লাগিল, "আপনি অমন করে ছুটেছিলেন কেন?" ভট্‌চায্যিমশাই কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "বাবা, বাঘ নয়, সে একটা মস্ত ভাল্লুক—লাফ মেরে বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে এলো।"

ছোড়দা ও যতীনদা বারংবার কহিতে লাগিল, "ভাল্লুক নয় বাবা, একটা নেকড়ে বাঘ। হুম্‌ করে ল্যাজ গুটিয়ে পা-পোষের উপর বসেছিল।"

মেজদার চৈতন্য হইলে তিনি নিমীলিতচক্ষে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সংক্ষেপে কহিলেন, "দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার।"

কিন্তু কোথা সে? মেজদার 'দি রয়েল বেঙ্গল'ই হোক, আর রামকমলের 'মস্ত ভালুক'ই হোক, সে আসিলই বা কিরূপে, গেলই বা কোথায়? এতগুলো লোক যখন দেখিয়াছে, তখন সে একটা-কিছু বটেই!

তখন কেহ বা বিশ্বাস করিল, কেহ বা করিল না। কিন্তু সবাই লণ্ঠন লইয়া ভয়চকিত নেত্রে চারি দিকে খুঁজিতে লাগিল।

অকস্মাৎ পালোয়ান কিশোরী সিং 'উহ বয়ঠা' বলিয়াই একলাফে একেবারে বারান্দার উপর। তার পর সেও এক ঠেলাঠেলি-কাণ্ড। এতগুলা লোক, সবাই এক সঙ্গে বারান্দায় উঠিতে চায়, কাহারো মুহূর্ত বিলম্ব সয় না। উঠানের এক-প্রান্তে একটা ডালিম গাছ ছিল, দেখা গেল তাহারই ঝোপের মধ্যে বসিয়া একটা বৃহৎ জানোয়ার। বাঘের মতোই বটে। চক্ষের পলকে বারান্দা খালি হইয়া বৈঠকখানা ভরিয়া গেল—জনপ্রাণী আর সেখানে নাই। সেই ঘরের ভিড়ের মধ্য হইতে পিসেমশায়ের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর আসিতে লাগিল—সড়কি লাও—বন্দুক লাও। আমাদের পাশের বাড়ির গগনবাবুদের একটা মুঙ্গেরি গাদা বন্দুক ছিল; লক্ষ্য সেই অস্ত্রটার উপর। 'লাও' তো বটে, কিন্তু আনে কে? ডালিম গাছটা যে দরজার কাছেই; এবং তাহারই মধ্যে যে বাঘ বসিয়া! হিন্দুস্থানীরা সাড়া দেয় না—তামাসা দেখিতে যাহারা বাড়ি ঢুকিয়াছিল তাহারাও নিস্তব্ধ।

এমনি বিপদের সময়ে হঠাৎ কোথা হইতে ইন্দ্র আসিয়া উপস্থিত। সে বোধ করি সুমুখের রাস্তা দিয়া চলিয়াছিল, হাঙ্গামা শুনিয়া বাড়ি ঢুকিয়াছে। নিমেষে শতকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল—"ওরে বাঘ! বাঘ! পালিয়ে আয় রে ছোঁড়া, পালিয়ে আয়!"

প্রথমটা সে থতমত খাইয়া ছুটিয়া আসিয়া ভিতরে ঢুকিল। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই ব্যাপারটা শুনিয়া লইয়া একা নির্ভয়ে উঠানে নামিয়া গিয়া লণ্ঠন তুলিয়া বাঘ দেখিতে লাগিল।

দোতলার জানালা হইতে মেয়েরা রুদ্ধনিশ্বাসে এই ডাকাত ছেলেটার পানে চাহিয়া দুর্গানাম জপিতে লাগিল। পিসিমা তো ভয়ে কাঁদিয়াই ফেলিলেন। নীচে ভিড়ের

মধ্যে গাদাগাদি দাঁড়াইয়া হিন্দুস্থানী-সিপাহিরা তাহাকে সাহস দিতে লাগিল, এবং এক-একটা অস্ত্র পাইলেই নামিয়া আসে, এমন আভাসও দিল।

বেশ করিয়া দেখিয়া ইন্দ্র কহিল, "দ্বারিকবাবু, এ বাঘ নয় বোধ হয়।" তাহার কথাটা শেষ হইতে না হইতেই সেই 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' দুই থাবা জোড় করিয়া মানুষের গলায় কাঁদিয়া উঠিল। পরিষ্কার বাঙ্গালা করিয়া কহিল, "না, বাবুমশাই, না। আমি বাঘ-ভালুক নই—ছিনাথ বউরূপী।"

ইন্দ্র হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ভট্‌চায্যিমশাই খড়ম হাতে সর্বাগ্রে ছুটিয়া আসিলেন—"হারামজাদা! তুমি ভয় দেখাবার জায়গা পাও না?"

পিসেমশাই মহাক্রোধে হুকুম দিলেন, "শালাকো কান পাকড়কে লাও।"

কিশোরী সিং তাহাকে সর্বাগ্রে দেখিয়াছিল, সুতরাং তাহারই দাবি সর্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া, সেই গিয়া তাহার কান ধরিয়া হিড়-হিড় করিয়া টানিয়া আনিল। ভট্‌চায্যিমশাই তাহার পিঠের উপর খড়মের এক ঘা বসাইয়া দিয়া রাগের মাথায় হিন্দি বলিতে লাগিলেন, "এই হারামজাদা বজ্জাতকে বাস্তে আমার গতর চূর্ণ হো গিয়া। খোট্টা শালার ব্যাটারা আমাকে যেন কিলায়কে কাঁটাল পাকায় দিয়া—"

ছিনাথের বাড়ি বারাসতে। সে প্রতি বৎসর এই সময়টায় একবার করিয়া রোজগার করিতে আসে। কালও এ বাড়িতে সে নারদ সাজিয়া গান শুনাইয়া গিয়াছিল।

সে একবার ভট্‌চায্যিমশায়ের, একবার পিসেমশায়ের পায়ে পড়িতে লাগিল। কহিল, ছেলেরা অমন করিয়া ভয় পাইয়া প্রদীপ উল্টাইয়া মহামারী কাণ্ড বাধাইয়া তোলায় সে নিজেও ভয় পাইয়া গাছের আড়ালে গিয়া লুকাইয়াছিল। ভাবিয়াছিল, একটু ঠাণ্ডা হইলেই বাহির হইয়া তাহার সাজ দেখাইয়া যাইবে। কিন্তু ব্যাপার উত্তরোত্তর এমন হইয়া উঠিল যে, তাহার আর সাহসে কুলাইল না।

ছিনাথ কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিল; কিন্তু পিসেমশায়ের আর রাগ পড়ে না। পিসিমা নিজে উপর হইতে কহিলেন, "তোমাদের ভাগ্যি ভালো যে, সত্যিকারের বাঘ-ভালুক বার হয় নি। যে বীরপুরুষ তোমরা, আর তোমার দারওয়ানরা! ছেড়ে দাও বেচারিকে, আর দূর করে দাও দেউড়ির ঐ খোট্টাগুলোকে। একটা ছোটোছেলের যা সাহস, একবাড়ি লোকের তা নেই।" পিসেমশাই কোনো কথাই শুনিলেন না, বরং পিসিমার এই অভিযোগে চোখ পাকাইয়া এমন একটা ভাব ধারণ করিলেন যে, ইচ্ছা করিলেই তিনি এই-সকল কথার যথেষ্ট সদুত্তর দিতে পারেন, কিন্তু স্ত্রীলোকের কথার উত্তর দিতে যাওয়াই পুরুষ মানুষের পক্ষে অপমানকর; তাই, আরও গরম হইয়া হুকুম দিলেন, "উহার ল্যাজ কাটিয়া দাও।" তখন, তাহার সেই রঙিন-কাপড়-জড়ানো সুদীর্ঘ খড়ের ল্যাজ কাটিয়া লইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইল। পিসিমা উপর হইতে রাগ করিয়া বলিলেন, "রেখে দাও। তোমার ওটা অনেক কাজে লাগবে।"

অশোকবন

রাজশেখর বসু

লতাগৃহ চিত্রগৃহ নিশাগৃহ কোথাও সীতাকে না পেয়ে হনুমান ভাবলেন, নিশ্চয় সেই ধর্মশীলা সতী জীবিত নেই, দুরাচার রাবণ তাঁকে বধ করেছে। হয়তো বিকট-দর্শনা রাক্ষসীদের দেখে তিনি ভয়ে প্রাণত্যাগ করেছেন। আমার পৌরুষ আর পরিশ্রম বৃথা হল, আমি ফিরে গিয়ে বানরদের কী বলব? বৃদ্ধ জাম্ববান আর অঙ্গদই বা আমাকে কী বললেন? এখন আমার প্রায়োপবেশন করাই শ্রেয়। কিন্তু উদ্যমই সৌভাগ্যের মূল, তাতেই সুখ, তাতেই কার্যসিদ্ধি হয়। অতএব যে-সকল স্থান এখনো দেখা হয়নি সেখানে আমার যাওয়া উচিত। হনুমান পুনর্বার অনুসন্ধান করতে লাগলেন, অন্তঃপুর, প্রাকারসংলগ্ন গৃহবীথী, চৈত্য, গহ্বর, পুষ্করিণী সর্বত্র দেখলেন কিন্তু কোথাও সীতাকে পেলেন না। তখন তিনি প্রাকারে আরোহণ করে এইরূপ চিন্তা করতে লাগলেন—গৃধ্ররাজ সম্পাতি বলেছেন সীতা এখানেই আছেন, তবে তাঁর দেখা পাচ্ছি না কেন? হয়তো হরণকালে রাবণের হাত থেকে সমুদ্রে পড়ে গেছেন, হয়তো রাবণ বা তার দুষ্টা পত্নীগণ সীতাকে খেয়ে ফেলেছে। আমি যদি ফিরে গিয়ে রামকে এই দারুণ বাক্য বলি যে সীতাকে পাই নি তবে তিনি নিশ্চয় প্রাণত্যাগ করবেন। তখন ভ্রাতৃভক্ত লক্ষ্মণ, ভরত-শত্রুঘ্ন এবং কৌশল্যাদিও মরবেন। সত্যসন্ধ কৃতজ্ঞ সুগ্রীব রামের বিরহে প্রাণত্যাগ করবেন, রুমা তারা এবং অঙ্গদও বাঁচবেন না। প্রভুর শোকে বানরগণ চপেটাঘাতে ও মুষ্টিপ্রহারে নিজের নিজের মস্তক চূর্ণ করবে। আমি কিষ্কিন্ধ্যায় যাব না, সীতার সংবাদ না নিয়ে সুগ্রীবের সঙ্গে দেখা করতে পারব না। আমি না ফিরলে বরং রাম-লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবাদি আশায়-আশায় প্রাণধারণ করবেন। এখানেই বানপ্রস্থ হয়ে বৃক্ষচ্যুত ফল খেয়ে বৃক্ষমূলে বাস করব, অথবা সাগরতীরে চিতায় অগ্নিপ্রবেশ করব। কিন্তু প্রাণনাশে বহু দোষ, জীবিত থাকলেই শুভ লাভ হয়, অতএব আমি প্রাণধারণ করব। রাবণকে বধ করব,

অথবৈনং সমুৎক্ষিপ্য উপর্যুপরি সাগরম্।
রামায়োপহরিষ্যামি পশুং পশুপতেরিব॥ (১৩।৪৮)

—অথবা তাকে সাগরের উপরে ছুড়তে-ছুড়তে নিয়ে গিয়ে রামকে উপহার দেব—পশুপতিকে যেমন পশু দেওয়া হয়।

হনুমান স্থির করলেন, যতক্ষণ সীতাকে না পাওয়া যায় ততক্ষণ তিনি; বার বার অন্বেষণ করবেন। একটি বৃহৎ অশোকবন দেখে তিনি ভাবলেন, ওই বন তো দেখা হয় নি, অতএব ওখানে আমি যাই। তখন তিনি রাম লক্ষ্মণ সীতা রুদ্র যম অনিল

9689

চন্দ্র অগ্নি ও মরুদ্‌গণকে নমস্কার করে অশোকবনে এসে লম্ফ দিয়ে তার প্রাচীরে উঠলেন।

হনুমান হৃষ্ট হয়ে দেখলেন, সেই বনের বিবিধ বৃক্ষ সর্ব ঋতুর পুষ্পে সুশোভিত, বহুপ্রকার মৃগপক্ষী বিচরণ করছে, কোকিল ডাকছে, ভ্রমর গুঞ্জন করছে। স্থানে স্থানে মণিময়-সোপান-সমন্বিত সরোবর, হংস-সারস-নাদিত নদী, কুসুমিত লতা ও গুল্মে বেষ্টিত উপবন, মেঘতুল্য গিরি, শিলাগৃহ প্রভৃতি রয়েছে। জ্যামুক্ত শরের ন্যায় হনুমান লম্ফ দিয়ে সেই উদ্যানে প্রবেশ করলেন, তাঁর গমনের বেগে কম্পিত হয়ে বৃক্ষের পত্র পুষ্প ফল স্খলিত হয়ে পড়ে গেল। দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত ধূর্ত যেমন বস্ত্র আর আভরণ হারায়, বৃক্ষের সেইরূপ দশা হল। হনুমান তার হস্ত পদ আর লাঙ্গুল দিয়ে সেই বন নষ্ট করতে লাগলেন। তিনি একটি কাঞ্চনবর্ণ শিংশপা তরু দেখতে পেলেন, তার নীচে স্বর্ণময় বেদী আছে। সেই বৃক্ষে উঠে পত্রের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থেকে তিনি সর্বত্র নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

সহসা হনুমান দেখতে পেলেন, সেই বৃক্ষের মূলে রাক্ষসী পরিবেষ্টিত একটি রমণী বসে আছেন, তাঁর দেহ উপবাসে কৃশ, রূপ ধূমজালমণ্ডিত অগ্নিশিখার ন্যায়, পরিধান একটিমাত্র মলিন পীত বসন। তিনি অশ্রুপূর্ণনয়নে বিষণ্ণবদনে বার বার দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন। তিনি যেন সন্দেহাকুল স্মৃতি, নিপতিত সমৃদ্ধি, বিহত শ্রদ্ধা, প্রতিহত আশা, মিথ্যা-অপবাদগ্রস্ত কীর্তি। হনুমান অনুমান করলেন, ইনিই সীতা, কারণ, রাম যে-সকল ভূষণের কথা বলেছিলেন তা এঁর অঙ্গে রয়েছে, অন্যান্য ভূষণ ও উত্তরীয় যা ঋষ্যমূকে ফেলে দিয়েছিলেন তা নেই।—

ইয়ং কনকবর্ণাঙ্গী রামস্য মহিষী প্রিয়া।
প্রণষ্টাপি সতী যস্য মনসো ন প্রণশ্যতি॥ (১৫।৪৮)

—এই কনকবর্ণাঙ্গীই রামের প্রিয় মহিষী, যিনি বিচ্ছিন্ন হয়েও পতির মন থেকে দূর হন নি।

বাষ্পাকুলনয়নে হনুমান ভাবতে লাগলেন, স্বভাব বয়স ও আভিজাত্যে ইনি রামেরই যোগ্যা। এঁর জন্যই মহাবল বালী, কবন্ধ, বিরাধ, খর, দূষণ ও জনস্থানের চোদ্দ হাজার রাক্ষস নিহত হয়েছে এবং সুগ্রীব দুর্লভ বানররাজ্য লাভ করেছেন। এঁর জন্যই আমি সাগর লঙ্ঘন করে এই লঙ্কাপুরী দর্শন করছি। সীতার উদ্ধারের নিমিত্ত রাম যদি সসাগরা পৃথিবী বিপর্যস্ত করেন তাও উচিত হবে। সীতার অংশ-মাত্রের সঙ্গেও ত্রিলোকের সমস্ত রাজ্যের তুলনা হয় না। ইনি মেদিনী ভেদ করে হলকর্ষিত ক্ষেত্র থেকে পদ্মরেণুতুল্য পবিত্র ধূলি মেখে উত্থিত হয়েছিলেন। ইনি রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ, ভর্তৃস্নেহের বশে সর্বপ্রকার ভোগ বিসর্জন দিয়ে সকল কষ্ট তুচ্ছ জ্ঞান করে নির্জন বনে এসেছিলেন। পিপাসিত

জন যেমন সরোবর দেখতে চায়, রাম সেইরূপ এঁকে দেখবার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে আছেন।

হনুমান দেখলেন, সীতার অদূরে ঘোরদর্শনা রাক্ষসীরা রয়েছে। কারও এক চক্ষু এক কর্ণ, কেউ কর্ণহীন, কারও নাসিকা মস্তকের উপরে, কারও গ্রীবা অতি দীর্ঘ, কারও দেহ কম্বলের ন্যায় লোমশ। হ্রস্ব, দীর্ঘ, কুব্জ, বামন, পিঙ্গল, কৃষ্ণ, শূকরমুখী, ব্যাঘ্রমুখী প্রভৃতি নানা মূর্তির রাক্ষসী সেই শিংশপা বৃক্ষ বেষ্টন করে আছে। তারা সতত সুরাপান করছে আর মাংস খাচ্ছে। সীতা তাদের মধ্যে বসে আছেন, তাঁর বদন বিষণ্ণ কিন্তু ভর্তৃতেজে তাঁর হৃদয় অক্ষুব্ধ।

A.E. লুই পাস্তুর 1982

১৮২২-১৮৯৫

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

জোসেফ মিস্টার নামে একটি ছেলে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিল, পথে একটা পাগলা কুকুর তাকে কামড়াল। মিস্টারের দেহ ক্ষতবিক্ষত হল। পাগলা কুকুর কামড়ালে জলাতঙ্ক-রোগ দেখা দেয়, আর তাতে মৃত্যু অনিবার্য। ছেলেটি যে ডাক্তারের কাছে গেল সৌভাগ্যক্রমে তিনি লুই পাস্তুর ও তাঁর আবিষ্কারের কথা শুনেছিলেন। ভদ্রলোক অবিলম্বে ছেলেটিকে পাস্তুরের কাছে পাঠালেন। ঠিক সে সময়ে পাস্তুর জলাতঙ্ক রোগ-নিবারণের এক সিরাম তৈরি করেছিলেন, কিন্তু ভেবে পাচ্ছিলেন না কার উপর ওটা প্রয়োগ করবেন। মিস্টার আসাতে সুবিধা হয়ে গেল, দিনের পর দিন পাস্তুর তাকে ইন্‌জেক্‌শন দিতে থাকলেন, ছেলেটির জলাতঙ্ক-রোগ দেখা দিল না।

সংবাদটা চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ল। শুধু ফ্রান্স নয়, ইংলন্ড, রাশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের জলাতঙ্ক-রোগী প্রতিষেধক সিরাম ইন্‌জেক্‌শন নেবার জন্যে পাস্তুরের পরীক্ষাগারে আসতে লাগল। দূরদেশ থেকে আসার অসুবিধা দূর করতে পাস্তুর তাঁর প্রণালী-মতে চিকিৎসার বিভিন্ন কেন্দ্র পৃথিবীর বহু স্থানে প্রতিষ্ঠিত করার পক্ষে সাহায্য করলেন, জলাতঙ্ক-রোগে মৃত্যু থেকে লোক রক্ষা পেল। আজ

পৃথিবী থেকে ও-রোগ চলে গেছে বললেই হয়। কিন্তু এ হল পাস্তুরের পরিণত বয়সের আবিষ্কার।

লুই পাস্তুর ১৮২২ সালে ডিসেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার চামড়ার ব্যাবসা ছিল, কিন্তু তাঁর অভিলাষ ছিল পুত্র ভালো রকম লেখাপড়া শিখে ভবিষ্যতে কোনো কলেজের অধ্যাপক হয়। এর জন্যে গোড়া থেকে তিনি যথাযথ ব্যবস্থা করলেন, ফ্রান্সের সবচেয়ে ভালো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ছেলেকে পাঠালেন। রসায়নবিদ্যা ছিল লুইএর সবচেয়ে প্রিয় বিষয়, দিন রাত তিনি সে-সম্বন্ধে অনুশীলন করে চললেন। তাঁর পিতার আনন্দের অবধি রইল না যখন কয়েকটি মৌলিক গবেষণার জন্য পাস্তুর ডক্টর উপাধি লাভ করলেন।

(পাউসেট নামে একজন বিজ্ঞানী একটা পরীক্ষা করলেন।) তিনি একটা ফ্লাস্ক্ ফুটন্ত জলে পূর্ণ করে মুখটা ছিপি দিয়ে বন্ধ করলেন। এবার ফ্লাস্ক্‌টা উল্টে ধরলেন। একটা পাত্রে পারা ছিল, মুখটা পারার মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে ছিপিটা খুলে সরিয়ে নিলেন। এইবার তিনি রাসায়নিক পদ্ধতিতে অক্সিজেন তৈরি করে ওই ফ্লাস্কের মধ্যে চালিয়ে দিলেন, কিছু জল বেরিয়ে এল। শেষে তিনি গরম চিমটে দিয়ে ধরে একটা খড়ের টুকরো এই ফ্লাস্কের মধ্যে প্রবেশ করালেন। এখন ফ্লাস্কের মধ্যে রইল বিশুদ্ধ অক্সিজেন, ফোটানো জল, আর জীবাণুশূন্য খড়। কোনো রকমে কোনো পথ দিয়ে ওর ভিতর জীবাণু ঢুকতে পারে না। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে দেখা গেল যে, ফ্লাস্কের জলটা ঘোলাটে হয়েছে। অণুবীক্ষণে ওই জলে বহু জীবাণুর সন্ধান পাওয়া গেল। এই পরীক্ষা থেকে পাউসেট ঘোষণা করলেন যে, একমাত্র জীব থেকেই জীবের উৎপত্তি হয় লোকের এ ধারণা ভুল, ওই ফ্লাস্কে জীবাণুরা আপনা হতেই জন্মাল।

(পাস্তুর এ সম্বন্ধে বহু অনুসন্ধান করে সুনিশ্চিত হলেন যে, পাউসেটের সিদ্ধান্ত ভুল;) তিনি বহু লোকের সম্মুখে পাউসেটের পরীক্ষাটা করলেন। ঘর অন্ধকার করে, পাত্রস্থিত পারার উপর উজ্জ্বল আলো ফেললেন, দেখালেন যে, পারার উপর বহু ধূলিকণা রয়েছে। তিনি বললেন যে, ওই-সব ধূলিকণাতে জীবাণু আছে, আর যখন ফ্লাস্কের মধ্যে খড় দেওয়া হল তখন ওই খড়ের সঙ্গে অনেক জীবাণু ভিতরে চলে গেল। তিনি দেখালেন যে, ধুলাতে সব সময় জীবাণু থাকে। তিনি বললেন যে, বায়ুতে জীবাণু রয়েছে, কোথাও বেশি কোথাও কম। বন্ধ শয়নঘরে জীবাণুরা সংখ্যায় বেশি, পর্বতের উপরকার বায়ুতে খুবই কম। বহু পরীক্ষা থেকে তিনি এ-সব সিদ্ধান্তে এলেন।

একদিন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পাস্তুরের সাক্ষাৎ হল, সে লোকটি বিট থেকে কোহল তৈরি করত। লোকটি জানাল যে, তার প্রস্তুত কোহল শিগগির খারাপ হয়ে যায়। এখন, কোহল যে শুধু বিট থেকেই হয় তা নয়, নানা রকম ফল বার্লি প্রভৃতি

যে-সব জিনিসে চিনি আছে তা থেকেও কোহল প্রস্তুত করা যেতে পারে। পাস্তুর দেখলেন যে, চিনির গেঁজে-ওঠাই হল কোহল তৈরির মূলকথা, আর চিনিকে গাঁজিয়ে তোলে জীবাণু। দুধ যে টকে যায়, মাখনের উপর যে ছাতা পড়ে, এ-সবার মূলে হল ওই একই ব্যাপার। তিনি দেখলেন যে, লম্বাটে ধরনের এক রকমের জীবাণু কোহলকে খারাপ করে। তিনি সে-রকমের জীবাণু-বিনাশের ব্যবস্থা করলেন, কোহল আর খারাপ হল না।

সেই সময় ফ্রান্সে গুটিপোকা-চাষের খুব চলন ছিল। দক্ষিণ-ফ্রান্সের অধিবাসীরা এই ব্যবসায়ে ও রেশমের জিনিস তৈরির কাজে তাদের জীবিকা অর্জন করত। ১৮৬৫ সালে ওই গুটিপোকার মড়ক লাগল, রেশমের ব্যাবসা একেবারে বন্ধ হয়ে যাবার মতো হল। পাস্তুরের উপর ভার পড়ল এর প্রতিকারের উপায় নির্ধারণ করার। এই ব্যবস্থায় গুটিপোকার চাষীরা দুঃখিত হল, প্রাণিতত্ত্ববিশারদদের যে কাজ তার ভার দেওয়া হল কিনা একজন রসায়নবিদ্‌কে! পাস্তুর পরীক্ষা আরম্ভ করলেন, দেখলেন যে এক বিশিষ্ট রকমের জীবাণু এই উৎপাত ঘটায়। তিনি তাদের চিনলেন, চাষীদের চেনালেন, প্রতিষেধক ব্যবস্থা করলেন; মড়ক থেমে গেল, ফ্রান্সের জাতীয় ব্যাবসা পুনরুজ্জীবিত হল। তাই তো টমাস হক্সলি বলেছিলেন, ১৮৭০ সালে জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধে ফ্রান্সকে যে পরিমাণ খেসারত দিতে হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি টাকা ফ্রান্সের ঘরে এল পাস্তুরের এক আবিষ্কার থেকে।

অ্যানথ্রাক্স-রোগে প্রতি বছর অনেক জন্তু-জানোয়ার মারা যেত। পাস্তুরের জীবাণু সম্বন্ধে আবিষ্কারের পর কখ্ নামে একজন বিজ্ঞানী অ্যানথ্রাক্স-রোগে মৃত একটি পশুর রক্তে এক বিশিষ্ট রকমের জীবাণু লক্ষ্য করলেন। তিনি সেই জীবাণু ইঁদুর খরগোসের গায়ে ইন্‌জেক্‌শন করলেন, তাদেরও ওই রোগ দেখা দিল। এখন পাস্তুর এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করলেন। তিনি বললেন, মৃদু রকমের এই জীবাণু যদি কোনো পশুর রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যায় তবে তার তখন ওই রোগ খুব স্বল্পভাবে দেখা দেবে, কিন্তু ভবিষ্যতে ওই রোগের মারাত্মক আক্রমণ থেকে সে রক্ষা পাবে। পশুশাস্ত্রবিদেরা পাস্তুরের কথা উপহাস করে উড়িয়ে দিল, শেষে তারা পরীক্ষা-দ্বারা প্রমাণ করবার জন্য পাস্তুরকে আহ্বান করল। পাস্তুর সম্মত হলেন। ১৮৮১ সালের ২রা জুন বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন, প্রচলিত সংস্কার বা পরীক্ষা-লব্ধ সিদ্ধান্ত, কিসের জয় হবে। পাস্তুরের মতের পক্ষের ও বিপক্ষের বহু লোক সমবেত হয়েছেন। প্রাণিবিদ্যার, চিকিৎসাবিদ্যার বিশেষজ্ঞরা এসেছেন, বহু সাংবাদিক উপস্থিত। এর আগে পাস্তুরকে পঞ্চাশটি সুস্থ ভেড়া দেওয়া হয়েছিল, তাদের পঁচিশটিকে তিনি মৃদু টিকা দিয়েছেন, বাকি পঁচিশটির কিছুই করেন নি। এর কিছু দিন পরে পঞ্চাশটি ভেড়াকে তিনি তীব্র অ্যানথ্রাক্স-জীবাণু ইন্‌জেক্‌শন

করেছেন। ওই দিন বেলা দুটোর সময় পাস্তুর জনমণ্ডলীর মধ্যে উপস্থিত হলেন। ভেড়াগুলি পর পর রাখা হয়েছে। দেখা গেল, আগে টিকা দেওয়া হয় নি এমন পঁচিশটির মধ্যে বাইশটি মৃত, তিনটি যায়-যায় অবস্থায়; আর টিকা দেওয়া পঁচিশটি ভেড়া সম্পূর্ণ সুস্থ আছে। বিপুল হর্ষের মধ্যে জনমণ্ডলী পাস্তুরের জয়ধ্বনি করল।

এর পর পাস্তুর জলাতঙ্ক-রোগের কারণ ও তার নিবারণে পদ্ধতি নির্ণয় করলেন। শুধু এই আবিষ্কারটির জন্যই তিনি সমগ্র জগদ্‌বাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে থাকবেন।

পাস্তুর কোনোদিন চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করেন নি, কিন্তু তিনিই বহু ব্যাধির কারণ নির্ণয় করলেন আর জগদ্‌বাসীকে তার দূরীকরণের উপায় জানিয়ে গেলেন। ফরাসী দেশে সর্বশ্রেষ্ঠ লোক কে, এ-সম্বন্ধে সেই সময় একবার ভোট নেওয়া হয়েছিল। বহুসংখ্যক লোক ভোট দিয়েছিল। গণনায় দেখা গেল পাস্তুর প্রথম, নেপোলিয়ান দ্বিতীয় ও ভিক্‌টর হুগো তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন।

কিন্তু কী অমায়িক ছিলেন এই জগদ্‌বিখ্যাত বিজ্ঞানী! ১৮৮২ সালে লন্ডন শহরে চিকিৎসাবিদ্যা-সম্বন্ধীয় এক সর্বদেশীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। ফ্রান্স পাস্তুরকে তার প্রতিনিধি করে পাঠাল। অধিবেশন আরম্ভ হবে, সকলে খবর নিচ্ছে পাস্তুর এসে পৌঁচেছেন কি না। হল্‌ লোকে লোকারণ্য। দর্শকমণ্ডলীর বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে পাস্তুর প্রবেশ করলেন। তাঁর সঙ্গী ছিলেন তাঁর পুত্র ও জামাতা। অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে তিনি তাঁদের বললেন, বোধ হয় প্রিন্স অব্‌ ওয়েল্‌সের আগমনে এই জয়ধ্বনি, আমাদের আগে আসা উচিত ছিল। কংগ্রেসের সভাপতি পাশেই ছিলেন। তিনি বললেন, না, দর্শকমণ্ডলী আপনাকেই অভিনন্দন জানাচ্ছে।

১৮৯৫ সালে ২৮এ সেপ্টেম্বর পাস্তুরের মৃত্যু হয়। তাঁর নামে যে গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় সেইখানেই তাঁর সমাধি রক্ষিত আছে। এই গবেষণাকেন্দ্রের প্রাঙ্গণে একটি মর্মরমূর্তি স্থাপিত হয়েছে—একটা কুকুর এক মেষপালক বালককে আক্রমণ করছে, ছেলেটি বাধা দিচ্ছে।

আজ যদি সকল দেশের সকল কালের সকল বিজ্ঞানীর মধ্যে শীর্ষস্থানীয় পাঁচ জন বিজ্ঞানীর নাম করা হয়, তবে নিশ্চয়ই পাস্তুরের নাম তার মধ্যে থাকবে। আর সমগ্র মানবজাতির সবচেয়ে বেশি কল্যাণসাধন করেছে কে, এ প্রশ্নের উত্তরে পাস্তুরের কথাই বলতে হবে।

ভারতবর্ষ

এস্‌. ওয়াজেদ আলি

পঁচিশ বৎসর পূর্বে একবার আমি কলকাতায় এসেছিলুম। তখন আমার বয়স দশ-এগারো বৎসর হবে। আমাদের বাসার নিকটে ছিল একটি মুদিখানা। তার পাশ দিয়ে আমাদের যাওয়া-আসা করতে হত। সেই মুদিখানায় একটি বৃদ্ধ গদিতে বসে বিপুলকায় একটি বই নিয়ে সাপ-খেলানো সুরে কী পড়ত। বৃদ্ধের মাথায় ছিল মস্ত এক টাক, চার পাশে তার ধপ্‌ধপে সাদা চুল; নাকের উপর মস্ত এক চাঁদির চশমা; গম্ভীর শ্মশ্রুগুম্ফশূন্য মুখ। বেশ বিজ্ঞ লোকের মতো চেহারা। একটি মাঝারি বয়সের লোক এক-এক বার বৃদ্ধের কাছে এসে বসে পাঠ শুনত, আবার খদ্দের এলে, গিয়ে তাদের দেখা-শুনা করত। আমারই বয়সী একটি ছেলে, খালি-গায়ে বুড়োর কাছে সর্বদা বসে থাকত। আর তার পাশে থাকত দুটি মেয়ে। বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে তারা সেই পাঠ শুনত। তাদের মুখের ভাব দেখে মনে হত, বিষয়টি তারা বিশেষভাবেই উপভোগ করছে।

বুড়ো কী পড়ছে জানবার জন্য আমার বিশেষ কৌতূহল হল। বাসা থেকে বেরিয়ে মুদিখানার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আমি শুনতে লাগলুম। রামচন্দ্র কী ক'রে কপিসেনার সাহায্যে সমুদ্রের উপর সেতু বেঁধে লঙ্কাদ্বীপে পৌঁচেছিলেন, তাই ছিল পাঠের বিষয়। সেই অপূর্ব ক্রিয়াকাণ্ডের কথা শুনে ছেলেদের মুখ আনন্দ আগ্রহ আর উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে উঠত। আমি যখন সেই বর্ণনা শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যেতুম তখন কেউ-না-কেউ এসে আমায় ডেকে নিয়ে যেত। সেতু বাঁধা হচ্ছিল, তাই আমি জেনেছিলুম। রামচন্দ্র সেতু পার হয়েছিলেন কি না, আর পার হয়েই-বা কী করেছিলেন, তা তখন জানতে পারি নি।

দু-চার দিন পরে আমি দেশে ফিরে গেলুম। তার পর কোথা থেকে যে কোথা গেলুম, তার ঠিকানা নেই। পরিবর্তনের কত স্রোত আমার জীবনের উপর দিয়ে বয়ে গেল। সেই বৃদ্ধ আর তার সন্তান-সন্ততির নিরীহ শান্ত জীবনের ছবিটি মনের কোন্‌ গুপ্ত কোণে হারিয়ে গেল। তাদের অস্তিত্বের কথা আমি ভুলে গেলুম! এমন কত শত জিনিস রোজ আমরা ভুলে যাচ্ছি।

এই সেদিন দৈবক্রমে বেড়াতে বেড়াতে আবার সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম। ঘর-বাড়ি সব বদ্‌লে গিয়েছে। আগে যেখানে ঘর ছিল, এখন সেখানে বড়ো বড়ো ম্যান্‌শন (mansion) মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। আগে দু-চারটে রিক্‌শ আর ঘোড়ার গাড়িই সে পথ দিয়ে যেত; এখন বড়ো বড়ো মোটর অনবরত যাওয়া-আসা করছে। আগে

মিটমিট করে গ্যাসের বাতি জ্বলত.; এখন ইলেক্‌ট্রিক আলো স্থানটিকে দিনের মতো উজ্জ্বল করে রেখেছে। আমি কালের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনের কথা ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ আমার চোখ পড়ল সেই পুরানো মুদিখানাটির উপর। সেখানে বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় নি। জিনিসপত্র ঠিক আগের মতো সাজানো রয়েছে। চাল থেকে এখনও কেরোসিনের একটি বাতি ঝুলছে। বোধ হয় পঁচিশ বছর আগের সেই বাতিটি!

আমি কিন্তু স্তম্ভিত হয়ে গেলুম ভিতরকার দৃশ্য দেখে। পঁচিশ বছর আগে যে বৃদ্ধকে দেখেছিলুম, ঠিক তারই মতো একটি বৃদ্ধ গদির উপর বসে মোটা একটি বই নিয়ে সাপ-খেলানো সুরে কী পড়ছিল। পঁচিশ বছর আগের সেই মধ্যবয়স্ক লোকটির মতোই একটি মধ্যবয়স্ক লোক এক-এক বার এসে সেই পাঠ শুনছিল আর আবশ্যক-মত খদ্দেরদের দেখা-শুনা করছিল। ঠিক সেই আগের ছেলেটির মতো একটি ছেলে, খালি-গায়ে বুড়োর মুখের দিকে চেয়ে বসে ছিল। তার পাশে বসে ছিল সেই আগেকার মেয়েদের মতো দেখতে দুটি মেয়ে।

কোনো মায়ামন্ত্রবলে সেই সুদূর অতীত আবার ফিরে এল নাকি? আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলুম। বৃদ্ধ পড়ছিল রামচন্দ্রের সেই সেতুবন্ধনের কথা—পঁচিশ বছর আগে যা শুনেছিলুম।

আমি আর থাকতে পারলুম না; সোজা বৃদ্ধের কাছে গিয়ে বললুম, "মশায়, মাপ করবেন। ঠিক পঁচিশ বৎসর পূর্বে আমি এই ছেলেদের সামনে আপনাকে এই বই পড়তে দেখেছি। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এরা কি আর বাড়ে নি, আর আপনার মধ্যেও কি কোনো পরিবর্তন হয় নি? রামচন্দ্র কি এখনও সেই সেতুবন্ধনের কাজে ব্যস্ত আছেন?"

বৃদ্ধ তার চোখ দুটি তুলে আমার দিকে একবার চাইলে। নাকের উপর থেকে চশমা খুলে ধুতির খুঁট দিয়ে প্লাস দুটিকে ভালো করে পুঁছে আবার সেটিকে নাকের উপর চড়ালে। ধীর গম্ভীর দৃষ্টিতে আমার আপাদমস্তক একবার ভালো করে দেখে নিলে; তার পর বিস্ময়ের স্বরে বললে, "পঁচিশ বছর আগে আপনি এখান দিয়ে গিয়েছিলেন?" আমি বললুম, "আজ্ঞে হাঁ।" বৃদ্ধ বললে, "তা হলে আপনি আমার স্বর্গীয় পিতামহাশয়কে এই রামায়ণ পড়তে দেখেছেন। আমার ছেলেমেয়েরা তাঁর কাছে বসে পাঠ শুনত। ছেলেটি এখন ঐ বড়ো হয়েছে। ওর বয়স আপনার মতোই হবে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। ভগবানের ইচ্ছায় তারা স্বামী-পুত্র নিয়ে ঘরকন্না করছে। এই ছেলেটি হচ্ছে আমার নাতি, আর এই মেয়ে দুটি আমার নাতনি—আমার ঐ ছেলের সন্তান।"

বৃদ্ধের হাতের বইটির দিকে ইঙ্গিত করে বললুম, "এ বইটি কবেকার?"

স্মিত হাস্যে বৃদ্ধ বললে, "এ হচ্ছে কৃত্তিবাসের রামায়ণ। আমার ঠাকুরদাদা

বটতলায় এটি কিনেছিলেন। সে অনেক দিনের কথা; আমার তখন জন্ম হয় নি।"

বৃদ্ধকে অভিবাদন করে দোকান ত্যাগ করলুম। মনে হল, আমি দিব্যচক্ষু পেয়েছি! প্রকৃত ভারতবর্ষের নিখুঁত একটা ছবি আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল। —সেই tradition সমানে চলেছে, তার কোথাও পরিবর্তন ঘটে নি।

A. E. অচেনার আনন্দ 1982

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

এবার বাড়ি হইতে যাইবার সময় হরিহর ছেলেকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল। বলিল, "বাড়ি থেকে কিছু খেতে পায় না, তবু ও বাইরে বেরুলে দুধটা ঘিটা—ওর শরীরটা সারবে এখন।"

অপু জন্মিয়া অবধি কোথাও কখনো যায় নাই। এ গাঁয়েরই বকুলতলা, গোসাঁই-বাগান, চালতেতলা, নদীর ধার, বড়ো জোর নবাবগঞ্জ যাইবার পাকা সড়ক—এই পর্যন্ত তাহার দৌড়। মাঝে মাঝে বৈশাখ কি জ্যৈষ্ঠ মাসে খুব গরম পড়িলে তাহার মা বৈকালে নদীর ঘাটে দাঁড়াইয়া থাকিত। নদীর ওপারের খড়ের মাঠে বাবলা গাছে গাছে হলুদ রঙের ফুল ফুটিয়া থাকিত, গোরু চরিত, মোটা গুলঞ্চলতা-দুলানো শিমুল গাছটাকে দেখিলে মনে হইত যেন কতকালের পুরাতন গাছটা। রাখালেরা নদীর ধারে গোরুকে জল খাওয়াইতে আসিত, ছোট্ট একখানা জেলে-ডিঙ্গি বাহিয়া তাহাদের গাঁয়ের অক্রুর মাঝি মাছ ধরিবার দোয়াড়ি পাতিতে যাইত, মাঠের মাঝে মাঝে ঝাড় ঝাড় সোঁদালি ফুল বৈকালের ঝিরঝিরে বাতাসে দুলিতে থাকিত—ঠিক সেই সময় হঠাৎ এক-একদিন ওপারের সবুজ খড়ের জমির শেষে নীল আকাশটা যেখানে আসিয়া দূর গ্রামের সবুজ বনরেখার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে সেদিকে চাহিয়া দেখিতেই তাহার মনটা যেন কেমন হইয়া যাইত—সে-সব কথা প্রকাশ করিয়া বুঝাইয়া বলিতে জানিত না। শুধু তাহার দিদি ঘাট হইতে উঠিলে সে বলিত, "দিদি—দিদি, দ্যাখ্ দ্যাখ্ ঐদিকে"—পরে সে মাঠের শেষের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিত—"ঐ যে! ঐ গাছটার পেছনে! কেমন অনেক দূর না?" দুর্গা হাসিয়া বলিত, "অনেক দূর—তাই দেখাচ্ছিলি? দূর, তুই একটা পাগল!"

আজ সেই অপু সর্বপ্রথম গ্রামের বাহিরে পা দিল। কয়েকদিন পূর্ব হইতেই

উৎসাহে তাহার রাত্রিতে ঘুম হওয়া দায় হইয়া পড়িয়াছিল, দিন গুণিতে গুণিতে অবশেষে যাইবার দিন আসিয়া গেল।

তাহাদের গ্রামের পথটি বাঁকিয়া নবাবগঞ্জের সড়ককে ডাইনে ফেলিয়া মাঠের বাহিরে আষাঢ়ু-দুর্গাপুরের কাঁচা রাস্তার সঙ্গে মিশিয়াছে। দুর্গাপুরের রাস্তায় উঠিয়াই সে বাবাকে বলিল, "বাবা, যেখান দিয়ে রেল যায় সেই রেলের রাস্তা কোন্ দিকে?" তাহার বাবা বলিল, "সামনেই পড়বে এখন, চলো-না। আমরা রেল-লাইন পেরিয়ে যাব এখন—"

সেবার তাদের রাঙী গাইয়ের বাছুর হারাইয়াছিল। নানা জায়গায় খুঁজিয়াও দুই তিন দিন ধরিয়া কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। সে তার দিদির সঙ্গে দক্ষিণ মাঠে বাছুর খুঁজিতে আসিয়াছিল। পৌষ মাস, ক্ষেতে ক্ষেতে কলাই গাছের ফলে দানা বাঁধিয়াছে, সে ও তাহার দিদি নিচু হইয়া ক্ষেত হইতে মাঝে মাঝে কলাইফল তুলিয়া খাইতেছিল—তাহাদের সামনে কিছুদূরে নবাবগঞ্জের পাকা রাস্তা, খেজুর গুড় বোঝাই গোরুর গাড়ির সারি পথ বাহিয়া ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ করিতে করিতে আষাঢ়ুর হাটে যাইতেছিল।

তাহার দিদি পাকা রাস্তার ওপারে বহুদূরে ঝাপ্সা মাঠের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া কী দেখিতেছিল, হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল—"এক কাজ করবি অপু, চল্ যাই আমরা রেলের রাস্তা দেখে আসি, যাবি?" অপু বিস্ময়ের সুরে দিদির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "রেলের রাস্তা—সে যে অনেক দূর! সেখানে কী করে যাবি!"

তার দিদি বলিল, "বেশি দূর বুঝি? কে বলেচে তোকে—ঐ পাকা রাস্তার ওপারে তো—না?"

অপু বলিল, "নিকটে হলে তো দেখা যাবে? পাকা রাস্তা থেকে দেখা যায়—চল্ দিকি দিদি, গিয়ে দেখি।"

দুইজনে অনেকক্ষণ নবাবগঞ্জের সড়কে উঠিয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিল। তাহার দিদি বলিল, "বড্ড অনেক দূর, না? যাওয়া যাবে না?—"

কিছু তো দেখা যায় না—অত দূর গেলে আবার আসবে কী করে—তাহার সতৃষ্ণ দৃষ্টি কিন্তু দূরের দিকে আবদ্ধ ছিল, লোভও হইতেছিল, ভয়ও হইতেছিল। হঠাৎ তাহার দিদি মরিয়ার ভাবে বলিয়া উঠিল, "চল্ যাই দেখে আসি অপু, কতদূর আর হবে? দুপুরের আগে ফিরে আসব এখন, হয়তো রেলের গাড়ি যাবে এখন—মাকে বলব বাছুর খুঁজতে দেরি হয়ে গেল—"

প্রথমে তাহারা একটুখানি এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিল কেহ তাহাদিগকে লক্ষ্য করিতেছে কি না। পরে পাকা রাস্তা হইতে নামিয়া পড়িয়া দুপুর রোদে ভাই বোনে মাঠ বিল জলা ভাঙিয়া সোজা দক্ষিণ মুখে ছুটিল। দৌড়, দৌড়, দৌড়—নবাবগঞ্জের

লাল রাস্তা ক্রমে অনেকদূর পিছাইয়া পড়িল—রোয়ার মাঠ, জলসত্রতলা, ঠাকুরঝি পুকুর বামধারে ডানধারে দূরে দূরে পড়িয়া রহিল—সামনে একটা ছোটে বিল নজরে আসিতে লাগিল। তাহার দিদি হাসিয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "মা টের পেলে কিন্তু—পিঠের ছাল তুলবে।" অপু একবার হাসিল মরিয়ার হাসি। আবার দৌড়, দৌড়, দৌড়—জীবনে এই প্রথম বাধাহীন, গণ্ডিহীন, মুক্তির উল্লাসে তাহাদের তাজা তরুণ রক্ত তখন মাতিয়া উঠিয়াছিল—পরে কী হইবে, তাহা ভাবিবার অবসর কোথায়?

পরে যাহা হইল, তাহা সুবিধাজনক নয়। খানিক দূরে গিয়া একটা বড়ো জলা পড়িল একেবারে সামনে—হোগ্‌লা আর শোলা গাছে ভরা, তাহার উপর তাহার দিদি পথ হারাইয়া ফেলিল—কোনো গ্রামও চোখে পড়ে না—সামনে কেবল ধানক্ষেত, জলা, আর বেত-ঝোপ। ঘন বেতবনের ভিতর দিয়া যাওয়া যায় না, পাঁকে জলে পা পুঁতিয়া যায়, রৌদ্র এমন বাড়িয়া উঠিল যে, শীতকালেও তাহাদের গা দিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল—দিদির পরনের কাপড় কাঁটায় নানাস্থানে ছিঁড়িয়া গেল, তাহার নিজের পায়ে দু' তিনবার কাঁটা টানিয়া টানিয়া বাহির করিতে হইল—শেষে রেলরাস্তা দূরের কথা, বাড়ি ফেরাই মুশকিল হইয়া উঠিল। অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে, পাকা রাস্তাও আর দেখা যায় না, জল ভাঙিয়া ধানক্ষেত পার হইয়া যখন তাহারা বহুকষ্টে আবার পাকা রাস্তায় আসিয়া উঠিল তখন দুপুর ঘুরিয়া গিয়াছে। বাড়ি আসিয়া তাহার দিদি ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা কথা বলিয়া তবে নিজের ও তাহার পিঠ বাঁচাইল।

সেই রেলের রাস্তা আজ এমনি সহজভাবেই সামনে পড়িবে—সেজন্য ছুটিতে হইবে না, পথ হারাইতে হইবে না—বকুনি খাইতে হইবে না!

কিছুদূর গিয়া সে বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া দেখিল, নবাবগঞ্জের পাকা সড়কের মতো একটা উঁচু মতো রাস্তা মাঠের মাঝখান চিরিয়া ডাইনে বাঁয়ে বহুদূর গিয়াছে। রাঙা রাঙা খোয়ার রাশি উঁচু হইয়া ধারের দিকে সারি দেওয়া। সাদা সাদা লোহার খুঁটির উপর যেন একসঙ্গে অনেক দড়ির টানা বাঁধা—যতদূর দেখা যায় ঐ সাদা খুঁটি ও দড়ির টানা বাঁধা দেখা যাইতেছে।

তাহার বাবা বলিল, "ঐ দ্যাখো খোকা, রেলের রাস্তা—"

অপু এক দৌড়ে ফটক পার হইয়া রাস্তার উপর আসিয়া উঠিল। পরে সে রেল-পথের দুই দিকে বিস্ময়ের চোখে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। দুইটা লোহা বরাবর পাতা কেন? উহার উপর দিয়া রেলগাড়ি যায়? কেন? মাটির উপর দিয়া না গিয়া লোহার উপর যায় কেন? পিছলাইয়া পড়িয়া যায় না? কেন? ওগুলোকে তার বলে? তারের মধ্যে সোঁ সোঁ কিসের শব্দ? তারে খবর যাইতেছে? কাহারা খবর দিতেছে? কী করিয়া খবর দেয়? ও দিকে কী ইস্টিশান? এ দিকে কী ইস্টিশান?

সে বলিল, "বাবা, রেলগাড়ি কখন আসবে? আমি রেলগাড়ি দেখব বাবা।"

"রেলগাড়ি এখন কী করে দেখবে...সেই দুপুরের সময় রেলগাড়ি আসবে, এখনো দুঘণ্টা দেরি।"

"তা হোক্ বাবা, আমি দেখে যাব, আমি কখ্খনো দেখি নি—হ্যাঁ—বাবা"—

"ওরকম কোরো না, ঐ জন্যে তোমায় কোথাও আনতে চাই নে—এখন কী করে দেখবে? সেই দুপুর একটা অবধি বসে থাকতে হবে তা হলে এই ঠায় রদ্দুরে, চল্ আসবার দিন দেখাব।"

অপুকে অবশেষে জল-ভরা চোখে বাবার পিছনে পিছনে অগ্রসর হইতে হইল।

তুমি চলিয়া যাইতেছ...তুমি কিছুই জান না, পথের ধারে তোমার চোখে কী পড়িতে পারে, তোমার ডাগর নবীন চোখ বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায় চারি দিককে গিলিতে গিলিতে চলিয়াছে— নিজের আনন্দের এ হিসাবে তুমিও একজন দেশ-আবিষ্কারক। (অচেনার আনন্দকে পাইতে হইলে পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে, তাহার মানে নাই।) আমি যেখানে আর কখনো যাই নাই, আজ নতুন পা দিলাম, যে নদীর জলে নতুন স্নান করিলাম, যে গ্রামের হাওয়ায় শরীর জুড়াইল, আমার আগে সেখানে কেহ আসিয়াছিল কি না, তাহাতে আমার কী আসে যায়? আমার অনুভূতিতে তাহা যে অনাবিষ্কৃত দেশ। আমি আজ সর্বপ্রথম মন, বুদ্ধি, হৃদয় দিয়া উহার নবীনতাকে আস্বাদ করিলাম যে!

আমডোব! ছোট্ট চাষাদের গাঁ-খানা—কেমন নামটি! মেয়েরা উঠানে বিচালি কাটিতেছে, ছাগল বাঁধিতেছে, মুরগিকে ভাত খাওয়াইতেছে, বড়ো লোকেরা পাট শুকাইতেছে, বাঁশ কাটিতেছে—দেখিতে দেখিতে গাঁ পিছনে ছাড়িয়া একেবারে বাহিরের মাঠ...বিলে জল থৈ থৈ করিতেছে...উঁড়ি ধানের ক্ষেতে বক বসিয়া আছে... নাল ফুলের পাতা ও ফুটন্ত ফুলে জল দেখা যায় না।

খল্‌সেমারির বিলের প্রান্তে ঘন সবুজ আউশ ধানের ক্ষেতের উপরকার বৃষ্টি-ধৌত, ভাদ্রের আকাশের সুনীল প্রসার। সারা চক্রবাল জুড়িয়া সূর্যাস্তের অপরূপ বর্ণচ্ছটা, বিচিত্র রঙের মেঘের পাহাড়, মেঘের দ্বীপ, মেঘের সমুদ্র, মেঘের স্বপ্নপুরী —খোলা আকাশের সহিত এ রকম পরিচয় তাহার এতদিন হয় নাই; মাঠের পারে দূরের দেশটা এবার তাহার রহস্য-অবগুণ্ঠন খুলিল আট বছরের ছেলেটির কাছে।

যাইতে যাইতে বড়ো দেরি হইল। তাহার বাবা বলিল, "তুমি বড্ড হাঁ-করা ছেলে, যা দেখ তাতেই হাঁ করে থাক কেন অমন? জোরে হাঁটো।"

সন্ধ্যার পর তাহারা গন্তব্য স্থানে পৌঁছিল। শিষ্যের নাম লক্ষ্মণ মহাজন, বেশ বড়ো চাষী ও অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। বাহিরের বড়ো আটচালা ঘরে মহা আদরে তাহার থাকিবার স্থান করিয়া দিল।

পণ্ডিত মশাই

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

কালো লম্বা মানুষটি—ঘোর কালো। গলায় পৈতা আছে বলিয়া বোঝা যায় ব্রাহ্মণ। নাম যতীন চাটুজ্জে। পাঠশালার পণ্ডিত। লোকে বলে, কাক-পণ্ডিত।

শুধু কালো বলিয়াই নয়। আরও কথা আছে ইহার মধ্যে। ছোট্ট একখানি চাষীর গ্রামের পাঠশালা। ওই যতীনই আসিয়া স্থাপন করিয়াছে। মূল জীবিকা ব্রাহ্মণহীন চাষীর গ্রামে গ্রাম-দেবতা পূজা করা, ঘরে ঘরে ষষ্ঠী পূজা, লক্ষ্মী পূজা করা। যতীনকে এই জন্য লোকে প্রকাশ্যে বলে,—যতীনঠাকুর।

বুদ্ধিমান যতীন অতঃপর ভাবিয়া-চিন্তিয়া পাঠশালা খুলিয়া বসিল। জমিদারের কাছারিতে পাঠশালা বসে। কয়েক বৎসরই পাঠশালা হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্যন্তও পাঠশালার একটি ছাত্রও বৃত্তি পায় নাই। সেটা যতীনের অক্ষমতা নয়। সে ভাল ছেলে তৈয়ারী করিলেই পাশের গ্রামের পাঠশালার পণ্ডিতেরা জামা-কাপড়, বই টাকার লোভ দেখাইয়া ছেলেটিকে ভাঙাইয়া লইয়া যায়। এমন কয়েকটি ছেলেই অন্য পাঠশালা হইতে বৃত্তি পাইয়াছে। তাই তার কালো চেহারার সঙ্গে মানাইয়া লোকে গোপনে তাহাকে বলে,—কাক-পণ্ডিত। অর্থাৎ কাকের মতই সে কোকিলের ছানা মানুষ করে, একদা সে ছানা বড় হইয়া অন্যত্র গিয়া কুহু কুহু করিয়া গান গাহিয়া চারি দিক মাতাইয়া দেয়। লোকে তারিফ করে।

পূজা এবং পড়ানো একই সঙ্গে চলে যতীন চাটুজ্জের। সকালে পূজা না হইলে দেবসেবায় ত্রুটি হয়, আবার পাঠশালা—সেও সকালে না বসাইলে নয়। যতীন অতি সুকৌশলে দুই কাজ সারিয়া যায়। পাঠশালা বসাইয়া সে অপেক্ষা করিয়া থাকে।

"পাখী সব করে রব"-এর পরেই বসে তাহার পাঠশালা, এবং যেই দেখে "শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে,"—অমনি যতীন তেলের বাটি লইয়া বসে। পাঠশালাতে বসিয়া তেল মাখাও চলে, আর ছেলে-পড়ানোও চলে। তারপর বলে—গ্রহণ কর, সব শেলেট গ্রহণ কর এইবার।

যতীন সাধু-ভাষায় কথা বলে।

ছেলেরা 'শেলেট গ্রহণ করিলে বলে—আপন আপন পাঠগুলি যত্নসহকারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক'রে লিখে রাখ। আমি অবগাহন ক'রে আসি। আচ্ছা, ভোলা, অবগাহন শব্দের অর্থ কি, বল তো?

আজ্ঞে, এমনি করে ডুব দেওয়া।

ভোলা কান দুইটি আঙুল দিয়া বন্ধ করিয়া বায়ু-সরোবরেই ডুব দেয়।

যতীন ধাঁ করিয়া স্নান সারিয়া আসে। জমিদারের কাছারিতেই পাঠশালা বসে, কাছারির প্রাঙ্গণে কয়েকটি জবা, আকন্দ ও কল্কে ফুলের গাছ, গোটা-দুই বেলের গাছও আছে। কাপড় ছাড়িয়া যতীন কয়েকটা ফুল তুলিয়া লয়, অতঃপর বিল্বপত্র চয়ন করিবার পূর্বে কপালে হাত ঠেকাইয়া অদৃশ্য বৃক্ষবিহারীকে প্রণাম করিয়া তবে বিল্বপত্র চয়ন করে।

তারপর হয় টিফিনের ছুটি।

সে বিল্ববাসিনীর ঘরে ঢুকিয়া প্রথমেই ভাঙা কাঁসরটা ঢন্‌-ঢন্‌ শব্দে বাজাইয়া দেয়। ছেলেরাও অমনি ছুটি পাইয়া কলরব করিতে করিতে বাড়ি ছুটে।

যতীন পণ্ডিতের উপদেশ দেওয়া আছে, গুড়সহযোগে মুড়ি অথবা যার পিতামাতা যা দেবেন, সন্তুষ্টচিত্তে প্রসন্নমনে তাই ভক্ষণ করবে। তারপর পিতার গাভী দোহনের সময় গো-বৎসটিকে ধৃত ক'রে পিতাকে সাহায্য করবে। গাভী দোহনের পর আবার পাঠশালায় আগমন করবে। বুঝেছ?

ছাত্রদের পিতার গাভী দোহন হইতে হইতে পণ্ডিতের পূজা শেষ হইয়া যায়। শুধু ঐ পূজাই শেষ হয় না, যতীনের উদরপূজাও শেষ হইয়া যায়। কাছারির বারান্দায় ছেঁড়া মোড়ায় বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে সে ছাত্রদের জন্য অপেক্ষা করে।

মণি মণ্ডলের ভগ্নী 'ফুরি' বিল্ববাসিনীর পূজার প্রদীপ ও ধূপ দেয়। এটি জমিদারের বন্দোবস্ত, মণি মণ্ডল ইহার জন্য জমি ভোগ করে। ফুরি বলে ঠাকুর 'আস্তা' থেকে মন্তর বলতে বলতে আসে। পাঠশালার কাঁসর শুনেই আমি প্রদীপ সাজিয়ে ধূপের আগুন নিয়ে আসতে আসতে দেখি, ঠাকুরের পুজো শেষ হয়ে গিয়েছে।

ফুরি একদিন যতীনকে এ কথা বলিয়াছিল।

যতীন গম্ভীরভাবে তাহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিল—ঈদৃশ বাক্য আর কখনও তুমি উচ্চারণ করো না, বুঝেছ?

ফুরি হাসিয়া সারা হইয়াছিল,—'ঈদৃশ বাক্য' কি গো? ঈদৃশ বাক্য! হি-হি-হি! ঈদৃশ বাক্য কথাটি তাহার বড়ই কৌতুককর মনে হইল। ফুরি আড়ালে যতীনের নাম দিয়াছে—'ঈদৃশ বাক্য'।

যাক সে কথা।

টিফিনের পর যতীন পাঠশালা লইয়া বসে, একেবারে পুরা তিনটি ঘণ্টা পড়াইয়া ছেলেদের ছাড়িয়া দেয়। পাঠশালার বড় ছেলেরা এই সময়টার নাম দিয়াছে 'কাল-বোশেখী'। বলে—কালবোশেখীর ঝড় আসছে। যতীন নিজেও সে সময় ঘর্মাক্ত হইয়া

উঠে। আপশোস করিয়া বলে—খদ্যোত কখনও গগনগাত্রে আরোহণ করতে পারে না। বৃথা চেষ্টা আমার।

আবার একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলে,—পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে, ভাঙে হীরার ধার।—বলিয়াই ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গবেষণায় নিযুক্ত হয়, ঐ 'ভেড়া' শব্দটি অত্যন্ত দুষ্ট প্রয়োগ হইয়াছে। মেষ বলিলে ক্ষতি কি ছিল? গুরু-চণ্ডালী দোষ অমার্জনীয়। তারপর হইতে সে ভেড়ার শৃঙ্গে না বলিয়া, মেষের শৃঙ্গেই বলে।

সেদিন বিল্ববাসিনীর পূজা শেষ করিয়া মুড়ি এবং গুড় ভোজনান্তে হুঁকাটি হাতে পাঠশালাতে আসিয়া যতীন দেখিল, জমিদারের গমস্তা ও নগ্দী বসিয়া আছে।

সে তাড়াতাড়ি গমস্তাকে আহবান করিয়া বলিল—আসুন, আসুন, আসুন। আপনাদের সব মঙ্গল? শুভ সংবাদ ত' সব?

যেন কাছারিটি তাহারই নিজের বাড়ি।

গমস্তা বলিল—হ্যাঁ, সব মঙ্গল। তারপর, আপনার যে কাজ এসেছে, সেইজন্যেই এসেছি।

কল্কেটি গমস্তার নিকট নামাইয়া দিয়া বলিল—কি কর্ম, ব্যক্ত করুন!

পোঁটলা হইতে ছোট হুঁকাটি বাহির করিতে করিতে গমস্তা বলিল—বাবু আসছেন মহালে।

যতীন বলিল—অহো ভাগ্য! সুসংবাদ, সুপ্রভাত হয়েছে অদ্য। গ্রামের সৌভাগ্যের বিষয়। জমিদার, ভূস্বামী, রাজা—

গমস্তা বাধা দিল, নতুবা জমিদারের আরও অনেক নাম সে বলিতে পারিত। গমস্তা বাধা দিয়া বলিল—বিল্ববাসিনীর পুজো যখন নেন, তখনকার কথা মনে আছে ত'—বাবু এলে পাক-সাক এখানে আপনাকেই করতে হবে। অবশ্য বাবু নিশ্চয় বকশিস দেবেন।

যতীন বলিল—অবশ্য অবশ্য। কর্তব্য কর্ম অবশ্য করণীয়, অবশ্যই আমি চালিত করে দেব।

এইটুকুর একটু ইতিহাস আছে। যতীন এ গ্রামের বাসিন্দা নয়। এ গ্রামে পূর্বে একঘর মাত্র ব্রাহ্মণ ছিল, তাহারাই বিল্ববাসিনীর পূজা করিত এবং তাহার জন্য জমিদার-প্রদত্ত জমি ভোগ করিত। কিন্তু কিছুদিন পূর্বে সে ব্রাহ্মণবংশটি নির্বংশ হইয়া গিয়াছে। যতীন এ-গ্রামে পাঠশালা করিত, সে এই পূজারী-পদের প্রার্থী হইল। তখনই কথা হয়, তাহাকে এই গ্রামে বাস করিতে হইবে, গ্রামের সকলের পৌরোহিত্যও করিতে হইবে এবং জমিদার অথবা তাঁহার কোন বিশিষ্ট প্রতিনিধি আসিলে তখন পাচকের কাজও করিতে হইবে।

যতীন তাহাই স্বীকার করিয়া লইয়া কাজ গ্রহণ করিয়াছে। বিনিময়ে জমিদার-

প্রদত্ত নিষ্কর আট বিঘা জমি সে পাইয়াছে। কাজ লইয়া পাঠশালা করিতে প্রায়ই বড় অসুবিধা হয়। গ্রামে কোন ক্রিয়া-কর্ম থাকিলে সেদিন আর পাঠশালা করা হয় না। অথবা পাঠশালা সারিয়া সে কর্ম সারিতে গেলে বেলা তিনটা পর্যন্ত অনাহারে থাকিতে হয়। এবং গৃহস্থের তিরস্কার সহ্য করিতে হয় বিস্তর। কিন্তু তবু যতীন পাঠশালাটি ছাড়ে নাই। নানা কৌশলে সুবিধা-অসুবিধার একটা সমন্বয় সে করিয়া ফেলিয়াছে।

গমস্তা বলিল—হ্যাঁ, সেই জন্যই বাবু রাঁধুনী-বামুন সঙ্গে আনবেন না। যতীন একটু মাথা চুলকাইয়া বলিল—দেখুন, একটি অসুবিধা হবে বলে অনুমান করছি। হুজুর হলেন, শহর-নিবাসী, দশ ঘটিকার সময় আহার করা অভ্যাস। কিন্তু আবার বিবেচনা করুন, বিল্ববাসিনীর পূজার্চনা, তৎপর পাঠশালার কর্ম—

ধমক দিয়া গমস্তা বলিল—পাঠশালা এখন বন্ধ করে দেন। আর বাবু এলে পাঠশালা করবেনই বা কোথায়? কাছারিতে ত' এখন পাঠশালা করা যাবে না!

যতীন বলিল—কিন্তু মায়ের পূজা ত'—

গমস্তা বলিল—সে ত' নটার মধ্যেই হয়ে যাবে। ন-টায় রান্না চড়ালে বারটায় শেষ হবে। বাবু আমাদের বারটার এদিকে খান না।

যতীন খুশি হইয়া বলিল—অবশ্য অবশ্য; দ্বাদশ ঘটিকা হল ঠিক মধ্যাহ্ন। মধ্যাহ্ন ভোজন মধ্যাহ্নেই কর্তব্য। হুজুর আমাদের মহদ্বংশোদ্ভূত মহৎ ব্যক্তি।

—হ্যাঁ, কাল হতে পাঠশালা আপনি ছুটি দিয়ে দেন। কাছারিতে কলি ফেরাতে হবে, পরিষ্কার করতে হবে। তারপর নন্দীকে সম্বোধন করিয়া বলিল—কাঠ কেটে চেলা করে রাখ। একটা বড় দেখে ডাল কারও গাছের কেটে নে।

যতীন বলিল—হ্যাঁ বৎস! শাখাটি যেন বেশ শুষ্ক হয়। ভিজা কাষ্ঠ হলে ধূম্রে ধূম্রে অন্ধ হয়ে যেতে হবে। তিন্তিড়ীশাখা হলেই উত্তম হবে। এরূপ দাহ্যকাষ্ঠ আর হয় না।

নন্দী বলিল—কার গাছের ডাল নেব?

বিরক্ত হইয়া গমস্তা বলিল—যার পাবি তারই নিবি। তাই তেঁতুল-ডালই একটা যার গাছ থেকে হোক কেটে নে।

যতীন জোড় হাত করিয়া বলিল—এইসঙ্গে কয়েকটি বংশখন্ড ছেদনের আদেশও ওকে দিতে হবে।

গমস্তা বলিল—আপনার মশাই কোন্ সময়ে কোন্ তাল। কেন, বংশখন্ড নিয়ে কি করবেন ঘর ত' আপনার ছাওয়ানো হয়ে গিয়েছে।

যতীন বলিল—আজ্ঞে তোরণ নির্মাণ করব হুজুর যেদিন পদার্পণ করবেন, সেদিন পত্রপুষ্প দিয়ে সুসজ্জিত করব।

গমস্তা বলিল—তাই দিস রে, গোটা আষ্টেক বাঁশ কেটে ঠাকুরকে দিস।

ছাত্ররা তখন সব আসিয়া গিয়াছে, তাহারা শুনিতে শুনিতে খুশি হইয়া উঠিল,—ছুটি—ছুটি। 'কালবোশেখী' হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইবে।

যতীন এইবার ছেঁড়া মোড়াটিতে বসিয়া আরম্ভ করিল—ছকু, তুমি ভূস্বামী বানান কর ত'।

ছকু নির্ভুল উত্তর দিল।

—হরিচরণ, ভূস্বামী শব্দের অর্থ কি?

হরিচরণ বলিতে পারিল না। হরিচরণের পর একে একে সকল ছাত্রকেই প্রশ্ন করা হইল, কিন্তু কেহই উত্তর দিতে পারিল না। তখন যতীন বলিল—মড়িরাম, তুমি এ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে পার?

শীর্ণকায় টল্‌টলে মুখে মড়িরাম গলায় এক বোঝা মাদুলি লইয়া উঠিয়া বলিল—আজ্ঞে, ভূস্বামী মানে—রাজা, জমিদার।

যতীন খুশি হইয়া বলিল—আমার নিকটে আগমন কর।

মড়িরাম তাহার নিকটে আসিল, যতীন তাহার শীর্ণ দেহে হাত বুলাইয়া বলিল—উত্তম, যথার্থ উত্তর প্রদান করেছ। তারপর সে ছেলেদের—জমিদার কে এবং কি, বুঝাইতে আরম্ভ করিল। ছেলেরা কালবোশেখীর হাত এড়াইয়া জমিদারের দীর্ঘ জীবন কামনা করিতেছিল। বক্তৃতা-শেষে যতীন বলিল—আগামী কল্য হইতে বিল্ববাসিনী মায়ের প্রাঙ্গণে ঐ বৃক্ষচ্ছায়াতে পাঠশালা চালিত হবে, এবং প্রাতঃকালের পরিবর্তে অপরাহ্ণ দুই ঘটিকা হতে পাঁচ ঘটিকা পর্যন্ত হবে।

ছেলেরা পাংশুমুখে এ উহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

যতীন আবার বলিল—হৃদয়ঙ্গম হয়েছে সব?

সকলে ঘাড় নাড়াইয়া জানাইল, হইয়াছে। মড়িরাম ছেলেটি মৃদুস্বরে বলিল—আমাকে তা হলে কখন পড়াবেন?

মড়িরামকে যতীন পৃথক্‌ভাবে পড়াইয়া থাকে, সে সময়টা ঐ দুই হইতে চার ঘটিকা পর্যন্ত নির্দিষ্ট আছে।

যতীন একটু চিন্তা করিয়া বলিল, তুমি বৎস, অতি প্রত্যূষে আমার গৃহে আগমন করবে। ছয় ঘটিকা হতে আট ঘটিকা পর্যন্ত তোমার পাঠাভ্যাস করে দোব।

ছেলেটিও খুশি হইয়া চলিয়া গেল।

জমিদার বাবুটি এ-যুগের মানুষ এবং শিক্ষিত ব্যক্তি। তবুও তোরণ-দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া তিনিও ঈষৎ পুলকিত না হইয়া পারিলেন না। আবার কাছারিতে গিয়া একখানি টিনের চেয়ারে বসিতেই কতকগুলি ছেলে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। তারপর সকলে সারি দিয়া দাঁড়াইয়া কাছারির দিকে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সুর করিয়া আরম্ভ করিল—

বারংবার প্রণিপাত চরণে তোমার।
হে মহতোমহীয়ান করুণা অপার॥
প্রজার পালনে তুমি রামের সমান।
বিদ্যার সাগর তুমি জ্ঞানী গুণবান॥

এবার জমিদার বাবুটি হাসিয়া বলিলেন—বেশ, বেশ। কে শেখালে এ সব তোমাদের?

যতীন আসিয়া হেঁট হইয়া নমস্কার করিয়া বলিল, আজ্ঞে, অধম হুজুরের আশ্রিত ব্যক্তি। বিশাল মহীরুহে কত পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ আশ্রয় গ্রহণ করে, বৃক্ষ সকলকে জ্ঞাত হয় না। অধীনও তদনুরূপ একটি কীট-পতঙ্গ।

গমস্তা মুচকি হাসিয়া বলিল—উনি হলেন, যতীন ঠাকুর, বিল্ববাসিনী মায়ের পুজো করেন আর পাঠশালায় পণ্ডিতী করেন।

জমিদারবাবু নমস্কার করিয়া বলিলেন—বেশ, বেশ, আপনি তাহ'লে পণ্ডিত মশায়! আপনার কথাগুলি বড় চমৎকার। সুন্দর শুদ্ধ। বাঃ, বেশ!

'পণ্ডিত' সম্বোধনে এবং এমন অজস্র প্রশংসাবাদে যতীন যাহাকে বলে পরম পুলকিত, তাই হইয়া উঠিল। পুলকের আতিশয্যে তাহার চোখ দুইটি ছল ছল করিয়া উঠিল। সে হাত জোড় করিয়া বলিল—হুজুর মহৎ, অধীন ক্ষুদ্র। কিন্তু হুজুর, বিবেচনা করে দেখুন, আমি ব্রাহ্মণ, শিক্ষকতা আমার কর্ম। হুজুর, আমি যদি অশুদ্ধ ভাষায় কথোপকথন করি, কিংবা ব্যাকরণদুষ্ট শব্দ প্রয়োগ করি, তবে আমার ছাত্রেরা কিরূপে শুদ্ধ এবং সাধু-ভাষায় জ্ঞান লাভ করিবে। যদি কেউ স্বর্ণালংকারের পরিবর্তে অহরহ পিত্তলের অলংকারই ব্যবহার করে, তবে পিত্তলকেই সে স্বর্ণ বলে জ্ঞান করে।

গমস্তা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সে বলিল—যান গো এইবার যান, রান্না চড়িয়ে দেন গিয়ে।

যতীন বলিল—হ্যাঁ, এই যে আমি প্রস্তুত। অবিলম্বেই রন্ধন সমাপ্ত হয়ে যাবে। কোনও চিন্তা নাই।

জমিদার বলিলেন—আপনিই রান্না করবেন নাকি?

—হ্যাঁ, হুজুর! হুজুরের আশ্রিত আমি, তদুপরি মহাভাগ্য আমার, নতুবা আমার হস্তের রন্ধনে হুজুরের সেবা হবে কেন? বলিয়া সে একখানি দরখাস্ত হুজুরের হাতে দিল। দরখাস্তখানি পড়িবার পূর্বেই সেখানির দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়াই জমিদার মুগ্ধ হইয়া গেলেন। হাতের লেখাটি অতি সুন্দর, প্রথম দৃষ্টিতে ছাপা লেখা বলিয়াই ভ্রম হয়। সপ্রশংস দৃষ্টিতে যতীনের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন—আপনার লেখা? বাঃ এ অতি সুন্দর লেখা, এত সুন্দর লেখা আমি কখনও দেখিনি।

যতীন আবার আরম্ভ করিল—হুজুর, হস্তলিপি সুন্দর না হলে শিক্ষকতা করা

চলে না। কারণ ছাত্রগণ গুরুর হস্তলিপিকেই আদর্শ জ্ঞান ক'রে সেইরূপ শিখবারই চেষ্টা করে। তদ্ব্যতীত, চিন্তা করে দেখুন হুজুর, অগ্রে লেখা, তৎপরে পড়া। সেইজন্যেই লেখাপড়া শব্দ প্রচলিত হয়েছে।

দরখাস্তখানি হুজুর পড়িতেছিলেন, প্রথমেই যতীন আরম্ভ করিয়াছে—মহামহিম মহিমার্ণব জ্ঞান-গুণ প্রভৃতি অশেষ সদ্‌গুণ সমালঙ্কৃত প্রজাপালক ভূস্বামিপ্রবর শ্রীল শ্রীযুক্ত......মহোদয় অশেষ প্রবলপ্রতাপেষু। তাহার পর দীর্ঘ তিন পৃষ্ঠা ধরিয়া গ্রামের পাঠশালাটির দুরবস্থা বর্ণনা করিয়া হুজুরের করুণাদৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে।

জমিদার প্রশ্ন করিলেন—সরকারী সাহায্য কত করে পান?

—এক কপর্দকও নয় হুজুর।

—কেন?

—আমি যে 'জ্যেষ্ঠতাত-পত্নী' পাস নই হুজুর।

জমিদার বিস্মিত হইলেন। যতীন সবিনয়ে বলিল—ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন অধীনের, রহস্য করে ও-বাক্যটি আমি প্রয়োগ করেছি। গুরুট্রেনিংকে বলা হয়, জি ও টি। রহস্য করে আমরা বলি—জেঠি, জ্যেষ্ঠতাত-পত্নী।

জমিদার হাসিয়া বলিলেন—বুঝিছি। আচ্ছা, আমি বরং সেজন্যে চেষ্টা করব।

যতীন বলিল—হুজুর, আক্ষেপের বিষয় আর কত নিবেদন করব! আমার পাঠশালার ছাত্রকে বৃত্তি পরীক্ষা দিতেও অনুমতি দেওয়া হয় না। আমার শিক্ষকতার কৃতিত্ব দেখাতে পেলাম না। নতুবা আমি অহঙ্কার সহকারে বলতে পারি, আমার ছাত্র প্রত্যেকবারই বৃত্তি পরীক্ষাতে কৃতকার্য হ'ত, এবং সেইজন্যই আমি যাদের শিক্ষিত করে তুলি, তাদেরই গ্রহণ করে অবশেষে লোকপাড়ার বিদ্যালয় বৃত্তি পরীক্ষায় সুনাম অর্জন করে। বর্তমান বৎসরে মড়িরাম নামক একটি বালক আছে হুজুর, তাকে হীরকখণ্ড বলা যায়, যদি কোনরূপে অনুমতি পাই হুজুর—

নন্দীটা উনানে আগুন দিয়াছিল, সে বাধা দিয়া ডাকিল—কাঠগুলো পুড়ে যে "হুম্ধর" হয়ে গেল মশায়।

যতীন ব্যস্ত হইয়া বলিল—এই যে আমিও আগমন করছি। তুমি হরিদ্রা লঙ্কা আর্দ্রক প্রভৃতি মসলাগুলি বণ্টনের ব্যবস্থা কর দেখি।

রান্নাঘরের দাওয়া হইতে গমস্তা বলিল—বণ্টনের ব্যবস্থা হয়েছে, এখন আপনি আগমন করুন দেখি। হুজুর তো এখন রইলেন, পরে ওসবের ব্যবস্থা হবে।

যতীন রান্নাঘরে আসিতেই নন্দীটা বলিল—তুমি কিন্তুক্ আচ্ছা বকতে পার মশায়। ব'কে ব'কে মানুষের কানের পোকা মেরে ফেলাও। আঃ, সেই কাল থেকে লেগেছে বাপু!

যতীন চোখ মুছিয়া বলিল—তুমি কি বুঝবে বৎস! কথিত আছে, 'মহতের ধর্ম মহতে জানে, মহতের টান মহতে টানে।' তোমার অবশ্য অপরাধ কি?

জমিদারটিকে যতীনের বড় ভাল লাগিয়াছে। গমস্তা, নন্দী, বাবুর চাপরাসী—সকলেই যতীনকে শাসন করে, কিন্তু বাবুর ব্যবহার বড় মিষ্ট, কখনও কটু কথা বলেন না। গমস্তা, নন্দী, চাপরাসীর ব্যবহারে যতীন দুঃখীত নয়, সে মনে মনে তাহাদের করুণা করে, একান্ত নির্জনে সে আপন মনেই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলে, —অজ্ঞতার মত দুষ্টব্যাধি আর সংসারে নাই।

প্রত্যহ প্রভাতে সে একটি করিয়া সমস্যা আনিয়া জমিদারবাবুর নিকট উপস্থিত করে। করজোড়ে দাঁড়াইয়া বলে—হুজুর, অভয় দিলে অধীন একটি নিবেদন পায়।

বাবুর হাসির মধ্যেই অভয় ফুটিয়া উঠে। যতীন বলে—একটি সমস্যার সমাধান করে দিতে হবে হুজুরকে। হুজুর, এই সংসারের মধ্যে একটা অদৃষ্ট এবং পুরুষ-কারের মধ্যে বিবাদ হয়েছিল। অদৃষ্ট বলে,—আমি শ্রেষ্ঠ, আমি বলবান; পুরুষকার বলে, ভুল, আমিই শ্রেষ্ঠ, আমিই বলবান্। এইটুকুই অবগত হয়েছি, মীমাংসার সংবাদ আমি জানি না। মীমাংসা হুজুরকে ক'রে দিতে হবে।

বাবু শিক্ষিত ব্যক্তি, তিনি বলিলেন—মীমাংসা এখনও হয়নি পণ্ডিতমশাই। বিবাদ এখনও চলছে, কাজেই মীমাংসার খবর কেমন করে দেব আপনাকে।

বাবুর উত্তরে যতীনের চমক লাগিয়া যায়, সে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ফিরিয়া আসিয়া কথাটি ভাবিতে বসে। কিন্তু ভাবিয়াও বুঝিতে পারে না। তবুও কথাটা তাহার বড় ভাল লাগিয়াছে। সে মনে মনে কথাগুলি মুখস্ত করিয়া ফেলে। ভাবিয়া চিন্তিয়া "খবর" শব্দটির পরিবর্তে সংবাদ শব্দটি বসাইয়া শুদ্ধ করিয়াও লয়।

সেদিন আসিয়া প্রশ্ন করিল—হুজুর, জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, অথবা ভক্তি শ্রেষ্ঠ?

বাবু বলিলেন—ও দুটোর হল আম আর আঁটির সম্বন্ধ পণ্ডিতমশাই। আম খেলেই যেমন আঁটি পাওয়া যায়, জ্ঞান এলেই তেমনি ভক্তি আসে। অবশ্য ভুয়ো আঁটি-ওয়ালা আমও আছে। সেটা ঐ আমের শাঁস শুকিয়ে যায় বলেই। সে আপনার অখাদ্য।

পণ্ডিতের তাক লাগিয়া গেল। সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল। অকস্মাৎ রান্নাশালা হইতে গমস্তার তীব্র কণ্ঠস্বরে সচকিত হইয়া সে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

গমস্তা তাহাকে দেখিবামাত্র বলিল—বলি ব্যাপার কি আপনার বলুন তো?

পণ্ডিত সভয়ে বলিল—কি আজ্ঞে?

—এই পরশু দোকান থেকে সাতদিনের জিনিসপত্র আনিয়ে দিয়েছি। এক সের ঘি এসেছে। এর মধ্যে আজ ঘি নাই, জিনিসপত্রও সব ফুরিয়ে গেল, ও-বেলায় আর চলবে না—এর মানে কি?

যতীন হাতজোড় করিয়া বলিল—আজ্ঞে আমি বেশ অনুধাবন করতে অপারগ হচ্ছি কিরূপে অর্থ ব্যক্ত করব বলুন!

গমস্তা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল—ওসব 'ব্যক্ত-মেক্ত' ছাড়ুন মশাই, নিয়ে সাদা কথায় বলুন।

ওদিকে কাছারী হইতে বাবু ডাকিলেন—রাধাচরণ!

গমস্তা কথা অসমাপ্ত রাখিয়াই তাড়াতাড়ি বাবুর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বাবু বলিলেন—বকাবকি কিসের হচ্ছে? কি হল?

—আজ্ঞে, মহা বিপদ হয়েছে। জিনিসপত্র সব চুরি যাচ্ছে।

—চুরি যাচ্ছে? কি চুরি গেল?

—আজ্ঞে, পরশু দোকান থেকে হিসেব করে সাতদিনের মত জিনিসপত্র আনিয়েছি। ঘি আনিয়েছি পাকী এক সের। আজ আর জিনিসপত্র কিছুই নেই। ঘি ছটাকখানেক মাত্র পড়ে আছে। ওবেলায় সব আসবে তবে রান্না চড়বে।

যতীনও পিছন পিছন আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে সম্মুখে আসিয়া বলিল —হুজুর, তস্কর যে কে, অনুসন্ধান করে দেখা হোক। আমি অদ্য হতে কাছারী ত্যাগের সময় বস্ত্র-অঙ্গ উত্তমরূপে পরীক্ষা করে যাব হুজুর।

বাবু বলিলেন—না—না—না। যান আপনি, কাজ করুন গে যান।

ধমক দিয়া গমস্তা বলিল—যান না মশাই, বাবু বললেন যেতে, আর আপনি আবার আরম্ভ করলেন?

যতীন চলিয়া গেল।

গমস্তা বলিল—হয় ও, নয় ঐ নগদী বেটার কাজ।

বাবু বলিলেন—বেশ ত, জিনিসপত্র একটু সাবধান করে রেখে তুমিও একটু নজর রাখ, তাহলেই আর চুরি যাবে না। আর ও নিয়ে কি কেলেঙ্কারী করে? ছিঃ!

গমস্তা আপন মনেই বক্‌বক্ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পর বাবু বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, যতীন ম্লানমুখে নির্বাক হইয়া বসিয়া আছে। কত গভীর চিন্তায় সে যেন মগ্ন। তিনি বুঝিলেন, কথাটা বেচারাকে বড়ই বাজিয়াছে। তাঁহারও মনটা বেদনায় টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। তিনি তাহাকে উৎসাহিত করিবার জন্যই বলিলেন—পণ্ডিতমশাই, একদিন আপনার পাঠশালা দেখব আমি।

পণ্ডিত তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—সে সৌভাগ্য কি আর অধীনের অদৃষ্টে আছে?

—বাবু বলিলেন—ও কথা কেন বলছেন? নিশ্চয় যাব আমি।

একটুখানি স্তব্ধ থাকিয়া যতীন বলিল—হুজুর সেদিন ব্যক্ত করলেন, অদৃষ্ট

আর পুরুষকারের দ্বন্দ্বের আজও অবসান হয় নাই। কিন্তু আমার মনে হয়, হয়েছে। অদৃষ্টই শ্রেষ্ঠ, সেই বলবান।

বাবু যতীনের এই আকস্মিক উক্তির হেতু বুঝিয়াছিলেন, তাই একান্ত আন্তরিকতাপূর্ণ কণ্ঠস্বরে বলিলেন—না—না—না, কিছু মনে করবেন না আপনি। ওসব লোকের বিষয় ঘেঁটে ঘেঁটে মন ঘাঁটা পড়ে গেছে, সংসারে আর পাপ ছাড়া কিছু চোখে পড়ে না ওদের। আমি আপনার কাছে মাপ চাচ্ছি।

যতীনের চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িয়া গেল।

বাবুও আর সেখানে দাঁড়াইলেন না। পাছে যতীনের উচ্ছ্বাস প্রবলতর হইয়া উঠে সেই ভয়ে তিনি ঘরে আসিয়া বসিলেন। মিনিট দশেক পরেই কিন্তু যতীন আসিয়া বাবুর সম্মুখে দাঁড়াইল—হুজুর।

—বলুন।

যতীন জোরহাত করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। বাবু দেখিলেন তাঁহার ঠোঁট দুটি থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে।

তিনি গভীর সহৃদয়তার সহিত বলিলেন—কি বলছেন, বলুন।

যতীন ঝর্ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল —হুজুর, আমিই অপরাধী, আমিই তস্কর! ঘৃত মসল্লা আমিই অপহরণ করেছি হুজুর।

বাবু নির্বাক হইয়া রহিলেন। যতীন ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতেছিল। বাবু সস্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন—আপনার বড় অভাব, নয়?

যতীন বলিল—হুজুরের আশীর্বাদে অধীনের অভাব নাই হুজুর। তবে এই বালকটির জন্য। দরজার বাহির হইতে শীর্ণকায় মড়িরামকে সম্মুখে আনিয়া বলিল— হুজুর, বড়ই মেধাবী ছাত্র এটি। কিন্তু সংসারে বড়ই অভাব। আমাকে কিছু কিছু ক'রে সাহায্য করতে হয়, নতুবা উদরের দায়ে বালকটিকে পড়া পরিত্যাগ ক'রে কারও গো-চারণ চাকুরি গ্রহণ করতে হবে।

বাবুর বিস্ময়ের অবধি ছিল না। যতীনের আবেগ তখনও নিঃশেষিত হয় নাই, সে বলিল—তাই হুজুর আপনার দরবার হতে কিছু মসল্লা একে প্রদান করেছি। আর ঘৃতটুকু হুজুর, ঐ ওকেই সেবন করতে দিয়েছি—মেধাবী ছাত্র, ঘৃতে মেধা বৃদ্ধি হয়। হুজুর, ওকে এবার আমি বৃত্তি পরীক্ষা যেমন করে হোক দেওয়াব। আমার ছাত্র নিয়ে লোকপাড়ার শিক্ষকেরা সুনাম অর্জন করে, আর আমায় বলে, 'কাক-পণ্ডিত'। হুজুর, আমি শিক্ষিত করি, আর তারা অবশেষে তাকে গ্রহণ করে, তাই......'

আবার সে ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। ছেলেটিও ইতিমধ্যে প্রণাম সারিয়া বড় বড় চোখ দুটি মেলিয়া করজোড়ে বাবুর সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল।

বহুক্ষণ পরে বাবু বলিলেন—আচ্ছা, পণ্ডিত, আমি এখন থেকে পাঁচ টাকা করে সাহায্য করব, বুঝলেন?

যতীন করজোড়ে প্রশ্ন করিল—আমার পাঠশালা কবে পরিদর্শন করবেন, হুজুর? আমি পত্রপুষ্প দিয়ে সমস্ত সুসজ্জিত করব। হুজুর, আপনি যে ভূস্বামী, রাজা, দেবতার অংশ—

যতীনের উচ্ছ্বাস থামিত কিনা সন্দেহ, কিন্তু নন্দীটা চীৎকার করিয়া ডাকিল, এ্যাই—যা, ডালটা পুড়ে গেল যে! ঠাকুরমশাই, ও ঠাকুরমশাই?

সত্যই পোড়া-গন্ধ উঠিয়াছিল, যতীন ত্রস্তপদে রান্নাশালার দিকে চলিয়া গেল।

পরিচয়পঞ্জী

অক্ষয়কুমার বড়াল

জন্ম ১৮৬০; মৃত্যু ১৯ জুন, ১৯১৯। নিবাস চোরবাগান, কলিকাতা। কবি হেয়ার স্কুলে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তিনি ব্যাঙ্কে হিসাবরক্ষকের কাজ করিতেন। অক্ষয়কুমার কবি বিহারীলালের ভাবশিষ্য ছিলেন। তাঁহার কাব্যগ্রন্থ 'প্রদীপ', 'কনকাঞ্জলি', 'ভুল', 'শঙ্খ' এবং 'এষা'। "মধ্যাহ্নে" কবিতাটি 'শঙ্খ' হইতে সংকলিত। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩২০) এই কবিতার শেষ লাইনটি এইরূপ ছিল— 'ছায়া ছায়া কত ব্যথা সহি ধরাধামে।'

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্ম ৭ আগস্ট, ১৮৭১; মৃত্যু ৫ ডিসেম্বর, ১৯৫১। নিবাস জোড়াসাঁকো, কলিকাতা। অবনীন্দ্রনাথের পিতা গুণেন্দ্রনাথ ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র। বিদ্যালয়ে তাঁহার শিক্ষা বেশি দূর অগ্রসর হয় নাই। চিত্রশিল্পে তাঁহার স্বাভাবিক আগ্রহ ছিল, পরে শিল্পী হিসাবেই তিনি পৃথিবীখ্যাত হন। তাঁহার বহু গ্রন্থের মধ্যে কয়েকটির নাম 'শকুন্তলা', 'ভূতপত্রীর দেশ', 'নালক', 'ক্ষীরের পুতুল', 'রাজাকাহিনী', 'পথে-বিপথে', 'জোড়াসাঁকোর ধারে', 'ঘরোয়া', 'বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী', 'ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ' এবং অন্যান্য। "বাপ্পাদিত্য" 'রাজকাহিনী' হইতে গৃহীত।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

জন্ম ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮২০; মৃত্যু ২৯ জুলাই, ১৮৯১। মেদিনীপুরে বীরসিংহ গ্রামে আদি নিবাস। পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা ভগবতী দেবী। সংস্কৃত কলেজে পাঠ সমাপ্ত করিয়া 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন। পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। বাংলাদেশের শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারে তাঁহার কাজ স্মরণীয়। 'বেতালপঞ্চবিংশতি', 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস', 'কথামালা' প্রভৃতি গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেন। "ঠাকুরদাসের বাল্যশিক্ষা" 'বিদ্যাসাগর-চরিত' (স্বরচিত) হইতে গৃহীত।

এস্. ওয়াজেদ আলি

জন্ম ১৮৯০; মৃত্যু ১৯৫১। পিতৃনিবাস ও জন্মস্থান তাজপুর, হুগলী। আলিগড় ও কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি.এ. পাস করেন; ব্যারিস্টার ও পরে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট হন। রচিত পুস্তক—'গুলদস্তা', 'মাশুকের দরবার', 'দরবেশের দোয়া' ইত্যাদি। "ভারতবর্ষ" 'মাশুকের দরবার' হইতে গৃহীত।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

আবির্ভাব-কাল ষোড়শ শতাব্দী। পিতার নাম হৃদয় মিশ্র, পুত্রের নাম শিবরাম। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচিত হয় ১৫৭৪ হইতে ১৫৯৬-এর মধ্যে কোনো সময়ে। এই কাব্যের আরম্ভ-ভাগ হইতে 'আত্মপরিচয়' সংকলিত হইয়াছে। ইহাতে কবি নিজের সম্বন্ধে তথ্য প্রায় সকলই জানাইয়াছেন। তবে সময়-নিরূপণ সম্বন্ধে কিছু সংশয় আছে।

রাজা মানসিংহ—১৫৮৭ খ্রীস্টাব্দের ১৮ ডিসেম্বর রাজা মানসিংহকে দিল্লীর বাদশাহ আকবর উড়িষ্যার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ১৫৯০ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি ভাগলপুর ও বর্ধমানের মধ্য দিয়া হুগলী জেলার আরামবাগে পৌঁছেন। অতঃপর উড়িষ্যার পাঠানসর্দার কৎলু খাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া মানসিংহ বাংলা ও উড়িষ্যার সুবাদারী লাভ করেন। ১৬০৫ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিনি ওই পদে ছিলেন। এর কিছু পূর্বে ১৫৯৯ হইতে ১৬০০-এর মধ্যে একবার তিনি বিশ্রাম লইবার জন্য আজমীরে ছিলেন।

রঘুনাথ রায়—বাঁকুড়া রায়ের পুত্র। রঘুনাথ রায়ের রাজত্বকাল ১৫৭৩-১৬০৩ খ্রীস্টাব্দ।

গোহারি—দুঃখ জানানো ও প্রতিকার প্রার্থনা; ধুতি—উৎকোচ।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম ১৯ নবেম্বর, ১৮৭৭; মৃত্যু ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৫। নদীয়া শান্তিপুরে নিবাস। বি.এ. পর্যন্ত পড়েন। স্কুলে শিক্ষকতা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাসসমূহের পরিদর্শকরূপে কাজ করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থ 'বঙ্গমঙ্গল', 'প্রসাদী', 'ঝরাফুল', 'শান্তিজল', 'ধানদূর্বা', 'রবীন্দ্র-আরতি' প্রভৃতি। "জীবন-ভিক্ষা" কবিতাটি 'ধানদূর্বা' হইতে সংকলিত।

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

জন্ম ২৪ মে, ১৮৯৯। বর্ধমান জেলার চুরুলিয়ায় নিবাস। পিতা কাজী ফকির আহমদ নজরুলের বাল্যকালেই মারা যান। স্কুলের শিক্ষা শেষ হইবার আগেই নজরুল সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেন। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে করাচী হইতে ফিরিয়া কবি পুরাপুরি কাব্যচর্চাতেই মনোনিবেশ করেন। 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশি', 'দোলনচাঁপা', 'সিন্ধু-হিন্দোল', 'সর্বহারা', 'ছায়ানট' প্রভৃতি তাঁহার রচিত গ্রন্থ। "কাণ্ডারী হুঁশিয়ার" 'সর্বহারা' হইতে গৃহীত।

কামিনী রায়

জন্ম ১২ অক্টোবর, ১৮৬৪; মৃত্যু ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩। বরিশালের বাসণ্ডায়

নিবাস। পিতা চণ্ডীচরণ সেন। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে বি.এ. পাস করিয়া কবি বেথুন স্কুলে শিক্ষিকা হন। 'আলো ও ছায়া', 'মাল্য ও নির্মাল্য', 'দীপ ও ধূপ', 'অশোক-সংগীত', 'জীবনপথে' প্রভৃতি তাঁহার উল্লেখযোগ্য কাব্য। "মা আমার" কবিতাটি 'আলো ও ছায়া' হইতে গৃহীত।

কালিদাস রায়

জন্ম ৯ জুলাই, ১৮৮৯; মৃত্যু ২৫ অকটোবর, ১৯৭৫ নিবাস বর্ধমানের কড়ুই গ্রামে। বি.এ. পাস করিয়া শিক্ষকতাকর্মে লিপ্ত ছিলেন। তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থ 'কিশলয়', 'পর্ণপুট', 'বল্লরী', 'ব্রজবেণু', 'রসকদম্ব', "ঋতুমঙ্গল', লাজাঞ্জলি', 'ক্ষুদকুঁড়া', 'হৈমবতী', 'বৈকালী', 'গাথাঞ্জলি', 'সন্ধ্যামর্ণি' প্রভৃতি। "ত্রিরত্ন" কবিতাটি 'আহরণ' নামক সংকলনগ্রন্থ এবং "ছাত্রধারা" 'হৈমন্তী' হইতে গৃহীত।

কাশীরাম দাস

আবির্ভাব-কাল ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে। পৈতৃক নিবাস বর্ধমান জেলার সিঙ্গি গ্রামে। পিতার নাম কমলাকান্ত। কাশীরামের মহাভারত সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে লেখা হইয়াছিল। প্রবাদ এই যে, কাশীরাম আদি সভা বন ও বিরাট পর্ব পর্যন্ত রচনা করিয়াছিলেন। "দুর্যোধনের প্রতি ধৃতরাষ্ট্র" মহাভারতের 'সভাপর্ব' হইতে গৃহীত।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

জন্ম ১ মার্চ, ১৮৮৩; মৃত্যু ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭০। নিবাস কোগ্রাম, বর্ধমান জেলা। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কবি বি.এ. পাস করেন। মাথরুন স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে কাজ করেন। তাঁহার কাব্যগ্রন্থ—'শতদল', 'বনতুলসী', 'উজানী', 'বীথি', 'বনমল্লিকা', 'নূপুর', 'তূণীর', 'রজনীগন্ধা', 'অজয়', 'স্বর্ণসন্ধ্যা'। "ছোটোর দাবি" কবিতাটি 'অজয়' হইতে সংকলিত।

কৃত্তিবাস

আনুমানিক ১৩৯৮ খ্রীস্টাব্দে নদীয়া শান্তিপুরে ফুলিয়ায় কৃত্তিবাস ওঝার জন্ম। পিতার নাম বনমালী, পিতামহ মুরারি ওঝা। এগারো উত্তীর্ণ হইয়া কবি বিদ্যার্জনের জন্য উত্তর দেশে যান। বিদ্যাসমাপনান্তে কবি জনৈক হিন্দু রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় সপ্তকাণ্ড রামায়ণ রচনা করেন। এই রাজা সম্ভবত রাজশাহীর রাজা গণেশ। (১৪১৪-১৪১৮)। কবি প্রায় আশি বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

"শ্রীরামের অত্রিমুনির আশ্রম গমন" কৃত্তিবাসী রামায়ণের 'অরণ্য কাণ্ড' হইতে সংকলিত। মূল সংস্কৃত রামায়ণে ইহা অযোধ্যাকাণ্ডের (১১৭-১১৮ সর্গ) অন্তর্গত।

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

জন্ম ২৯ জুন, ১৮৮৩; মৃত্যু ২৬ আগস্ট, ১৯৬১। জন্মস্থান ও পিতৃনিবাস হরিনাভি, চব্বিশ পরগনা। ১৯৪০ পর্যন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। রচিত গ্রন্থ 'নব্যবিজ্ঞান', 'বাঙালীর খাদ্য', 'আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু', 'বিশ্বের উপাদান', 'ব্যাধির পরাজয়', 'পদার্থবিদ্যার নবযুগ' ইত্যাদি। "লুই পাস্তুর" তাঁহার 'বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-কাহিনী' হইতে গৃহীত।

জগদীশচন্দ্র বসু

জন্ম ৩০ নবেম্বর, ১৮৫৮; মৃত্যু ২৩ ডিসেম্বর, ১৯৩৭। পৈতৃক গৃহ ঢাকা-বিক্রমপুরে রাড়িখালে। পিতা ভগবানচন্দ্র বসু। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি.এস্‌সি. পাস করিয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯০১ সালের ১০ মে বিলাতে রয়াল ইন্‌স্টিটিউশনে জড় ও জীবে সাড়ার আবিষ্কার সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্র আলোচনা করেন। পদার্থ ও উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানে মূল্যবান গবেষণা করিয়া তিনি শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ সুহৃৎ ছিলেন। তাঁহার রচিত বাংলা গ্রন্থ 'অব্যক্ত'। "ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে" 'অব্যক্ত' হইতে গৃহীত।

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম ২৩ জুলাই, ১৮৭৮; মৃত্যু ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১। জন্ম বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে। রাঢ় অঞ্চলের মাটি, মানুষ ও জীবনযাত্রার বর্ণনায় তাঁর উপন্যাস ও গল্পগুলি সমৃদ্ধ। তিনি স্বদেশপ্রেমিক ও ভারতীয় আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার উপন্যাসসমূহের মধ্যে ধাত্রীদেবতা, কালিন্দী, পঞ্চগ্রাম, গণদেবতা, কবি, আরোগ্য-নিকেতন প্রভৃতি বিখ্যাত। পাঠ্য গল্পটি তাঁহার গল্পসংগ্রহ গ্রন্থ হইতে সংকলিত।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্ম ১৫ মে, ১৮১৭; মৃত্যু ১৯ জানুয়ারি, ১৯০৫। নিবাস কলিকাতা জোড়াসাঁকো। পিতা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধু ছিলেন। বহু জনহিতকর ক্রিয়াকর্মের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। দেবেন্দ্রনাথের আদর্শে ও ছায়ায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে অগ্রগণ্য হইয়া উঠে। তাঁহাব রচিত গ্রন্থ 'ব্রাহ্মধর্ম', 'আত্মতত্ত্ববিদ্যা', 'ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস', 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' প্রভৃতি।

বর্তমান গদ্যাংশ 'আত্মজীবনী'র পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ হইতে গৃহীত। পাদটীকা আত্মজীবনী-সম্পাদক সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী-কৃত।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

জন্ম ১৯ জুলাই, ১৮৬৩; মৃত্যু ১৭ মে, ১৯১৩। নদীয়া কৃষ্ণনগরের অধিবাসী। পিতা দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়। ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে এম.এ. পাস করিয়া বিলাতে যান; ফিরিয়া আসিয়া ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ গ্রহণ করেন। 'সাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'নূরজাহান', 'মেবারপতন', 'দুর্গাদাস', 'সীতা' প্রভৃতি তাঁহার নাট্যগ্রন্থ। তাঁহার কবিতাগ্রন্থের নাম 'আর্যগাথা', 'আষাঢ়ে', 'হাসির গান', 'মন্দ্র', 'আলেখ্য' প্রভৃতি। পাঠ্য নাট্যাংশটি তাঁর 'প্রতাপসিংহ' নাটক হইতে গৃহীত।

দেবেন্দ্রনাথ সেন

খ্রীঃ ১৮৫৮—১৯২০। উল্লেখ্য গীতিকবি ও সনেটের রচয়িতা। বাংলার বাহিরে গাজিপুরে জন্ম ও শৈশব, এলাহাবাদে ওকালতি। অশোকগুচ্ছ, গোলাপগুচ্ছ, শেফালিগুচ্ছ, অপূর্ব নৈবেদ্য প্রভৃতি তাঁহার কাব্যগ্রন্থ। ১৯১২ খ্রীঃ একসঙ্গে তাঁর অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'কবি-ভ্রাতা' সম্পর্ক ছিল। পাঠ্য কবিতাটি তাঁহার 'অপূর নৈবেদ্য' হইতে সংকলিত।

নবীনচন্দ্র সেন

জন্ম ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৭; মৃত্যু ২৩ জানুয়ারি, ১৯০৯। নিবাস নয়াপাড়া, চট্টগ্রাম। ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে বি.এ. পাস করিয়া প্রথমে হেয়ার স্কুলের শিক্ষক এবং পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। নবীনচন্দ্রের তিনখানি কাব্য 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র', 'প্রভাস' ছাড়াও 'রঙ্গমতী', 'অমিতাভ', 'অমৃতাভ' এবং 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যগুলি প্রসিদ্ধ। "আশা" কবিতাটি 'পলাশির যুদ্ধ' হইতে উৎকলিত।

প্রমথ চৌধুরী

জন্ম ৭ আগস্ট, ১৮৬৮; মৃত্যু ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬। পিতৃনিবাস পাবনা জেলার হরিপুর। বি.এ. পরীক্ষায় দর্শনশাস্ত্রে এবং এম.এ. পরীক্ষায় ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বিলাতে ব্যারিস্টারি পড়িতে যান। 'সবুজ পত্র' নামক বিখ্যাত সাহিত্যপত্রিকা তিনি সম্পাদনা করেন। তাঁহার রচিত গদ্যগ্রন্থ 'বীরবলের হালখাতা', 'চার-ইয়ারি কথা', 'গল্পসংগ্রহ' প্রভৃতি। 'সনেটপঞ্চাশৎ' ও 'পদচারণ' তাঁহার কাব্যগ্রন্থ। "মন্ত্রশক্তি" 'ছোটদের বার্ষিকী' হইতে গৃহীত।

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

জন্ম ১৮৭২; মৃত্যু ১৯৪৯। ময়মনসিংহ জেলার সন্তোষের জমিদার-বংশে জন্ম।

রচিত কাব্যগ্রন্থ 'পদ্মা', 'গৈরিক', 'গৌরাঙ্গ'; 'পাথার', 'পাষাণ' ইত্যাদি। তাঁহার রচিত কয়েকটি নাটকও আছে। "বাঙালীর মা" 'পাষাণ' কাব্যগ্রন্থ হইতে গৃহীত।

প্রিয়ংবদা দেবী

খ্রীঃ ১৮৭১—১৯৩৫। পাবনা জেলায় জন্ম, সুলেখিকা প্রসন্নময়ী দেবীর কন্যা। বহু মনোরম সনেটের রচয়িত্রী। তাঁর কাব্যগ্রন্থ—রেণু, তারা, পত্রলেখা, অংশু প্রভৃতি। ইনি রবীন্দ্রনাথের স্নেহ-সাহচর্যের সৌভাগ্যলাভ করেন। পাঠ্য কবিতাটি তাঁহার 'দ্বিধা' কাব্য হইতে সংগৃহীত।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জন্ম ২৬ জুন, ১৮৩৮; মৃত্যু ৮ এপ্রিল, ১৮৯৪। নিবাস কাঁঠালপাড়া, চব্বিশ পরগনা। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে বঙ্কিমচন্দ্র এবং যদুনাথ বসু প্রথম বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সঙ্গে সঙ্গেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। ছাত্রাবস্থায় ঈশ্বরগুপ্তের সংবাদপ্রভাকরে পদ্য লিখিতেন। ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হইলে তাঁহার ঔপন্যাসিক খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে সুবিখ্যাত বঙ্গদর্শন পত্রিকা তাঁহার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। তাঁহার রচিত উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'মৃণালিনী', 'বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর', 'রজনী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'রাজসিংহ', 'আনন্দমঠ', 'সীতারাম', 'দেবী চৌধুরাণী', 'ইন্দিরা', 'যুগলাঙ্গুরীয়', 'রাধারাণী'। 'বিবিধ প্রবন্ধ', 'ধর্মতত্ত্ব', 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি তাঁহার মনীষার পূর্ণ পরিচয় বহন করিতেছে।

"বন্দে মাতরম্" 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের (১৮৮২) সন্তান-সম্প্রদায়ের সংগীত। বন্দে মাতরম্ ভারতের জাতীয় আন্দোলনে সর্বভারতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। স্বাধীন ভারতে বন্দেমাতরমের সুখদাং বরদাং মাতরম্ পর্যন্ত অংশ জাতীয় সংগীতরূপে গৃহীত।

"সাগরসঙ্গমে নবকুমার" 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদ হইতে গৃহীত।

"বাহুবল ও বাক্যবল" 'বিবিধ প্রবন্ধ' (২য় ভাগ)-এ সংকলিত ঐ নামের মূল প্রবন্ধের অংশবিশেষ।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম ১২ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪; মৃত্যু ১ নবেম্বর, ১৯৫০। পিতৃনিবাস বারাকপুর, বনগ্রাম মহকুমা, চব্বিশ পরগণা। বিভূতিভূষণ বি.এ. পাস করিয়া শিক্ষকতাকর্মে নিযুক্ত হন। তিনি বহু গ্রন্থের রচয়িতা—'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'দৃষ্টিপ্রদীপ', 'আরণ্যক', 'অনুবর্তন', 'অভিযাত্রিক', 'ইছামতী', 'মেঘমল্লার', 'যাত্রাবদল', 'মৌরিফুল'

প্রভৃতি। "অচেনার আনন্দ" বিখ্যাত 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের অংশবিশেষ। শিরোনাম বর্তমান উপলক্ষে কল্পিত।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

জন্ম ২৫ জানুয়ারি, ১৮২৪; মৃত্যু ২৯ জুন, ১৮৭৩। নিবাস সাগরদাঁড়ি, যশোহর। পিতা রাজনারায়ণ দত্ত সেকালের কলিকাতায় গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। মধুসূদন পাঠ্যাবস্থায় খ্রীস্টধর্ম অবলম্বন করেন। ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে বিলাত যাত্রার পূর্বেই 'শর্মিষ্ঠা', 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'পদ্মাবতী নাটক', 'কৃষ্ণকুমারী নাটক', 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য', 'মেঘনাদবধ কাব্য', 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য', 'বীরাঙ্গনা কাব্য' প্রকাশিত হয়। ফ্রান্সে থাকাকালে তিনি 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' রচনা করেন (১৮৬৬)। নাটক প্রহসন অমিত্রাক্ষর ছন্দ সনেট প্রভৃতি অনেক নূতন সাহিত্যরীতি সৃষ্টি করিয়া বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার তিনিই প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

"ইন্দ্রজিতের যজ্ঞগৃহে লক্ষ্মণ" কাব্যাংশটি 'মেঘনাদবধ কাব্য'-গ্রন্থের ষষ্ঠ সর্গ হইতে গৃহীত।

মোহিতলাল মজুমদার

জন্ম ২৬ অক্টোবর, ১৮৮৮; মৃত্যু ২৬ জুলাই, ১৯৫২। জন্মস্থান মাতুলালয় কাঁচড়াপাড়ায়। ১৯০৮ সালে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রধানত শিক্ষকতাকর্ম গ্রহণ করেন। ১৯২৮ সালে মোহিতলাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার অধ্যাপকরূপে যোগ দিয়া ১৯৪৩-এ অবসর গ্রহণ করেন। মোহিতলালের কাব্যগ্রন্থ 'দেবেন্দ্রমঙ্গল', 'স্বপনপসারী', 'বিস্মরণী', 'স্মরগরল', 'হেমন্তগোধূলি'; সাহিত্যসমালোচনার গ্রন্থ 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য', 'সাহিত্যবিতান' প্রভৃতি। "কাল-বৈশাখী" 'হেমন্তগোধূলি' হইতে সংকলিত।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

জন্ম ২৬ জুন, ১৮৮৭; মৃত্যু ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪। পিতৃনিবাস শান্তিপুরের নিকটবর্তী হরিপুর। যতীন্দ্রনাথ শিবপুর ইন্‌জিনীয়ারিং কলেজ হইতে পাস করিয়া নদীয়া জেলাবোর্ড এবং পরে কাশিমবাজার রাজ-এস্টেটে ইন্‌জিনীয়র হন। তাঁহার কাব্যগ্রন্থ 'মরীচিকা', 'মরুশিখা', 'মরুমায়া', 'সায়ম্', 'ত্রিযামা', 'নিশান্তিকা। "হাট" 'মরীচিকা' হইতে গৃহীত।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

জন্ম ২৭ নবেম্বর, ১৮৭৮; মৃত্যু ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮। নদীয়া জমসেরপুরের বিখ্যাত

জমিদারবংশে জন্ম। 'রেখা', 'লেখা', 'নাগকেশর', 'অপরাজিতা', 'জাগরণী', 'নীহারিকা', 'মহাভারতী', 'পাঞ্চজন্য' প্রভৃতি ই'হার কাব্যগ্রন্থ। 'রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য' ই'হার গদ্যগ্রন্থ। "জন্মভূমি" 'রেখা' হইতে সংকলিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্ম ৭ মে, ১৮৬১; মৃত্যু ৭ আগস্ট, ১৯৪১। নিবাস জোড়াসাঁকো, কলিকাতা; পরে শান্তিনিকেতন, বীরভূম। রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্কুল-কলেজের শিক্ষা রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন নাই বটে কিন্তু তাঁহার অসামান্য প্রতিভা ও তীক্ষ্ম মনীষা বহু অধ্যয়নে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। গল্প উপন্যাস ব্যঙ্গকৌতুক দিনলিপি ভ্রমণকাহিনী ধর্মোপদেশ শিক্ষা রাজনীতি শব্দ ছন্দ ভাষাতত্ত্ব বিজ্ঞান নাটক গদ্যকবিতা রূপকনাটক প্রহসন কবিতা গান প্রভৃতি সব বিষয়ে তিনি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ১৯১৩ সালে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। শান্তিনিকেতনে বিশ্ব-ভারতী এবং শ্রীনিকেতনে কৃষি-পরিকল্পনা তাঁহার গঠনমূলক কর্মপ্রতিভার উদাহরণ।

"পুরাতন ভৃত্য" "দুই বিঘা জমি" কবিতা দুটি 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থ হইতে, "দিদি" এবং "বঙ্গমাতা" 'চৈতালি' কাব্যগ্রন্থ হইতে, এবং "ধূলামন্দির" 'গীতাঞ্জলি' হইতে গৃহীত।

১৯১১ খ্রীস্টাব্দে রচিত "জনগণমন-অধিনায়ক" গানটি কলিকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন ২৭ ডিসেম্বর উদ্‌বোধনসংগীতরূপে গাওয়া হয়। স্বাধীন ভারতবর্ষেরও জাতীয়-সংগীতরূপে বন্দে-মাতরম্‌ এবং জনগণমন গান দুটি গৃহীত হয়।

"ঘর ও বাহির" 'জীবনস্মৃতি' হইতে সংকলিত।

"ভানুসিংহের পত্র" 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' হইতে গৃহীত।

"আশ্রমের রূপ ও বিকাশ" ঐ নামের গ্রন্থের অংশ।

"বলাই" 'গল্পগুচ্ছ' ৩য় খণ্ড হইতে সংকলিত।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

জন্ম ৩১ অক্টোবর, ১৮৪৫; মৃত্যু ১০ অক্টোবর, ১৮৮৬। দর্শনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে বি.এ. পাস করিয়া বিভিন্ন সরকারি কলেজে অধ্যাপনা করেন। ইনি বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গ-দর্শনের লেখক ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থ 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস', 'নানা-প্রবন্ধ' প্রভৃতি।

"প্রতিভা" 'নানাপ্রবন্ধ' হইতে সংকলিত।

রাজনারায়ণ বসু

খ্রীঃ ১৮২৬—১৮৯৯। চব্বিশ পরগনা জেলার বোড়াল গ্রামে জন্ম। হেয়ার স্কুল ও

হিন্দু কলেজের ছাত্র। মধুসূদন দত্ত ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সহাধ্যায়ী। উদার ব্রাহ্ম-ধর্মের প্রবক্তা ও ব্রাহ্মসমাজের কর্মী, সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক, পরে মেদিনীপুর সরকারি স্কুলের শিক্ষক। ঠাকুর-পরিবারের ও হিন্দুমেলার সঙ্গেও বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। রচনাবলী—বক্তৃতামালা, হিন্দুধর্ম বিষয়ক গ্রন্থ, সেকাল আর একাল (১৮৭৪), বৃদ্ধ হিন্দুর আশা প্রভৃতি। পাঠ্য অংশটি তাঁর 'সেকাল আর একাল' হইতে গৃহীত।

রাজশেখর বসু

জন্ম ১৬ মার্চ, ১৮৮০; মৃত্যু ২৭ এপ্রিল, ১৯৬০। পিতৃনিবাস উলা বীরনগর, নদীয়া। পিতার নাম চন্দ্রশেখর বসু। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে রসায়নশাস্ত্রে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। 'গড্ডলিকা', 'কজ্জলী', 'হনুমানের স্বপ্ন', 'গল্পকথা', 'ধুস্তুরীমায়া', 'কৃষ্ণকলি' ও 'অন্যান্য গল্প' প্রভৃতি হাস্যরসপূর্ণ গল্পগ্রন্থগুলি 'পরশুরাম' ছদ্মনামে প্রকাশিত। 'চলন্তিকা' তাঁহার বিখ্যাত অভিধান। 'বাল্মীকি-রামায়ণ (সারানুবাদ), 'কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস-কৃত মহাভারত' (সারানুবাদ), 'কালিদাসের মেঘদূত', 'হিতোপদেশের গল্প', 'লঘু-গুরু', 'কুটিরশিল্প', 'ভারতের খনিজ' প্রভৃতি তাঁহার গ্রন্থ। "অশোকবন" 'বাল্মীকি-রামায়ণ' হইতে গৃহীত।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

জন্ম ২০ আগস্ট, ১৮৬৪; মৃত্যু ৬ জুন, ১৯১৯। জন্ম জেমো, মুর্শিদাবাদ। এম.এ. পরীক্ষায় বিজ্ঞানে (পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র) তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তিও তিনি লাভ করেন। রামেন্দ্রসুন্দর রিপন কলেজের অধ্যাপক, পরে অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থ 'প্রকৃতি', 'জিজ্ঞাসা', 'কর্ম-কথা', 'চরিতকথা', 'বিচিত্র প্রসঙ্গ', 'শব্দকথা', 'জগৎকথা', 'যজ্ঞকথা', 'নানাকথা' প্রভৃতি। "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর" প্রবন্ধটি 'চরিতকথা' হইতে গৃহীত।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জন্ম ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৬; মৃত্যু ১৬ জানুয়ারি, ১৯৩৮। নিবাস দেবানন্দপুর, হুগলী। ভাগলপুরে মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হন। প্রথম জীবনে ব্রহ্মদেশে চাকুরি করিতেন, পরে সাহিত্য-সাধনাতেই সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বহু উপন্যাস গ্রন্থের রচয়িতা। 'বড়দিদি', 'বিরাজবৌ', 'বিন্দুর ছেলে', 'পল্লীসমাজ', 'দেনাপাওনা', 'দেবদাস', 'পণ্ডিতমশাই', 'চন্দ্রনাথ', 'শ্রীকান্ত', 'বিপ্রদাস', 'অরক্ষণীয়া', 'পথের দাবী', 'চরিত্রহীন', 'গৃহদাহ', 'শেষপ্রশ্ন' প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। 'নারীর মূল্য', 'স্বদেশ ও সাহিত্য' তাঁহার রচিত প্রবন্ধপুস্তক। "মেজদা" 'শ্রীকান্ত' ১ম খণ্ড' হইতে সংকলিত।

শিবনাথ শাস্ত্রী

জন্ম ৩১ জানুয়ারি, ১৮৪৭; মৃত্যু ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯১৯। জন্মস্থান মাতুলালয় চাংড়িপোতা, চব্বিশ পরগনা। পিতৃনিবাস মজিলপুর। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে সংস্কৃতে এম.এ. পাস করিয়া শাস্ত্রী উপাধি পান। তাঁহার রচিত কবিতাগ্রন্থ 'পুষ্পমালা', 'পুষ্পাঞ্জলি', 'হিমাদ্রিকুসুম', 'ছায়াময়ী পরিণয়', 'নির্বাসিতের বিলাপ'। উপন্যাস 'মেজ বৌ', 'নয়নতারা', 'বিধবার ছেলে', 'যুগান্তর'। প্রবন্ধপুস্তক—'প্রবন্ধাবলী', 'ধর্মজীবন', 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'। "আশ্বিনের ঝড়" তাঁহার 'আত্মচরিত' হইতে সংকলিত।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

জন্ম ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮২; মৃত্যু ২৫ জুন, ১৯২২। নিবাস চুপী, বর্ধমান। পিতামহ অক্ষয়কুমার দত্ত, পিতা রজনীনাথ দত্ত। বি.এ. পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ বহু-অধ্যয়নশীল ছন্দরসিক কবি ছিলেন। তাঁহার রচিত কাব্য 'বেণু ও বীণা', 'হোম-শিখা', 'তীর্থসলিল', 'তীর্থরেণু', 'ফুলের ফসল', 'কুহু ও কেকা', 'তুলির লিখন', 'মণি মঞ্জুষা', 'অভ্র-আবীর', 'বেলাশেষের গান', 'বিদায়-আরতি', 'হসন্তিকা'। "আমরা" কবিতাটি 'কুহু ও কেকা' হইতে গৃহীত।

স্বামী বিবেকানন্দ

জন্ম ১২ জানুয়ারি, ১৮৬৩; মৃত্যু ২ জুলাই, ১৯০২। পূর্বাশ্রমের নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। কলিকাতা শিমুলিয়ার বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র। জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন হইতে বি.এ. পাস করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সংস্পর্শে আসিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ভারত ও ভারতের বাহিরে বেদান্তধর্ম প্রচার করেন। শিকাগোর ধর্মসভায় স্মরণীয় ভাষণ দিয়া দেশে আসিয়া এক সন্ন্যাসিসংঘ গঠন করেন। তাঁহার মৌলিক বাংলা গ্রন্থ 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'ভাববার কথা', 'বর্তমান ভারত'। এতদ্ব্যতীত তাঁহার বহু ইংরেজী ভাষণ ও রচনা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইয়াছে।

বর্তমান সংকলনের রচনাটি 'স্বামীজির বাণী ও রচনা' ৬ষ্ঠ খন্ড হইতে গৃহীত। শিরোনাম বর্তমান উপলক্ষে প্রদত্ত।

সুকান্ত ভট্টাচার্য

খ্রীঃ ১৯২৬—১৯৪৭। পিতৃনিবাস ফরিদপুর জেলা। কবির কলিকাতাতেই জন্ম ও স্বল্পস্থায়ী জীবনযাপন। এত অল্প বয়সে এ রকম কবিতা রচনার কৃতিত্ব খুব কমই দেখা যায়। তাঁর কবিতায় আধুনিক নিঃস্ব ও অসহায় মানুষের জীবনের সকরুণ চিত্র প্রতিফলিত। ছাড়পত্র, ঘুম নেই, পূর্বাভাস, মিঠেকড়া প্রভৃতি তাঁহার কবিতা-পুস্তক। পাঠ্য কবিতাটি তাঁহার 'ছাড়পত্র' কবিতাপুস্তক হইতে সংকলিত।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

জন্ম ৬ ডিসেম্বর, ১৮৫৩; মৃত্যু ১৭ নবেম্বর, ১৯৩১। নিবাস চব্বিশ পরগনার নৈহাটি। সংস্কৃত কলেজ হইতে এম.এ. পাস করিয়া অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন ও পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন। তাঁহার রচিত গ্রন্থ 'বাল্মীকির জয়', 'বেনের মেয়ে', 'কাঞ্চনমালা', 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষার বৌদ্ধ গান ও দোঁহা', 'প্রাচীন বাংলার গৌরব'। "সমুদ্রপথে" 'বেণের মেয়ে' উপন্যাসের অংশবিশেষ।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম ১৭ এপ্রিল, ১৮৩৮; মৃত্যু ২৪ মে, ১৯০৩। জন্মস্থান হুগলী জেলার গুলিটা গ্রাম। তিনি বি.এ., বি.এল. পাস করিয়া মুন্সেফ ও পরে হাইকোর্টের উকিল হন। তাঁহার রচিত প্রধান কাব্যগ্রন্থ 'বীরবাহু', 'চিন্তাতরঙ্গিণী', 'বৃত্রসংহার মহাকাব্য', 'আশাকানন', 'দশমহাবিদ্যা', 'ছায়াময়ী' ও 'কবিতাবলী'।

"দধীচির তনুত্যাগ" কাব্যাংশটি 'বৃত্রসংহার' মহাকাব্যের ত্রয়োদশ সর্গ হইতে গৃহীত। মূল কাহিনী ব্যাস-কৃত মহাভারতের বনপর্বের অন্তর্গত।